জাহ্নবী যমুনার
উৎস সন্ধানে

জাহ্নবী যমুনার উৎস সন্ধানে

॥ শ্রীজয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

রীডার্স কর্ণার
৫ শঙ্কর ঘোষ লেন • কলিকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ—নববর্ষ, ১৩৬১
দাম তিন টাকা আট আনা

প্রচ্ছদশিল্পী
শ্রীসুমুখ মিত্র

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক ও মুদ্রক শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ
বোধি প্রেস। ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন। কলিকাতা ৬

উৎসর্গ

সুরলোকবাসিনী
মাতৃদেবীর শ্রীচরণে

ভাগ্যহীন
জয়ন্ত

রানাঘাট,
নদীয়া

ভূমিকা

আমার বিনয়নম্র স্বীকৃতি হ'ল—এ তীর্থকাহিনী শ্রুতিলিখনের মাধ্যমে। অর্থাৎ গঙ্গাজল দিয়ে আমি গঙ্গাপূজা সেরেছি।

যে গৃহী-সন্ন্যাসী মানুষটিকে (শ্রীসন্তোষ কুমার মুখোপাধ্যায়) আমার আধ্যাত্মিক শিক্ষার স্থিরভূমি বলে মেনে নেওয়া, যাঁর পদপ্রান্তে বসে বসে ভবতারিণীকে চিনতে শেখা আমার—তিনিই তীর্থ করেছেন, আমি নয়। তাঁর মুখ থেকেই কথকথা শোনার মত শুনেছি দিনের পর দিন যমুনোত্তরী গঙ্গোত্তরী ও গোমুখের রহস্যঘন ইতিহাস, পথ-ঘাটের খুঁটিনাটি, চড়াই-উতরাই-এর ইতিবৃত্ত আর দেবতাত্মা হিমালয়ের দুর্লভতম সম্পদের অধ্যায়বিশেষ। প্রসাদী ফুলের মত তাঁর মুখের কথাগুলো—আর তাই নিয়েই এ কাহিনীর মালাগাঁথা আমার। মাতৃমূর্ত্তির কাঠামো তিনিই দিয়েছেন—আমি নিভৃত নিরালায় সেই কাঠামোর ওপর ডাকের সাজ পরিয়েছি মাত্র। মহাষ্টমীর মধ্যরাত্রে দেবীপ্রতিমার ভেতর যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা—তা আমি পেরেছি কি না তার বিচার আমার নয়।

'প্রবাসী'তে এ কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে দীর্ঘ সাত মাস ধ'রে। এই সময়ের মধ্যে বহু চিঠি পেয়েছি আমি। সে সব চিঠিতে সকল প্রশ্নের ভেতর যে প্রশ্নটি বড় হয়ে উঠেছে, সেটি হ'ল এই—আমি তীর্থে না গিয়ে এ কাহিনী লিখলাম কি করে? কি করে এ সম্ভব হ'ল? চিঠির জবাব কারুকেই দেওয়া হয় নি। ভেবেছিলাম—সময় যখন আসবে, তখন উত্তর দেব।

এই ভূমিকা সেই উত্তর। বই সুরু করার আগে আমার গর্ভ-ধারিণী মাকে শুধু জিজ্ঞাসা করেছিলাম—"মা, আমি পারব?" মাথার ওপর ডানহাতটা রেখে তিনি বলেছিলেন—"তাঁকে ডাকবে, সব পারবে তুমি—।"

পেরেছি, কি পারি নি, তার উপসংহার দেখার জন্যে রাজরাজেশ্বরী মা-ই আমার আজ নেই। তিনি এমন একটি স্থান বেছে নিয়েছেন যেখানে মাথা খুঁড়ে মরে গেলেও সেই শাঁখাচুড়ি-পরা ডানহাতটি আর খুঁজে পাব না আমি।

মার কথা মতই লেখার সময়ের প্রতিমুহূর্ত্তে সেই বিশ্বপ্রসবিনীকেই স্মরণ করেছি। তাঁরই অদৃশ্য নির্ব্বিশেষ কল্যাণপ্রাপ্তির মাধ্যমে আমার ভাঙা ঘরের ভেতর যমুনোত্তরী ও গঙ্গোত্তরী তীর্থমার্গের ছবি আঁকা। এই কল্যাণকে যাঁরা বস্তুতান্ত্রিক বুদ্ধি দিয়ে হেসে উড়িয়ে দেবেন তাঁদেরকেও যেমন আমার কিছু বলার নেই, তেমনি নেই যাঁরা অন্তরের অন্তঃস্থলে স্মরণ-মননকে মেনে নেবেন। আমি শুধু লিখে খালাস।

দু'জনের কাছে যে ঋণ অপরিশোধ্য তাঁদের ভেতর প্রথম হ'লেন একান্ত সুহৃদ শ্রীপ্রীতিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও দ্বিতীয় আমার অশেষ স্নেহভাজন শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। যোগাযোগের দুটি পাতার মতই এই দুটি মানুষের শুভেচ্ছা এ বই-এর সঙ্গে জড়ান।

আরো একজনের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি—তিনি শ্রীঅজিত কুমার শ্রীমানী। এঁর-ও আন্তরিকতার ঋণ অনস্বীকার্য্য।

রানাঘাট,
নদীয়া

জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ এক ॥

ডাক এল আবার!

সেবার ডাক এসেছিল কেদারনাথ ও বদরীকানাথ থেকে, সে ডাককে যেমন এড়ান যায় নি, বেরিয়ে প'ড়েছিলাম—এবারেও তার ব্যতিক্রম হ'ল না; ঘড়ির কাঁটার মত তা এসে গেল।

এবারের আহ্বান সুদূর উত্তরের ছুটি তুষারতীর্থ থেকে...... যমুনোত্তরী ও গঙ্গোত্তরী।

এ যেন নিশির ডাকঃ যাকে এড়ান যায় না—ওড়ান যায় না। আমি ত এরই জন্যে বসে ছিলাম...এরই জন্যে ত আমার প্রহর গোনা!

সেবার বদরীকার মন্দির প্রাঙ্গণের এক বালক মহাসাধুর কথা—"গঙ্গোত্তরী জানেসে সব মিল জায়গা"—তীর্থ শেষ করে বাড়ী ফেরার পর ঐ কথা কয়টি আমার জপের রুদ্রাক্ষ হয়ে ছিল।

যখন সত্যিই সেদিন এল, পাল তুলে দিলাম আমি। এ পাল তুলে দেওয়ার তারিখ ইংরাজী ১৯৫৩ সনের এপ্রিলের চব্বিসে—বাংলার ১৩৬০ সালের এগারই বৈশাখ।

তীর্থযাত্রীদের স্বীকৃতির ইতিহাসে এই প্রামাণিক সত্যটাই বার বার ধরা পড়েছে যে যমুনোত্তরী ও গঙ্গোত্তরীর পথ বন্ধুর ও বিপৎসঙ্কুল। এই পথে তিতিক্ষার ষোল আনার পূজা দেওয়া চাই, নতুবা স্বপ্ন দেখা বৃথা। সেই কারণে মনে মনে সঙ্গী চেয়েছিলাম, প্রয়োজনবোধ করেছিলাম আমি ছাড়া অন্য কোন মানুষের সাহচর্য্য ও সখ্য। তাই যাত্রার আগে ডাক দিলাম চন্দননগরের সর্ব্বজনপরিচিত সেবারের

কেদারবদরীর সঙ্গী দাস মশাইকে। জানালাম, আপনি আসুন, আমি তৈরী। মোট-ঘাট আমার বাঁধা...আপনি ছাড়া যাবে কে? উত্তরে জানালেন—

"ঘোর অমাবস্যার রাত্রে সাইকেল থেকে পড়ে আচমকা হাত ভেঙেছেন। তিনি সাইকেলে চড়েন নি, সাইকেলই তাঁকে চড়েছে। ডাক্তারের মতে, বুড়ো হাড় জুড়তে মাস দুই লাগবে। আপনি এগোন।"

সঙ্গী আমার জুটল না। তা না হোক, হয়ত বা যোগাযোগের অদৃশ্যলিপিতে এই সঙ্গীহীনতারই ইঙ্গিত আছে।

এ পরীক্ষার প্রথম অধ্যায়। তাই যাত্রারম্ভেই এর সুরু।

কলকাতা থেকে হরিদ্বার। ট্রেন পেরিয়ে চলল ধানবাদ-- গয়া—কাশী···। ইণ্টার ক্লাশে স্থান পেয়েছিলাম ভালই—যাত্রীর ভিড়ের মধ্যে আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আর চলমান ষ্টেশনগুলোর দিকে মুখ ফিরিয়ে দার্শনিকের মত একটু ভাববার অবকাশ পেয়েছিলাম। ঘর ছেড়ে এলাম, এতটুকু বাধল না—হাঁসের গায়ে জল লাগার মত সবই গেল ঝরে। কোথা থেকে কি ডাক এল ঘূর্ণীবায়ুর মত, শূন্যে সব বিলীন হয়ে গেল, না রইল তার থাকার অভিমান, না রইল তার শেকড়ের জোর, শুধু মাত্র উৎখাত হলাম ও উৎক্ষিপ্ত হলাম। গত বৎসরে কেদার ও বদরীকার স্বর্ণাঞ্চল ছেড়ে আসার সময় কেমন যেন শূন্যতার অভিমান নিয়ে ফিরেছিলাম, সে অভিমান সবকিছু ফেলে আসার অভিমান, সব পেয়েও সেটি হারিয়ে আসার ক্ষোভ। নারায়ণই ত সব, সর্ব্বভূতের মালিক তিনি, আমার বুকের দীর্ঘনিশ্বাসটিও তিনি শুনেছিলেন—তা না হলে আমি আবার বেরুব কেন? গাড়ীর একটি কোণে বসে বসে জিজ্ঞাসুর মত জীবনকে তন্ন তন্ন করে বিচার করছিলাম—অনুসন্ধান করছিলাম এটা ওটা। ষ্টেশনের পর ষ্টেশন পেরিয়ে যাই, চিন্তার

ও দার্শনিক তত্ত্বের ছোট ছোট শহর এবং জনপদও পেরিয়ে যাই মনে মনে। সহযাত্রীদের কাছে গন্তব্যস্থলের খবর চেপে যাই, লক্ষ্যস্থলকে চেপে রাখি—যদি কেউ জুটে যায় বাধার মত, বোঝার মত। একাকিত্বকে মেনে নিয়েছি, শুধু মেনে নেওয়া নয়, তাকে ফুল লতা-পাতা দিয়ে বরণও করেছি, তাই যাত্রীদের প্রশ্নের পর প্রশ্ন কেমন যেন অর্থহীন হয়ে ওঠে। শুধু চেপে যাই আর এড়িয়ে যাই…।

জীবনের যাযাবর বৃত্তির মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের তীর্থের পর তীর্থ এসেছে আর গেছে—স্মৃতির মধ্যে তাদের রঙের ছোপ কতক লেগেছে, কতক লাগে নি। আসামের কামাখ্যা থেকে সুদূর কন্যাকুমারিকা—কাশ্মীরের তুষারতীর্থ অমরনাথ থেকে সৌরাষ্ট্রভূমির নীলাম্বুচুম্বিত সোমনাথের মন্দিরের শিবলিঙ্গ, একের পর এক—বহু থেকে সংখ্যাহীন, কিন্তু দেখার ভেতর একটা অব্যক্ত কান্নাই থেকে গেছে…অনুভূতির চোখ ছুটো দিয়ে কান্না ত আসে নি কোন দিন। আর আসে নি বলেই পথ খুঁজে বেড়ান আর আত্মানুসন্ধানের আলেয়ায় মাথা খুঁড়ে মরা।

তার পর…।

খচ্ করে কাঁটা বেঁধার মত মনের অন্তস্তলে কি যেন বিঁধে গেল আর এটি কেদারনাথ ও বদরীনাথ ঘুরে আসার পরই। মরুভূমির ধু-ধূর মধ্যে কেমন যেন জলের ভিজে হাওয়ার স্পর্শ পেলাম। মনে হ'ল যাযাবর বৃত্তির ইতি হ'ল। ও ছুটি তীর্থে মন্দির দেখতে দেখতে চোখে সুর্মা লাগার মত লেগে গেল সত্য শিব ও সুন্দরের অঞ্জন, যা মোছা যায় না। ফিরে এসে মনে করেছি জীবন আমার পুণ্য হ'ল, ধন্য হ'ল।

কিন্তু… ।

কিছু দিন যেতে না যেতেই সেই তৃষ্ণা, সেই হাহাকার। বিশ্ব-সংসার

জোড়া সেই হাঁ করা শূন্যতা আর মরীচিকার ক্লান্তি। যে সম্পদকে অতলস্পর্শী বলে মনে করেছিলাম ফেরার পর, এক দিন দেখি তা নিঃশেষ হয়ে এসেছে। ভাবলাম অবাক হয়ে, এ আবার কি? এমনি করেই মাসের পর মাস, আর তা জুড়ে জুড়ে মালার মত একটি বৎসরের আবির্ভাব। কান্না বাড়ে—উষ্ণতায় সবকিছু যেন দাউ দাউ করে জ্বলে যায়।

তার পর আবার ডাক এল। আজকে দেরাদুন এক্সপ্রেসের একটি কামরায় সেই ডাকেরই আর এক পূর্ব্বানুবৃত্তি। আমি চললাম—পাল তুলে দিয়ে ভাসলাম আবার...।

॥ দুই ॥

হরিদ্বার। এ ত আমার দেখা। দাঁড়ান গেল না, কেননা সময় নেই —তার অপচয়ও বুকে বাজবে। সোজা বাস ষ্ট্যাণ্ডের কাছে গিয়ে দাঁড়ানো, একটি টিকিট কেনা, তারপর হৃষীকেশের উদ্দেশে উঠে বসা। ওখানে যখন পৌঁছালাম তখন বেলা দশটা।

হৃষীকেশকে আমি প্রয়াগ বলব—কেননা দুটি মহত্তম তীর্থের যাত্রাপথের বাস্তব রূপের সার্থকতা এখান থেকেই। ওদিকে কেদার-বদরী, এদিকে যমুনোত্তরী ও গঙ্গোত্তরী। একটিকে বেছে নিলেই হ'ল। প্রথম থেকেই সন্দেহ ছিল কুলী তথা বাহক সংগ্রহের ব্যাপারে, বিশেষতঃ যমুনোত্তরী ও গঙ্গোত্তরী তীর্থে কষ্টস্বীকারের প্রয়োজন আছে আর তার জন্যে হৃষীকেশে দু'এক দিন থাকা অপরিহার্য্য। শুনেছিলাম কালী কমলীওয়ালার ধর্ম্মশালার কাছাকাছি ওদের আড্ডা, তা ছাড়া আমাদের মত অর্ব্বাচীন তীর্থযাত্রীদের জন্যে মাথা গোঁজার স্থানও ওখানে—কাজেই মোটঘাট নিয়ে ওখানেই হাজির হওয়া গেল।

কিন্তু হাজির হওয়ামাত্র সেই সুরই বেজে উঠল তিনতলা ধর্ম্ম-শালার চৌকিদারের গলায়, যা কেদার-বদরীর পথে শুনতে শুনতে কানদুটো ঝালাপালা হয়ে গিয়েছিল, এখানেও তারই পুনরাবৃত্তি। বললাম, "ঘর চাই।" বললে,—"ঘর নেই, ঘরের ছাদ পর্য্যন্ত দখল হয়ে আছে, তবে কিনা পশ্চিমদিকের বত্রিশ নম্বর ঘর বরাবর এক ফালি বারান্দা এখনো পর্য্যন্ত বেওয়ারিস পড়ে আছে, ইচ্ছে করলে ওখানে মালপত্র রেখে থাকার অর্থাৎ রাত্রিবাসের আয়োজন করতে পারি।" তথাস্তু—যা শূন্য ঝুলিতে আসে তাই লাভ···বিছানাপত্র ওখানেই রাখা হ'ল

স্নানের দরকার আছে—তার পর খাওয়া অবশ্য যদি বরাতে জোটে বিনা রান্নায়। এক ছুটে চলে আসি পতিতপাবনী গঙ্গায়।

মা গঙ্গাকে দেখলাম বা দেখেছি যত জায়গায়, হৃষীকেশের গঙ্গাকে দেখা বুঝি বা সকলের সেরা! অবশ্য গঙ্গোত্তরীর অথবা গোমুখের দিকের গঙ্গাকে এখানে টেনে আনছি না, কেননা তার রূপ পুরোপুরি আধ্যাত্মিক রূপ, শাশ্বতের রূপ। এখানে গঙ্গাকে শহর বা জনপদের ধারে প্রবাহরূপিণীরূপেই আখ্যাত করেছে—এ দিক থেকে হৃষীকেশকে গরীয়সী বলব। কি যে অদ্ভুত প্রশান্তির ছায়া গঙ্গার সারা অঞ্চলটি জুড়ে ছড়ান তা বলার নয়। মনে হয় এখানে একটি কুটীর বাঁধি—থেকে যাই চিরটা কাল। দিনান্তে শুধু একটি বেলার আহার, একটি রুদ্রাক্ষের মালা, দূরদিগন্তের পাহাড় আর ছলছল গঙ্গার দিকে চেয়ে বসে থাকা...আর কিছুর দরকার নেই এখানে। গোটা তীরভূমির ধারেই পাহাড়ের পরিক্রমণা আর তারই কোলে কোলে হৃষীকেশ শহরের নামমাত্র ইঁট-পাথরের অস্তিত্ব। গঙ্গায় স্রোত আছে, তবে সে উচ্ছলা নয়, সে মৌন। স্নান সমাপনান্তে উপলখণ্ডের ওপর আসন পেতে বসে ছিলাম অনেকক্ষণ···ভাল লাগার এ যেন সম্পদবিশেষ!

ধর্ম্মশালায় প্রবেশের আগে এক বিপত্তি। দেখলাম ছোট্ট একটি সংসার—বৃদ্ধা, বৃদ্ধ ও একটি সতের-আঠার বছরের ছেলে চৌকীদারের ঘরের সামনে অত্যন্ত অসহায় ভাবে বসে আছে। মুখে চোখে সন্ত্রস্ত ভাব। তৎক্ষণাৎ বুঝলাম, সেই চিরন্তন সমস্যা, ঘর পায় নি ওরা। বাঙালী পরিবার সন্দেহ নেই। লক্ষ মানুষের মধ্যেও বাঙালী বাঙালীকে চেনে, এ গল্প হলেও সত্যি, তাই আমাদের কথাবার্ত্তা সুরু হতে বেশী দেরি হয় না। কিন্তু এখানেও বিপত্তি—একেবারে খাস চাটগাঁই, বুড়োর কথা তবুও বোঝা যায়, বুড়ীর ত একদম নয়! দু'জনের কথা শুনে ঠিক

ঠিক উপলব্ধির আওতায় আনা ত নয়—এ যেন ডন-বৈঠক দেওয়া! বহু পরিশ্রমের পর যা বুঝলাম তা হ'ল চৌকিদার ঘর দেয় নি ওদের, বেমালুম হাঁকিয়ে দিয়েছে। এদের ঘর চাই—কেদার-বদরীর 'বাস' ধরিয়ে দেওয়া চাই, টিকিট কিনিয়ে দেওয়া চাই আবার যাওয়াও চাই সঙ্গীহিসেবে। তখনই ভাঙলাম না যে ওদের পথ আমার পথ নয়। অনন্যোপায় হয়ে চৌকীদারের কাছে আবার হাজির হই। তার পর সুরু হ'ল নানাবিধ খোসামোদ তথা অনুনয়-বিনয়। অবশেষে কঠিন পাথরে চিড় খেল—চার জনের দল বলে বত্রিশ নম্বর ঘরটা সে দিয়েই দিল দু' দিনের জন্যে। অর্ব্বাচীন বারান্দা থেকে বিছনাপত্র এল এদের ঘরে, ওরাই জোর করে আনালে। কোথা থেকে এদের উদয়—বারান্দা গেল পুঁছে, জুটে গেল চারটে দেয়াল আর একটা ছাদের আশ্রয়। যোগাযোগ আর কি! রাত্রে খাওয়া দাওয়ার ভারটাও বুড়ী নিল আমার—মনে হ'ল যেন মা অন্নপূর্ণা।

মনে মনে এমন একটি বাহকের কল্পনা করেছিলাম যার সঙ্গে সম্বন্ধ আমার আত্মিক হবে, তাকে দেখেই মনে হবে তার আসাটা যোগা-যোগের আসা। সে আমার মত পঙ্গু অকর্ম্মণ্য মানুষের সকল দায়িত্ব, সকল ঝঞ্ঝাট্ মাথায় তুলে নেবে—আমার কোন ভাবনা থাকবে না। মনের অন্তস্তলে এ বিশ্বাসটি ছিল যে, সময়ের লগ্নে সে আসবেই...।

এসেও গেল। যেমন দুয়ে দুয়ে চার হয়, তেমনি করেই সে এল। ধরাসুগামী বাসের ষ্ট্যাণ্ডেই ওর সন্ধান পেলাম, যে টিকিট দিচ্ছে তার কাছে কথাটা পাড়তেই আমার আপাদমস্তক একবার সার্ভেয়ারী চোখে দেখে নিয়ে বললে, "চার পাঁচ বাজতক্ ইধার আ জানা, আচ্ছা আদমী হ্যায়, মিল্ জানা—।" বিকালে গেলাম। দেখলাম একটা তক্তপোষের কোণে চুপচাপ বসে আছে আর বাসের মালিক মোহন তাকে হাত-পা নেড়ে কি সব বোঝাচ্ছে। বয়স বড় জোর সতের কি আঠার, সুঠাম

সুশ্রী চেহারা; ধবধবে পাজামা আর বেনিয়ান পরা—চোখে-মুখে কুমার কিশোরের ঢলঢলে মিষ্ট ভাব। নাম—ধরম সিং। পরিচয় করিয়ে দিল মোহন; উত্তর কাশীতে এর বাড়ী, এ অঞ্চলে এর মত সৎ ছেলে আর কেউ নেই। জাতিতে ব্রাহ্মণ—রান্নাবাড়ার কাজ সবই করবে। গোমুখ পর্য্যন্ত এ যাবে। আমাকে দেখে এক গাল হেসে প্রণাম করলে, যে প্রণামটি ভুলি নি আজও, এত সোজা, এত প্রাণবন্ত। মনে মনে বুঝলাম নরের ভেতর নারায়ণের যে আবির্ভাবতত্ত্ব, তার সোজা পথ ধরেই ওর আসা।

ফেরার মুখে দেখি বাজারের কাছে এক জটলা। ব্যাপার কি, না একজন সাহেব। ভিড় ঠেলে ঢুকতেই দেখলাম অন্ততঃ পঞ্চাশ-ষাট জন পাহাড়ী লোক সাহেবকে ঘিরে ধরেছে—আর সাহেব হাত-পা নেড়ে কি সব বোঝাচ্ছে। আমার উপস্থিতি তার পক্ষে কতকটা কূল পাওয়া। হাত নেড়ে কাছে ডেকে বললে, "ডু ইউ নো ইংলিশ?" সম্মতিসূচক উত্তর পাওয়ার পর উপস্থিত বিপদের যে কাহিনী সে আমাকে বললে, তা কতকটা সংক্ষেপে এই ঃ—সাহেবের কুলীর দরকার, যাবে কেদারনাথ। তার দরকার এক পিঠের মালপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়ার মত একটি বাহক, যার চল্লিশ টাকার চেয়ে বেশী নেওয়া কিছুতেই উচিত নয়। কুলীরা তাতে রাজী নয়। তাদের মতে সাহেব যা বলছে তা অবাস্তব ও অসঙ্গত।

সত্যিই ত। আমার কাছেও গোটা জিনিসটা কেমন যেন বেসুরো বলে মনে হয়। সাহেব, সে বিষয়ে কোন ভুল নেই, আমাদের দেশীয়ও নয়। মনে হ'ল খাস ইউরোপীয়। কথায় ভাল রকম আসল সাদা চামড়ার প্রভাব আছে। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করি ইংরেজীতে, "তুমি সাহেব ফিরবে না?"

"আই উইল গো দেয়ার, বাট আই উইল নট রিটার্ণ।"

শুধু একবার নয়, বার বার সে একই কথার পুনরাবৃত্তি করে। কুলী চাই সেই রকম যে কেবলমাত্র কেদারনাথ পর্য্যন্তই যাবে, ফিরে আসবে সে একলা। দু' পিঠের ভাড়া চাওয়া কি ন্যায়সঙ্গত? সাহেবের দিকে ভাল করে তাকাই। বেশভূষার পারিপাট্য নেই, একমাথা তৈলবিহীন চুলের সমারোহ, চোখে যেন সুদূরের হাতছানি। যারা ভিড় করেছিল তাদের সকলকে বোঝালাম প্রস্তাবের সারমর্ম্ম। রাজী হ'ল না কেউই। না হওয়ারই ত কথা। সাহেবকে তাদের অস্বীকৃতির কথা জানিয়ে ভিড় থেকে সরে আসি। লোকটা বোধ হয় পাগল—তবে কিসে পাগল তারই একটা অদ্ভুত প্রশ্ন মনের ভেতর ঘোরাফেরা করতে থাকে। চিন্তা করতে করতে ধর্ম্মশালায় ফিরে আসি।

সকাল হ'ল হৃষীকেশে, এখানে আসার দ্বিতীয় দিনের সুরু। ধরম সিংকে বলা ছিল যে, সে সকাল পাঁচটার ভেতর ধর্ম্মশালায় এসে বিছানাপত্র বেঁধেছেঁদে তৈরী হয়ে নেবে। যা বলা সেই কাজ। গঙ্গার ধার বরাবর পাহাড়গুলোর ওপর সূর্য্যের ক্ষীণতম আলো ফুটে ওঠবার আগেই ধরম সিং এসে হাজির। দেখলাম, তার স্নান শেষ, কাপড় জামা বদলান শেষ—শুচিতার পূর্ণকুম্ভ হয়েই যেন তার আসা। সকাল বেলায় তার শুভ্র মূর্ত্তিটি বড় ভাল লাগে আমার। বললাম, "কি রে, তৈরী?" সেই হাসি, হাত জোড় করে শুধু বললে, "জি মহারাজ।"

একটি ছোট্ট বিছানা বগলদাবায়, হাতে একটা লোটা আর একটা লাঠি, যমুনোত্তরী-গঙ্গোত্তরীর সনাতন বাহক আমার তৈরী। বললাম, "তোর বিছানার সঙ্গে আমার বিছানাটা বেঁধে নে।"

ধর্ম্মশালা থেকে বিদায় নিলাম চট্টলবাসী মানুষ তিনটির কাছ থেকে। একটি করুণ মুহূর্ত্তে ভিজে চোখের বিদায় এ। দুটি দিনের

সঙ্গ লাভ, অথচ কত কাছে এসে যাওয়া, কত সুখদুঃখের অংশ ভোগ। বুড়ী ত কেঁদেই অস্থির। জানিয়ে দিলেন, গত জন্মে আমি যে তাঁর গর্ভে ছিলাম সে বিষয়ে কোন ভুল নেই। স্থির হয়ে শুনি, মাতৃ আশীর্ব্বাদে ঘন হয়ে উঠি। চলতে হবে আমায়, ফেলে যেতে হবে এদের, ধরম সিংকে বলি, "চল রে—।"

ধরাসু-র বাস ছাড়ল সকাল ছ'টায়। আশী মাইল পথ, টিহিরী হয়ে যাবে, পৌছাবে সেই বিকেল পাঁচটায়। বাস ষ্ট্যাণ্ডে বিদায় জানিয়ে গেল অর্ব্বাচীন কয়েকটি গাড়োয়ালী লোক—আমাকে নয়, ধরম সিংকে। আমাকে তাদের একান্ত অনুরোধ যে আমি যেন ধরম সিংকে দেখি, অভিভাবকত্বের একটি কণাও যেন বিফল না হয়, কেন না সে বাচ্চা। এ রাস্তায় বাহক হিসেবে তার প্রথম যাওয়া, বিচক্ষণতাহীন, অভিজ্ঞতাহীন অবোধ শিশুই ও—আমি যেন সব মানিয়ে নিই। বলি, "আচ্ছা—।"

দেবপ্রয়াগগামী বাসের ষ্ট্যাণ্ডে আসমুদ্র হিমাচলের লোক—কে উঠবে আগে, কে পড়ে থাকবে পেছনে—তারই প্রতিযোগিতা। লোক বেশী, বাস কম। কিন্তু আমাদের বাস যখন ছাড়ল তখন দেখা গেল ভিড়ও নেই, হৈ-চৈও নেই, গোনাগুনতি আমরা একুশ জন যাত্রী। বাঙালী বলতে আমিই। বাদ বাকীর মধ্যে সংখ্যাগুরু যোধপুরী। এরা সকলেই যমুনোত্তরী-গঙ্গোত্তরীর যাত্রী, উত্তর কাশী বা ধরাসু-র স্থায়ী বাসিন্দা কেউই নয়, একটু আত্মপ্রসাদ জাগল এই ভেবে যে বাংলা দেশের কোন মানুষ আমার যাত্রাপথের দিকে চেয়ে নেই বা লভ্যাংশের দাবি কেউই করবে না।

হৃষীকেশ ছাড়িয়ে যে পাঁচ মাইলের পথ—সে পথ যন্ত্রযানকে 'থোড়াই কেয়ার' করে। কিন্তু তার পর পথের আর কোন কৃতিত্ব নেই

—অসমান, বন্ধুর ও প্রস্তরসমাকীর্ণ। ষ্টীয়ারীংগুলোর ওপর চালকের হাতহুটো চেপে বসে যায়। দশ মাইলের মাথায় নরেন্দ্রনগর। ছোট্ট শহরটি—সমৃদ্ধির দাবী রাখে। পাহাড়ের ওপরই এখানকার রাজা-বাহাহুরের অনুপম প্রাসাদ—দূর থেকে বড় ভাল লাগে, স্থাপত্য ও সুরুচির সঙ্গম ঘটেছে যেন। বাস এখানে দম নেবে, জিরুবে, টিহিরী থেকে হৃষীকেশগামী বাস না আসা পর্য্যন্ত এর ছাড়ার হুকুম নেই, কেননা একমুখো রাস্তা। গরম গরম চা খাওয়া গেল এখানে—ধরম সিং জানায়, চা সে খায় না, চা ছাড়াই সে মানুষ হয়েছে। কিছুক্ষণ পরে পাহড় থেকে ধ্বস নেমে আসার মত এসে গেল হৃষীকেশগামী যাত্রীবাস, আমাদেরটা মুক্তি পেল, সুরু হ'ল যাত্রা।

অবাস্তবতার ভেতরেও বাস্তব, সাহারার ভেতরেও জোলো হাওয়া। একটি বছরখানেকের শিশু সহযাত্রিণী আহমদাবাদী মায়ের কোলে অঘোরে ঘুমুচ্ছে, ছোট্ট ধবধবে একটি কচি মুখ, ছুটি চোখ সুপ্তির ভারে বোজা—এও যমুনোত্তরী-গঙ্গোত্তরীর যাত্রী, এও বাদ যাবে না। ভাবছিলাম কি অশেষ ভাগ্যবান এ 'শিশু এশিয়াটি', কি অপার করুণার সম্ভাবনায় এ সমুজ্জ্বল। মায়ের কোলে কোলে, বাপের বুকে বুকে এও চড়াই উঠবে, উতরাই ডিঙোবে—ছুটি মহাতীর্থের আশীর্ব্বাদ পাওয়া যার জীবনের প্রথম বৎসর থেকেই সুরু। আরও ভাবছিলাম সহযাত্রী ও শিশুটির বাবা মায়ের কথা, পুণ্য-সঞ্চয়ের ছুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার স্রোতে তাদের জীবনের বৃহত্তম ভবিষ্যৎকে ভাসিয়ে দেয় নি, তারা তাকে বুকের উষ্ণতার ভেতর বহন করেই নিয়ে চলেছে···কি মহান্, কি তিতিক্ষাপূর্ণ। শুধুমাত্র জিজ্ঞাসা করেছিলাম বাসে বসে বসে—"তোমরা পারবে একে নিয়ে যেতে ?" বাসের শূন্য গবাক্ষপথ দিয়ে কল্যাণী মা সুদূর আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে—"গঙ্গামাই জান্‌তী হৈ—।"

কি একটা জায়গা, নাম মনে নেই, নরেন্দ্রনগর ও নাগিনা ছাড়িয়ে আরও বার-তের মাইল দূরে বাস একটা পাহাড়ের খাদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে গেল। শোনা গেল, খাদের পাশ দিয়ে পথ খারাপ, আগেভাগে দেখে নেওয়া দরকার। দু'পাশেই ঝুরো পাহাড়—পাথর পড়াটা এখানে হামেশাই। গাড়ী এই পথ পেরিয়ে যাওয়ার আগে পথকে অনুসন্ধানের পর্য্যায়ে আনা চাই, নচেৎ বিপদের ষোল আনা সম্ভাবনা। ড্রাইভার গাড়ী থেকে নেমে গেল, পড়া পাথরগুলোর ওপর পা দিয়ে দিয়ে তাদের স্থিতিকে পরখ করে নিল—একবার পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে দার্শনিকের মত কি সব ভাবলে, তার পর আবার গাড়ীতে উঠে এসে ষ্টার্ট দিল।

ওপরের পাহাড় থেকে গোটা দশ-বার আধমণী পাথর যে এই মুহূর্ত্তটুকুর জন্যে ওত পেতে বসে ছিল তা কে জানত? বাস যেই চলতে সুরু করা, আর কোথাও কিছু নেই, দুম দাম করে অকৃপণ ভাবে পাথরের চাঁই ছাদের ওপর পড়তে সুরু করল…গড় গড় করে এক একবার অদ্ভুত শব্দ হয় আর বুলেটের মত ছুটে আসে এক এক খানি পাথর। সে কি আওয়াজ, মনে হ'ল বিদঘুটে এক যন্ত্রসঙ্গীতের আসর বসে গেল। গাড়ীর ভেতর যাত্রীদের সে কি দাপাদাপি, সে কি হৈ-চৈ! এ কাণ্ড বড় জোর পাঁচ মিনিট, তার পরেই সব চুপচাপ—কিন্তু এ এক প্রচণ্ড রকমের ভূমিকম্পের সম্মুখীন হওয়া। আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টির গল্প শোনা ছিল, কিন্তু পাথরের পুষ্পবৃষ্টির গল্প শোনা ছিল না। বাসের ছাদ গেল তুবড়ে, কিন্তু ফুটো হ'ল না। হুড়োহুড়ি করে বেরুনোর ফলে কারুর ছিঁড়ল হাত-মুখের চামড়া, কারুর ছিঁড়ল দাড়ি অথবা পাগড়ি। আমি, ধরম সিং আর সেই আহমদাবাদী দম্পতি বেরুই নি, ভাগ্যকে

শিখণ্ডী করে বসে ছিলাম। মানুষ আহত হ'ল না বটে, কিন্তু গাড়ীর ছাদটা গুরুতররূপে জখম হ'ল, যার দুঃখ ড্রাইভারটি ধরাসু পর্য্যন্ত করতে করতে গেছে। অদ্ভুত অবিশ্বাস্য কাণ্ড, চিরকাল মনে থাকবে।

টিহিরী ঢুকল না বাস, কাছ দিয়েই অন্যপথ ধরলে। পার্ব্বত্য পথ, দেবপ্রয়াগের কিম্বা শ্রীনগর থেকে পাউরীর রাস্তার মত ভাল নয়। এক জায়গায় ড্রাইভার গাড়ী থামিয়ে তৃষ্ণার্ত্ত যাত্রীদের 'ইউকালিপ্‌টাসের' পাতা খাওয়ালে, ঝাল ঝাল, মিষ্টি মিষ্টি, কিন্তু তৃষ্ণা ঘোচে, জলের দরকার হয় না। ধরাসুতে বাস পৌঁছাল বিকেল সাড়ে পাঁচটায়— নির্দ্ধারিত সময়ের আধঘণ্টা পরে আর এই দেরিটুকুর জন্যে সেই আধমণী পাথরগুলোই দায়ী।

এখানে গঙ্গাকে দেখা গেল আবার। এর কিছু দূরেই কালী-কমলীওয়ালার ধর্ম্মশালা, বাস থেকে নেমেই প্রথমে আস্তানার সন্ধান, তারপর অন্য কিছু। সান্ত্বনা এই যে গোনাগুন্‌তি যাত্রী, পুণ্য-লোভাতুরদের ভিড় নেই অযথা। মোটরের রাস্তাটা যেখানে এসে শেষ হয়েছে তার বেশ নীচুতেই ধর্ম্মশালা, যার দোতলার ছাদ রাস্তার সমান্তরালে এসে ঠেকেছে। রাস্তা থেকে নীচুমুখো সিঁড়ি, এই সিঁড়ি বেয়ে ধর্ম্মশালার আওতায় আসা গেল। ঢুকতেই বিস্ময়, বাংলা দেশের কথা ছ্যাঁক করে মনে এসে যায়। ধর্ম্মশালার চত্বরের সামনেই দুটি পাশাপাশি গাছ—একটি অশ্বত্থ, অন্যটি বট। প্রথম গাছের তলাতেই চেয়ার টেবিল পেতে ডাক্তারবাবু বসে, এখানে পুরাদস্তুর 'ইনকুলেশনের' ব্যবস্থা। ঝামেলা কাটিয়ে ওপরে উঠে গেলাম। পর পর তিনটি ঘর, মধ্যের ঘরটা দখল করা গেল। ধরম সিংও পিছুপিছু এসে হাজির। দু'মিনিট কি তিন মিনিট, একটি পাঞ্জাবী দম্পতির আগমন ও বিনা বাক্যব্যয়ে তাদের বিছানা পেতে ফেলা—ধরম সিং এসেই বিছানা খুলে

দিয়েছিল, এদেরটা নিয়ে হ'ল তিন। চার জনের দাবি নিয়ে কেউ এল না, বেশীর ভাগ বারান্দাকেই পছন্দ করল। আহমদাবাদী দম্পতিও তাই।

উপন্যাসের আগে যেমন ভূমিকা, ফুল ফোটার আগে যেমন কুঁড়ির উদ্গম—তেমনি ধরাসুই যমুনোত্তরী ও গঙ্গোত্তরীর যাত্রাপথের উপক্রমণিকা। ওদিকে রুদ্রপ্রয়াগের পর মন্দাকিনীর স্রোত বরাবর কেদারনাথের পথের সুরু, অলকানন্দার পাশে পাশে যেমন বদরী বিশালের পথ—তেমনি এদিকে ধরাসু-র পর যমুনাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যমুনোত্তরীর আর গঙ্গার ধারে ধারে গঙ্গোত্তরী ও গোমুখের ঐতিহাসিক পথের রেখা। এ দুটি তীর্থই দুর্গম, তবে যমুনোত্তরী এখনও দুর্গমতার দিক থেকে নিঃসন্দেহে প্রাগৈতিহাসিক হয়ে আছে। গঙ্গোত্তরী ও গোমুখকে তার পরে আমি স্থান দেব। যমুনোত্তরী কেদারবদরী পথের থেকে শতগুণে ভয়াবহ—তীর্থযাত্রীর যেখানে তিতিক্ষার শেষ কণাটুকু বিলোতে হয়।

ঘর থেকে যখন বেরিয়েছিলাম তখন মা ভবতারিণীর কাছে কি যে চেয়েছিলাম তা আজও জানি না। তিনি ঘরে রাখতে চান নি, তাই ত আমার এমনি করে পথের সন্ধানে বার হওয়া। মানুষের ডাক তিনি কান পেতে শোনেন, যদি সে ডাকের ভেতর অসম্পূর্ণতার ফাঁকি না থাকে। জড় জগতের জড়ত্ব থেকে যদি মুক্তিই ব্যক্তিবিশেষের চাওয়া হয়ে থাকে, তবে সে চাওয়ার অঞ্জলি সার্থক হয়ে ভরে ওঠে, সে বিষয়ে ভুল নেই। এ পথে আসা আমার পাহাড় দেখা নয়, কাব্য করা নয়, পরিব্রাজক হিসেবে পথের মূলধন ইতিহাসের জন্যে তুলে রাখাও নয়—এপথে আসা আমার মুক্তির সন্ধানে। আমি চেয়েছিলাম যদি সুকৃতির জোর থাকে, যদি বিশ্বাসের ভেতর ধ্যানের জ্যোতির্ম্ময় মুর্ত্তিকে চরম

কাম্য বলে মনে করে থাকি—তা হলে যা আমার চাওয়ার তা আসবে। আজকে বলতে বাধা নেই যে আমি তা পেয়েছি। আর এই পাওয়া যমুনোত্তরীর সীমান্ত পথের মাধ্যমেই।

অবিশ্বাস আর নাস্তিকতাবাদের অন্ধকারে মাথা খুঁড়ে মরা যাদের কাজ, রোজনামচার গতানুগতিকতায় যাদের মেরুদণ্ড বেঁকে দুমড়ে গেছে—তাদের কাছে আমার এই পথের কাহিনী অর্থহীন, মূল্যহীন, ব্যঞ্জনাহীন। বিশেষতঃ, যমুনোত্তরীর পথে আমি কি পেয়েছি তার মূল্য সেই মানুষদের জন্যে নয় যাদের সকলই দেউলে হয়ে গেছে। এ কাহিনী তাঁদেরই জন্য যাঁরা আধ্যাত্মিক সঞ্চয়ে বিশ্বাসী। আমার সব কিছু তাঁদেরই জন্যে, যাঁদের মনের মন্দিরে ফুল-বিল্বপত্রের অঞ্জলি পড়ে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত্তে। আমার ইতিহাস সেই মানুষদেরই জন্যে যাঁরা নিজেদের আত্মার ভেতর পরমপুরুষকে খুঁজে পেয়েছেন।

ভাগীরথী-লাঞ্ছিতা ধরাসু থেকেই এই রহস্যাবৃত অঞ্চলের অবগুণ্ঠন উন্মোচনের প্রথম অঙ্কের সুরু। এখানে এসে পৌঁছান থেকে যমুনোত্তরীর মন্দির পর্য্যন্ত আবার সেখান থেকে নেমে উত্তর-কাশী হয়ে গঙ্গোত্তরী ও গোমুখ পর্য্যন্ত, এখন মনে মনে ভাবি, সবই যেন একটি সুতোয় গাঁথা ছিল। এ গাঁথা আমারই জন্যে কি অপর কোন ভবিষ্যৎ পরিব্রাজকের জন্যে তার হিসেব এখানে নয়, তবে শুধু এইটুকুই বার বার মনে হয়েছে যে যা ঘটেছে তা শুধু ঘটবার জন্যেই তৈরী হয়ে ছিল। যার বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ নেই, তর্ক দিয়ে যার বিচার চলে না, এমন এক একটি ঘটনা ঘটে গেছে যা বুঝলে জ্ঞান থাকে না, উন্মাদ হয়ে ছুটোছুটি করতে হয়। যমুনোত্তরী রহস্যতম অঞ্চল—গুরুবলের অভাব না ঘটলে বড় বড় হীরের খনির সন্ধান মেলে এখানে। এতটা আমার জানা ছিল না, এতটা আমি ভাবি নি। কেদারনাথ ও বদরীনাথ অঞ্চল থেকে

সম্পদ আমি আহরণ করে এনেছিলাম সত্যি, কিন্তু যমুনোত্তরী তীর্থ থেকে যে জিনিস পেয়েছি তার তুলনা নেই, তার তুলনা হয় না। এ পথের অদ্ভুত নির্জ্জনতা ও অদ্ভুত দুর্গম পথের মধ্যে কি যে নেই আর কি যে আছে তার প্রামাণিক হিসেব আমার কাছে স্তব্ধ হয়ে আছে বা থাকবে। এক একটি ঘটনা নীহারিকাপুঞ্জের মত নিস্তব্ধ ও নিথর হয়ে আছে এখানকার দিগন্তব্যাপী নিরাভরণতার মধ্যে, যার তুলনা জীবন-ভোর খুঁজে বেড়ালেও পাওয়া যায় না।

ধরম সিং বিছানা পেতে দিয়ে গেল, কাপড় জামা না ছেড়েই শুয়ে পড়লাম একটু, বলে গেল, "রান্নাবাড়ার জোগাড় করি গে।" সামনের দরজাটা খোলা, ওদিকের বারান্দায় যাত্রীদের কথাবার্ত্তা শুনতে পাচ্ছি —সন্ধ্যা হয় হয়। পাঞ্জাবী দম্পতি তলায় চলে গেছে আহার্য্যের সন্ধানে, ঘরে কেবল আমিই একা। চত্বরের সামনের বটগাছটার একটি ডাল বারান্দার সামনে দোল খাচ্ছিল। চোখ বুজে পড়েছিলাম আর ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মত নানারকম ভাবনা মস্তিষ্কের ভেতর পাক খাচ্ছিল। দু'এক ফার্লং দূরেই গঙ্গা প্রবাহিণী, তার আওয়াজ আমি শুনতে পাচ্ছি, ভারি সুন্দর আওয়াজটি। ভাবছিলাম, এই ত এসে গেলাম, কলকাতা থেকে হরিদ্বার, হরিদ্বার থেকে হৃষীকেশ, আর হৃষীকেশ থেকে ধরাসু। যাত্রা-ইতিহাসের প্রথম পরিচ্ছেদ আজকেই শেষ; ধরাসু এসে গেলাম। কাল থেকে সূর্য্য উঠার আগেই সুরু হবে পায়ে হাঁটার পথ, আটচল্লিশ মাইলের দুর্গমতম পথ পরিচয়ের যেখান থেকে সুরু। কামনা করেছিলাম সঙ্গীর। পাই নি, সঙ্গিহীনতাই থেকে গেছে। ধরম সিং এসে সঙ্গী ও বাহকের অভাব দুটোই পূরণ করে দিয়েছে। কোথা থেকে কি ভাবে যে সে এসেছে তার বিচার-বিশ্লেষণ আমি করি নি, আমি পেয়েছি—এইটুকুই সত্যি।

ভাবছিলাম, মায়ের ইচ্ছে কি, সন্তানকে তিনি কি ভাবে পথ দেখাবেন, কি ভাবে আলো দেখাবেন ? তাঁকে বুকের পাঁজরের ভেতর আষ্টেপিষ্টে বেঁধে নিয়ে এসেছি, এ নিয়ে আসা কি ব্যর্থ হবে? বিয়াল্লিশটা বৎসরের জীবন-ইতিহাসের পাতায় পাতায় যে খুদকুঁড়ো জমিয়েছি—রাজরাজেশ্বরী মা আমার কি তা নেবেন না ? বহুক্ষেত্রে তিনি নিয়েছেন, আবার ফিরিয়েও দিয়েছেন। আজকে সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারের কুহেলিকায় এই কথাটাই ভাবতে ভাবতে চিন্তা হ'ল যে কোন এক অদৃশ্য পাপের ভারে আজকের আসার ভারসাম্যের দড়িটা না ছিঁড়ে যায়। সিদ্ধযোগী মহাপুরুষদের আবাস স্থল, তাপস ও সাধকদের লীলাভূমি এই যমুনোত্তরী ও গঙ্গোত্তরী, তাঁদের দেখা যদি না পাই, আমার মাথার উপর হাত রেখে এ মরসংসার থেকে যদি মুক্তির আশীর্ব্বাদটুকু না করেন, তা হলে আমার আসাই বা কেন, পথ চলাই বা কেন ? হঠাৎ আমার কান্না এল এই ভেবে যে সেই ব্যর্থতার আঘাত আর লাঞ্ছনা যদি মা আমার এনে দেন, তা হলে আমি বোধ হয় বাঁচব না, খান্ খান্ হয়ে ভেঙে যাব।

হঠাৎ··· ।

একটা ভারি গলার আওয়াজ—"এ পাগলা, চললি ?"

চোখ দুটো বোজাই ছিল, ধড়মড়িয়ে উঠলাম। দেখি খোলা দরজাটার দুটো কপাটের উপর হাত রেখে একটা অদ্ভুত পাগলা গোছের লোক। খালি গা, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল একমাথা, ছেঁড়া একটা কুর্ত্তা পরা, দুটো পায়ে দুটো পট্টি। হা-হা করে হাসল একবার, তারপর আর একবার ঐ কথা কয়টির পূর্ব্বানুবৃত্তি—"এ পাগলা, চললি ?" কথাটা এত স্পষ্ট, এত নগ্ন যে, গোটা ঘরটায় তাই যেন ঘুরে বেড়াতে লাগল। তারপর দেখলাম, আর কোন কথা না বলে পাশের বারান্দা থেকে একটি

মহিলাযাত্রীর কাছ থেকে কি যেন নিল, সম্ভবতঃ কোন খাদ্যবস্তু, তারপর মাথাটা রেলিঙের উপর দিয়ে ঝুঁকিয়ে আমার দিকে একবার অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে সিঁড়িটা দিয়ে হন্-হন্ করে নেমে চলে গেল।

পাঁচ মিনিটের ব্যাপার, তার অন্তর্দ্ধানের পর আমার হুঁস হ'ল যেন—আমি সম্বিৎ ফিরে পেলাম। মুহূর্ত্তের মধ্যে বুঝলাম, এ লোকটা অনন্যসাধারণ তথা অসাধারণ হতে পারে। "এ পাগলা, চললি?" কথাটায় মন কেমন যেন ঘুলিয়ে উঠল। ধরাসু থেকেই কি সুরু হ'ল? এত তাড়াতাড়ি, এত আকস্মিক? চিনতে পারলাম না বোধ হয়, ধরতেও পারলাম না হয়ত! ইলেকট্রিক শক্ খেয়ে গেলাম যেন। ধরম সিং ততক্ষণে এসে হাজির—হাতে তার বেকারীর ওপর ডাল ও রুটির সমারোহ। বললাম, "তুই রেখে দে, আমি একটু ঘুরে আসি।"

অবোধের মত জিজ্ঞাসা সুরু করি ধর্ম্মশালার তলাকার দোকান-গুলোর লোকজনকে, আশে-পাশের মানুষগুলোকে। তাঁর শরীরের বর্ণনা দিই, বেশভূষার তথ্য জানাই, বলি, এই রকম চেহারা, এই রকম তাঁর কথাবার্ত্তা। তারা ঘাড় নাড়ে—বুঝি, জানে না। এক ছুটে চলে আসি গঙ্গার ধারটায়···নির্জ্জনতার একটা প্রকাণ্ড ঘেরা-টোপ দিয়ে ঢাকা সমগ্র উপকূলভাগ, আশেপাশের পাহাড়-পর্ব্বত, চারিদিক যেন ঝাঁ ঝাঁ করছে। খুঁজে বেড়াই হিষ্টিরিয়া রোগীর মত, কিন্তু কোথায় কে? তিনি চলে গেছেন, কর্পূরের মত উবে গেছেন···।

যোগাযোগের প্রথম পাতা এটি। বুঝলাম সুরুতেই যার সম্পদ, না জানি যমুনোত্তরীর গর্ভে কি আছে। জানলাম মহামায়ার অদৃশ্য খেলার প্রথম অঙ্কটি এই ধরাসু থেকেই সুরু।

॥ তিন ॥

ভোর পাঁচটায় যাত্রা। ধরম সিং পিঠের উপর বিছানাটাকে মোক্ষমভাবে বেঁধে নিল, আমি নিলাম লাঠি, ছাতা আর কাঁধে বার্ম্মিজ ব্যাগ। সেই অনামী পরিবারটি অর্থাৎ বীরবলের সংসার আমার আগেই রওনা হয়ে গিয়েছিল—আমি হলাম দ্বিতীয়।

কুমারীর সীমন্তের মত উত্তর-পূর্ব্বকে লক্ষ্য করে একটি সরু রাস্তা গঙ্গার ধারে ধারে উত্তর কাশীর দিকে চলে গেছে। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর একটি ঝর্ণার স্রোতধারার উপর স্থানীয় পূর্ত্ত-বিভাগের তরফ থেকে পুল তৈরী করার প্রয়াস চোখে পড়ল, এটি সম্পূর্ণ হলে উত্তর কাশী পর্য্যন্ত টানা মোটরের রাস্তা তৈরী করার আয়োজনও সুরু হবে। প্রথমে সমতলভূমি, তারপরই ঐ সরু রাস্তাটা ধাপে ধাপে চড়াইয়ের উপর উঠে গেছে। প্রায় এক মাইল এমনি করেই উঠে যাওয়া, তারপরই বাঁ-দিকে রাস্তা চলে গেছে, যে রাস্তার প্রথমেই বার্ত্তাফলকের উপর বিজ্ঞপ্তি—"রোড টু যমুনোত্তরী।"

একটি মাত্র বাঁক, তারপরই গঙ্গার অদৃশ্য হয়ে যাওয়া—তাঁর উচ্ছ্বাসও শোনা গেল না, প্রকৃতপক্ষে যমুনোত্তরীর পথ এখান থেকেই সুরু।

আর সুরুতেই পাইন গাছের সমারোহ, শ্রেণীবদ্ধ পাহাড়গুলোর উপর প্রত্যেকটি অংশেই যার আধিপত্য। মনে হ'ল, গবর্ণমেণ্টের 'রিজার্ভ ফরেষ্টের' ভেতর ঢুকে পড়লাম। আর সত্যিই তাই, একটি বিরাট পাইন গাছের কাণ্ডের উপর বিজ্ঞপ্তি—"নো স্মোকিং—রিজার্ভ ফরেষ্ট।" চার মাইলের মাথায় কল্যাণী পেরিয়ে গেলাম, দুটি মাত্র

চায়ের দোকানের অস্তিত্ব—লোকালয়হীন। চলছিলাম একা, বড় ভাল লাগছিল চলতে : ধ্যান আসে, যদি সদ্‌গুরুর দেওয়া মন্ত্র থাকে। বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত্তে ব্যক্তিকেন্দ্রিক একাকিত্বটা সম্পদ হয়ে ওঠে আর তা বোঝা যায় এই সব পথে যার সবটুকুই অসীমের হাতছানিতে সমৃদ্ধ।

বেশ চলছিলাম আপন মনে চার দিকে তাকাতে তাকাতে, হঠাৎ সামনে দেখি জিজ্ঞাসার চিহ্নের মত পায়ে চলার রাস্তাটা আচম্‌কা কোথায় হারিয়ে গেল। ব্যাপার কি ? উঁকি মেরে দেখি, পথ আছে, তবে সে আপন কৌলীন্যকে অযথা খর্ব্ব করে নি......এ পাশে হাঁ করা খাদ, ওপাশে পাহাড়ের একটা খাড়াই পাঁচিল, তার পাশ দিয়ে আধবিঘত পরিমাণ প্রস্থ রাস্তা, পিছু হটে আসার উপায় নেই, ওর উপর দিয়ে খাদ পেরিয়ে এক ফার্লং দূরের চওড়া রাস্তায় গিয়ে উঠতেই হবে। থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। মনে হ'ল ধরম সিং আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করি, তারপর মনে হ'ল বীরবলের মা, বৌ, ছেলে যখন এ রাস্তা পেরুতে পারে তখন আমিই বা পড়ে থাকি কেন ? লাঠিটা শক্ত করে চেপে ধরি, নিশ্বাসটাকে ভাল করে টেনে নিই, তারপর ঐ আধবিঘত রাস্তায় উঠে পড়ি। আধ ঘণ্টার উপর লেগে গেল এইটুকু রাস্তা পেরুতে।

হিমসিম খেয়ে রাস্তার এ দিকে আসতেই দেখি, একটা পাথরের উপর উবু হয়ে বসে আছে একটি সাধুগোছের মানুষ, যাঁর দৃষ্টি আমার উপর সম্পূর্ণভাবে নিবদ্ধ। চুল দাড়ি ত আছেই, বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দেখলাম গলাটা সাধারণ মানুষের অপেক্ষা অনেক স্থূল। এ আবার এল কোত্থেকে ? আর এ জায়গায় সজাগ প্রহরীর মত বসেই বা আছে কেন ? মনে করলাম এড়িয়ে যাই, আমারই মত কোন অনামী যাত্রী হবে

বা—খাদ পেরিয়ে দম নিচ্ছে! কিন্তু মূর্ত্তিটির দিকে আর একবার তাকাতেই থেমে গেলাম, কে যেন থামিয়ে দিল আমাকে। মনে হ'ল, একটু বিশ্রাম করে যাই এঁরই পাশে বসে, ততক্ষণে ধরম সিং আসুক।

বিধাতাপুরুষ অদৃশ্যে হাসেন। আমার ক্ষমতা কি যে আমি এই অর্ব্বাচীন গোত্রহীন মানুষটিকে এড়িয়ে যাই! বসে পড়ি আবিষ্টের মত একটা পাথরের উপর।

আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসেন, তারপর বিনা ভূমিকাতেই সুরু করেন—"মুঝে মালুম থা, আপ যমুনোত্তরী জায়েঙ্গে, ইস লিয়ে ম্যয় ইঁহা হাজির হুঁ। দো কাম করনা। ঘর লউটনেকে বাদ পনের রোজ কহীঁ মাত যাও। দো, কিসিসে প্রণাম মাত লিও।"

বাঁশীর মত গলার আওয়াজ—অথচ এ আওয়াজটি এল ঐ অস্বাভাবিক স্থূল গলার ভেতর দিয়ে।

প্রণাম করলাম, প্রণাম নিলেন। ধরম সিং-ও এসে বোঝা নামাল আর কোন কথা না বলেই প্রণাম করল এঁকে। মৃদু হাসলেন, তারপর উঠে পড়ে যে পথ দিয়ে আমরা এসেছি সেই পথ দিয়ে চলে গেলেন। কথা বলবার অবসর পেলাম না, কথা বলবার অবসর দিলেন না। শুধু বাতাসে দুটি আদেশ ভেসে ভেসে বেড়াতে লাগল, "ঘর লউটনেকা বাদ পনের রোজ কহীঁ মাত যাও। কিসিসে প্রণাম মাত লিও।"

কথা হচ্ছে এই, ধরাসু-র ধর্ম্মশালার সেই অদ্ভুত মানুষটি আর এই মানুষটি এক কি না। বস্তুতান্ত্রিক বিচার এখানে নয়, এর বিচার সূক্ষ্ম বুদ্ধির সবটুকু দিয়ে। গত বৎসর বদরীকার পথে পিপুল-কুঠীর আগে ঠিক এই রকম এক রহস্যের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, যার প্রভাব থেকে এখনও মুক্ত হতে পারি নি বা পারা যায় না। প্রশ্ন হ'ল এই, আজকের এই ঘটনা তারই এক নতুন সংস্করণ কি না। এ

পথে যে সবকিছুই সম্ভব, তার চুলচেরা হিসেব পেয়েছি যতপথ চলেছি, যত 'মাইলেজ' পেরিয়ে গেছি। সারা রাস্তাটা এ ছুটি মানুষের কথা চিন্তায় এসেছে আর ছুটিকে একটি নরমূর্ত্তিতে রূপান্তরিত করবার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছি। যোগবিভূতির সাহায্যে নররূপের পরিবর্ত্তন ত জানা—এও কি তাই, না অন্য কিছু। মানুষ ত আমরা, ভেতরে বদ্ধ মান্ধাতা আমলের অবিশ্বাস যাবে কোথায়! সেইজন্যে আলো দেখেও চোখ বুজে থাকি, তার্কিক বুদ্ধিতে সম্পদ যায় নষ্ট হয়ে। কিন্তু কুয়াশা কেটেছিল বড় বেশী করে বাড়ী ফেরার পর। এঁর ছুটি আদেশের মর্ম্ম যখন জ্যামিতিক বিচারের ন্যায় আমার কাছে জ্বলজ্বলে হীরের মত স্বচ্ছ হয়ে উঠেছিল তখন বুঝেছিলাম কি ঐশ্বর্য্য আমি ফেলে এসেছি।

এর কাহিনী এখন নয়, পরে যখন বাড়ী ফিরব।

কল্যাণীর পর কুমরারা—পাঁচ মাইলের মাথায়। এ কয়েক মাইল ধরম সিং আমার পাশে পাশেই এসেছে, কেন কে জানে। আপন মনে গল্প করে চলছিল এখানকার অলৌকিক ঘটনাবলীর রহস্যঘন ইতিহাস—এখানকার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের কথা ও ঐশ্বর্য্যের কথা। কতক শুনছিলাম, কতক নিজস্ব চিন্তায় ডুবে যাচ্ছিল, তবুও ও থামে নি। বলে যাচ্ছিল সাধুসন্তদের কথা, মহাত্মাদের কথা, সিদ্ধ যোগীপুরুষদের কথা। ওর মতে "আচ্ছা আদমী"দের ভগবান দেখা দেন, 'দেওতা' তাদের পথ দেখান। বলছিল, উত্তর কাশীর দক্ষিণে আটানব্বই মাইল দূরে "সগরু"তেই নাকি ভয়ানক ভয়ানক জিনিস আছে—সে অঞ্চলে একবার যেতে পারলে জীবনে নাকি অ-পাওয়া বলে কিছু থাকে না। যমুনোত্তরী-ও তাই, তবে "সগরু"র মত কেউ নয়। ভবে তার মতে পুণ্যের ভাণ্ডার শূন্য না হলে এ অঞ্চলেও অনেকটা অভাব মেটে। পিঠের উপর বোঝা নিয়ে সতের-আঠার বছরের উত্তর কাশীবাসী ধরম সিং বলছিল এ সব

তথ্য-ইতিহাস—এ বলার ভেতর তার সবটুকু বিশ্বাস সবটুকু নির্ভরতা··· শুনতে শুনতে চলছিলাম! এ ক'দিনেই ধরম সিং আমার মনের ভেতর বাসা বেঁধে ফেলেছে, অদৃশ্য মায়াজালে আমি ইতিমধ্যেই আটকা পড়েছি। অপরের কাছে এর পরিচয় শুধু নগণ্য কুলী বা বাহক, কিন্তু আমার কাছে ও বন্ধু বা সাথী। সহযাত্রীদের বলতে বলতে গেছি—পথ থেকে একে পাওয়া এক মুঠো শিউলি ফুলের মত। ধরম সিং মনুষ্যত্বে গরীয়ান, সেবাধর্ম্মে প্রকাশমান, যার ক্রম-ইতিহাসের পাতা একটার পর একটা খুলে গেছে পথচলার রোজনামচায়। ভগবানকে দেখা যায়, হাত দিলে ছোঁওয়া যায়, তার স্বর্ণময় অধ্যায়ের ব্যঞ্জনা করতে করতে চলছিল ধরম সিং—অর্ব্বাচীন ছোট্ট এক পাহাড়ী ভগবান। এই শোনা আর না-শোনার মূর্চ্ছনার মধ্যে দিয়ে কুমরারা পেরিয়ে গেল, আরো দু'ফার-লঙের মাথায় ব্রহ্মতাল এসে হাজির। সেই পাইন গাছের মধ্যে দিয়ে এ কয়েক মাইল চলে এলাম, ঠাসবুনুনী সর্ব্বত্র, কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। কমসে কম ন' মাইল হেঁটে এলাম, কোন কষ্ট নেই কোন অবসাদ নেই। এ পথটুকুতে চড়াইয়ের বেশী উৎপাত নেই, সেই সুরুতে যা একটু পেয়েছিলাম এই যা। ধরম সিং এসে বোঝা নামাল—ঘরও পেয়ে গেলাম পুরোপুরি একটা। কিছুক্ষণ পরে বীরবলের সংসার এসে হাজির এবং আমার ঘরেই তাদের বিছানা পড়ল। গাড়োয়াল রাজ্যের সর্ব্বত্র ধর্ম্মশালাগুলোর সেই একই নিয়ম, চারজনের জন্যেই ঘর মিলবে; একজনের জন্যে নয়। কেদারবদরীর পথে এ নিয়ে কত ভুগেছি এই চারজনের সংখ্যা মেলে নি বলে। এখানে সে অভাবটা ভগবান রাখেন নি। আমি রোগা ডিগডিগে মানুষ, সকলের পেছনে রওনা হয়ে আগে পৌছতাম আর ঘর দখল করতাম, তারপর বীরবলের মা, বৌ, ছেলের আগমন হয়ে সংখ্যায় চার হ'ত, হাঙ্গামা থেকে রেহাই পেতাম।

বীরবলের সংসারটি আমাকে যমুনোত্তরী পর্য্যন্ত আর সেখান থেকে উত্তরকাশী পর্য্যন্ত ছায়ার মত অনুসরণ করেছে, এদের আমি কোথাও এড়াতে পারি নি। আমাকে তারা অতিমানুষের পর্য্যায়ে নিয়েছিল, আর তার জন্য আতিথেয়তা ও সেবাপরায়ণতার যে দৃষ্টান্ত খাড়া করেছিল, তার তুলনা পাই নে কোথাও। কোথায় আহমদাবাদ আর কোথায় রাণাঘাট, পথে তার পরিচয় ছিল না, সংজ্ঞা ছিল না—আমরা একটি প্রয়াগে এসে মিশেছি, কোথাও এতটুকু বাধে নি। আমাকে তারা যা নই তাই বলে মনে করেছে, তাদের এ ভাবপ্রবণতাকে দূর করবার হাজার চেষ্টা করেও পারি নি। নিষ্কৃতি পাবার জন্যে পা চালিয়ে গিয়েছি নির্দ্দিষ্ট চটি ছাড়াও অন্য কোথাও রাত্রের আশ্রয়ের জন্যে, দেখেছি ইংরাজী 'এপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশনের' মত এরা হাজির। "বাবাজীকো মিল গিয়া—" এই আবিষ্কারের তত্ত্বেই তারা আনন্দ পেয়েছে, খুশী হয়েছে। ধরম সিংকে পাওয়াও যেমন যোগাযোগ, এ বীরবলের সংসারটিকে পাওয়াও তেমনি।

বেলা তখন তিনটে কি চারটে, ঘড়ির বালাই নেই, কাছে ছিলও না। ধরম সিং তার যথানির্দ্দিষ্ট কাজগুলো সেরে দিয়ে গেল অর্থাৎ, মোট নামিয়েই সে বিছানাটা পেতে ফেলল। আমার তাকে বলাই ছিল যে, ঘরে বিছানা খুলে আগে পেতে ফেলবে, আর এসেই আমি খানিকটা জিরুব, অন্য কাজ সব পরে। এখানেও তার ব্যতিক্রম হ'ল না—জামা কাপড় না ছেড়েই শুয়ে পড়লাম বিশ্রামের আশায়। একটানা ন' মাইল পথ হেঁটেছি, কিছুক্ষণ শুয়ে পড়ার দরকার। ধরম সিং নেমে গেল তলায় চাল ডাল কিনতে, বীরবলরাও তাই—ঘরে শুধু সেই ছোট্ট শিশুটি শোয়ান রইল, সহ অস্তিত্বের নীতি নিয়ে।

কেমন যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবেই শুয়ে ছিলাম। চোখ দুটো খোলা

ছিল বটে, কিন্তু মনের চোখ ছুটো ছিল বোজা। খিন্ন অবসন্ন দেহ, একটানা ন' মাইল চড়াই-উতরাই করতে করতে এসেছি...লম্বালম্বি ছ'পা মেলে দিয়ে হাত ছুটোকে বালিসের তলায় দিয়ে খোলা দরজাটার দিকে শুধুই তাকিয়ে ছিলাম। ভাবনা যে আসছিল না তা নয়, আসছিল, এটা, ওটা, সেটা···ভাবনারই একটা তরঙ্গ খেলা করছিল অচেতনায় আর অনড় হয়ে চোখ ছুটো খুলে রেখেছিলাম শুধু। দরজাটার সামনেই একটা ছোটখাট পাহাড় রাস্তার পাশ দিয়েই উর্দ্ধমুখে উঠে গেছে, শুয়ে শুয়ে তার অর্দ্ধ অবয়বটাই শুধু দেখতে পাচ্ছি··· ।

তন্দ্রা ও দিবাস্বপ্নের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ চলেছে—যা ভাবছি তার সমাপ্তি হচ্ছে না, কেমন যেন একাকার হয়ে যাচ্ছে সব।

একটি মেয়ে···গৌরবর্ণা, লাবণ্যময়ী, কল্যাণী, অসূর্য্যম্পশ্যা। যেন দেখতে পেলাম সামনের পাহাড়টার বাঁকের বাঁ দিক থেকে নেমে আসছে। ফিকে সবুজ রঙের সাড়ীটা অদ্ভুত সুঠাম দেহবল্লরীর ওপর জড়ান, ঝিঁঝিঁর পাতের মত পাতলা সাড়ী···কাঁচা সোনার রং যেন ফেটে বেরুচ্ছে সারা অঙ্গ দিয়ে। তরতরিয়ে নেমে এল মেয়েটি—এ নেমে আসা কাব্যের ছন্দ, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা। আঁকা-বাঁকা বিজন পথ... উত্তর প্রান্ত থেকে নেমে এসে দক্ষিণ প্রান্তে মিলিয়ে গেল যেন।

ফিকে সবুজ সাড়ী···কাঁচা সোনার রঙ···উন্মুক্ত হাতের ওপর সোনার বাজু, মাথার সীমন্তে টিকলী। হাওয়ায় সে মেয়ে যেন মিশে গেল··· ।

স্বপ্ন ?

—তাই হবে বা। পাগলের মত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। কেউ নেই কোথাও, সামনের পাহাড়টা শুধু বোবা হয়ে আছে।

তার কি মায়া ? না, শুধু স্বপ্ন ?

যাত্রা সুরু থেকে আমার এ কি আরম্ভ হ'ল। একটার পর একটা প্রহেলিকা, যাদের প্রামাণিক তথ্য নির্ব্বাকই থেকে যাচ্ছে, প্রমাণ থাকছে না।

ঝিম ঝিম করে ওঠে শরীর, অকারণে ঘেমে উঠি। চোখে হাত দিলাম, দেখি, কাঁদছি—কখন অশ্রু নেমেছে বুঝতে পারিনি...।

কে এই মেয়ে ? ফিকে সবুজ সাড়ী পরা ? একটা অব্যক্ত প্রশ্নের ভারে আমি যেন স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

ঐ ত পথ, ধর্ম্মশালার পাশ দিয়ে উত্তরাভিমুখী হয়েছে—তার মিশিয়ে মিলিয়ে যাওয়া ত ঐ পথেরই প্রান্তে ! আঁকাবাঁকা পথ... পাহাড়ী পথ, ওইখানেই ত অদৃশ্যতার আলেয়া !

আর অপেক্ষা করা নয়, দাঁড়ান নয়···এগুতে হবে। ও পথটাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে নেওয়া দরকার, ও পথটাকে জীবন দিয়ে জানা দরকার। কে বললে যেন ভেতর থেকে, "তুই এখানে থাকিস না। পথটাকে ভাল করে খোঁজ, পাবি।"

ধরম সিংকে জানাই না, শুধু বলি, "এখানে থাকব না, ওসবগুলো বেঁধে নাও।"

"কাহে বাবুজী ?"

উত্তর দিই না। বোঝে—সিদ্ধান্ত অপরিবর্ত্তনীয়।

ব্রহ্মতাল থেকে সিলকিয়ারা—প্রত্যেক পাদবিক্ষেপটিতে ছিল সমগ্র জীবনের অনুসন্ধিৎসা ও জিজ্ঞাসু মন।

কিন্তু ছলনাময়ী ছলনা রেখে গেল···পেলাম না। এ কাহিনীর ইতি এখানে নয়—এর চরম পরিণতি ঘটেছিল যমুনোত্তরী মন্দিরের কাছাকাছি। অসম্ভব সে কাহিনী—অবিশ্বাস্য সে এক ইতিহাস—যা

আমার জীবনে শুধু চিরন্তন কান্নাকেই এনে দিয়েছে, অবদান হিসেবে রেখে গেছে ব্যর্থতার হতাশা আর শূন্যতার হাহাকার।

সিলকিয়ারা পৌছানোর আধ ঘণ্টার মধ্যেই বীরবলরা এসে হাজির। প্রথমে এল বীরবলের বৃদ্ধা মাতাজী, তার পর শিশু কোলে ওর বৌ, তারপর লাঠি হাতে ঠক ঠক করতে করতে বীরবল। অমাকে পেয়ে কি খুশী ওরা। অভিযোগ জানাল, তাদের না বলে কয়ে চলে এসেছি কেন। ওদের ছেড়ে আসার কোন অধিকারই নাকি আমার নেই। তথাস্তু। তাদের অভিযোগকে মেনে নিলাম, বললাম, আমার অন্যায় হয়েছে।

ধৰ্ম্মশালায় পৌছানর পর খাওয়া দাওয়া শেষ করে বীরবলের প্রথম কাজই ছিল মাতৃসেবা, যা তুলনাহীন, এক সম্পদের মত। এ রকমটি আমি দেখিনি কোথাও। আগে এক বাটি তেল গরম করে নিয়ে আসত বীরবল, তার পর মাকে ধরাশায়ী করে কঙ্কালসার পা-দুটিকে কোলের ওপর টেনে নিত আর সুরু হ'ত মালিশ, এ মালিশ খাঁটি আহমদাবাদী, বাঙালীর হাতে যা কখনই সম্ভব নয়। বৃদ্ধা চুপ করে পড়ে থাকতেন আর মৃদু মৃদু হাসতেন। প্রথমে দুটি পা, তার পর হাত বুক ও পিঠ। ঝাড়া এক ঘণ্টা এই কাজ, তারপর ভূমিষ্ঠ হয়ে মাকে একটি পরিপূর্ণ প্রণাম সেরে রুক্মিণীবাঈকে নিয়ে পড়ত। স্ত্রী যার কাছে লক্ষ্মীরূপিণী, তার কাছে আমি ঘরে আছি কি নেই তার প্রশ্ন ওঠে কি করে? কি অসীম মায়াপরবশ হয়ে বৌয়ের ছোট্ট পা দুটি তুলে নিত, দেখলে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। এর পরে পূর্ণ আক্রমণ হ'ত আমাকে লক্ষ্য করে—আমার পা ও মালিশ করবেই। দুকূলভাঙা সৰ্ব্বগ্রাসী বানের মুখে আমার প্রতিবাদ খড়ের কুটোর মত, তাকে ঠেকান যায় নি।

আমরা গৃহগতপ্রাণ মানুষ, পিছটানের মানুষ। একটা হয় ত

ছুটো হয় না, ছুটো হয় ত চারটে মেলে না। ভগবান পথ দেন নি, ঘর দিয়েছেন; মায়া দিয়েছেন, বৈরাগ্য দেন নি···আমরা শুধু সংসারের ফসল বুনে যাই, গেঁথে যাই। দিনগত পাপক্ষয়ই হ'ল সঞ্চয়,—জীবনের মূলধন। যদি বা পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির টানে সুদূরের হাতছানি আসে, এড়িয়ে যাই এই বলে যে সংসারকে আমার কে দেখবে? অকাট্য এই অজুহাতের যুক্তি, যার পাপে আমাদের সবকিছু শুকিয়ে গেল।

কিন্তু বীরবলের মত গোটা সংসারকে যদি এই মহাতীর্থের অঙ্গনে শেকড় শুদ্ধ উড়িয়ে নিয়ে আসা যায়, তবে মায়াই বা আসে কোথায়, তিতিক্ষার পথে আগড়ই বা দেয় কে? এ ত পেছনে কিছু রাখে নি, ফেলে আসে নি ত কিছু··এর আসা মহত্তম যোগাযোগের আসা, কল্যাণের আসা। তাই মাতাজী এর কাছে শুধুমাত্র গর্ভধারিণী নয়, মাতাজী বীরবলের কাছে রাজরাজেশ্বরী-ভবতারিণী। ব্রহ্মাণ্ডপ্রসবিনী মাতৃস্বরূপাকে সে দর্শন করেছে তার সর্ব্বস্ব মাতাজীর ভেতর—তাই ত বীরবল সম্পূর্ণ। সুদূর আহমদাবাদের এক নিভৃততম পল্লী অঞ্চলে আঠার বছরের বীরবল একদা হোমাগ্নির সামনে মন্ত্রের সজ্ঝারামে সেই যে কিশোরী গ্রাম্যকন্যা রুক্মিণীর ছোট্ট হাত ছুটো তুলে নিয়েছিল—আজকে যমুনোত্তরীর ছুস্তর ছুর্গম পথের প্রান্তে সেই যুক্ত করাঙ্গুলির সার্থক রূপটি দেখতে পাই। ভগবান যাকে যোগ করে পাঠিয়েছেন, বীরবল তাকে বিয়োগ করিয়েছে। বৈরাগ্যের উত্তরীয় বীরবল রুক্মিণীকে পরিয়েছে, রুক্মিণী পরিয়েছে বীরবলকে। সার্থক এ সংসারটি!

॥ চার ॥

দ্বিতীয় দিনের পথ হাঁটা সুরু হ'ল আমাদের। সামনে এক বিদ্‌ঘুটে চড়াই, এটা পেরুতে পারলেই ডিণ্ডিলগাঁও, তারপর শিম্‌লী ও গাংনানী। কমসে কম সাড়ে ছ'মাইলের চড়াই আর এ চড়াটুকুর মধ্যে কোন খুঁত নেই...অর্ব্বাচীন বিদ্রোহীর মতই এর ঊর্দ্ধাকাশে উঠে যাওয়া। সিলকিয়ারার বুক থেকেই এক ঐরাবত পাহাড়শ্রেণী উত্তর-পূর্ব্বদিককে বেড়া দিয়ে রেখেছে যেন, আর এর ওপর দিয়ে সর্পিল পাকদণ্ডীর পথ। এখান থেকে শোনা গেল, সাধারণ যাত্রীরা ঐ চড়াইয়ের ওপর কোনরকমে উঠেই ফুরিয়ে যায়, নড়বার ক্ষমতা পর্য্যন্ত থাকে না। ডিণ্ডিলগাঁও আপাততঃ সকলের লক্ষ্য, উৎসাহ ও উদ্যম—সেইখানেই ইতি।

দ্বিতীয় দিনের চলা সুরু হ'ল ভোর না হ'তে হ'তে। সিলকিয়ারার সামনে থেকেই এক অতিবৃহৎ পাহাড়, কত যুগের সাক্ষী কে জানে? ঊর্দ্ধাকাশে হারিয়ে গেছে অনন্ত জিজ্ঞাসার মত। ইতিহাসের স্বীকৃতি হ'ল যমুনোত্তরীর পথ সহজ নয়, ও তীর্থ দুরারোহ ও দুর্গম। এ দুটি কথার স্বরূপ ধরা পড়ে এই চড়াইয়ের সুরু থেকে। পথ ভাল হলে উঠে যাওয়ার ভেতর তবু সান্ত্বনা থাকে, কিন্তু যমুনোত্তরীর পথের এ সব বালাই নেই। মা যমুনা পথের ছায়া ফেলে রেখেছেন মাত্র তীর্থযাত্রীদের জন্যে, আর কিছু দেন নি : পূর্ণ করে রেখেছেন তাঁর সাম্রাজ্যকে শুধু পাষাণস্তূপ আর বিক্ষিপ্ত উপলখণ্ড দিয়ে,—যাত্রীদের সম্বল শুধু ঐ পথের ছায়া। এ কেদারনাথ বা বদরীকানাথ নয় যে আধুনিক সভ্যতার

সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার যাত্রীর পথচলার কৌলীন্য আছে—মা এখানে নিরাভরণা। যমুনোত্তরী গঙ্গোত্তরী তীর্থ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সৃষ্টিতত্ত্বকে শুধু উপেক্ষাই জানিয়েছে...দুর্গমতাই এ তীর্থদুটির সকল সঞ্চয়। তাই পথ এখানে পথ নয়, পথ এখানে ছায়া··· ।

ডিণ্ডিলগাঁ-এর চড়াই এই ছায়াপথের প্রথম সাক্ষী, সাধারণ যাত্রীদের এই পাহাড়ই প্রথম তালঠুকে স্পর্দ্ধা জানিয়েছে। খাড়াই পাহাড়ের ভিত্তিমূল থেকে উর্দ্ধদেশ, নৃতত্ত্ববিদের হিসেবে ছ' মাইল, আর এই ছ' মাইলের প্রথম তিন মাইল চড়াই হিসেবে আদি ও অকৃত্রিম। বুকে নিশ্বাস থেমে থেমে যায়···শারীরিক ভারসাম্যের একটা পরীক্ষা আসে এখানে। বীরবলের সংসার আগেই রওনা দিয়েছিল, তারা জানত লম্বা লম্বা পা ফেলে আমি তাদের পাশ দিয়ে বেরুবই। এখানে হ'লও তাই। সাড়ে তিন মাইলের মাথায় ওদের ধরে ফেললাম, দেখলাম বীরবলের মাতাজী একটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের মূর্ত্তিরূপিণী হয়েই এগোচ্ছেন সকলের আগে, তারপর শিশুকোলে রুক্মিণী, পেছনে বীরবল। পাইনের সেই অরণ্য চলেছে—পাখীর ডাক শুনছি, আর এই অরণ্যের উর্দ্ধে পাহাড়ী হাওয়া চলার একটা সাঁ সাঁ আওয়াজ—অদ্ভুত এক ভাল লাগা —অদ্ভুত এক অনুভূতি। যাত্রী যারা যাচ্ছে তারা সংখ্যায় অল্প, আঙুলে গুনে তাদের ধরা যায়। বাঙালী আমি এখনও দেখলাম না, গোটা বাংলা দেশের মূর্ত্তিমান সাক্ষী হয়েই এখনও আমার পথ চলা।

চার মাইলের মাথায় যে চড়াই তার আগে একটা মজার ব্যাপার ঘটে গেল। আমার আগে চলছিল একজন বম্বেওয়ালা, ঠিক তারই পেছনে সে কুলীকে রেখেছে নিজের সতর্ক দৃষ্টি বরাবর, যেটা সাধারণতঃ এ সব অঞ্চলে হয় না। যাত্রী এগিয়ে যায়, তার বহুদূরে পড়ে

থাকে বাহক, কিন্তু তারই ব্যতিক্রম ঘটেছিল। হঠাৎ পরিষ্কার দেখতে পেলাম বম্বেওয়ালার বাহকের পিঠের বোঝা গড়াতে স্নুরু করল, বুঝলাম দড়ি ছিঁড়েছে। এখানে মাধ্যাকর্ষণের একাধিপত্য আর এই সর্ব্বনেশে ব্যাপারটি থেকে সেই দু'মণী বোঝাও রেহাই পেল না, হু হু শব্দে সে গড়াতে গড়াতে তলায় নামতে লাগল। এত কষ্টের ভেতরেও হাসি এল আমার—মনে হ'ল বাহক হারে কি বোঝা হারে! বোঝাটি একবার এ গাছে আটকে কিছুটা থামে, আবার গড়াতে গড়াতে আর একটা গাছে আটকে থেমে দম নেয়; কিন্তু তার গড়ান আর থামে না, ধ্বস নেমে আসার মতই তার অবস্থা। তারপর দেখলাম, অন্ততঃ তিনশ' ফুট এক টানে নেমে এসে সেই বৃহৎ বস্তুটি দুটি গাছের মাঝখানে আটকে থেমে গেল, আর নড়ল না! যাক, তবুও রক্ষে! বম্বেওয়ালা ওপরে থাকলেন আর বাহকের এই তিনশ' ফুট নিচে নেমে এসে বোঝা কাঁধে তুলে নিয়ে আবার ওপরে ওঠার ব্যাপক প্রাণান্তকর পরিশ্রম স্নুরু হ'ল। বেচারা!

ডিণ্ডিলগাঁওয়ের চড়াই যখন শেষ করে পাহাড়ের ওপর ওঠা গেল, তখন বেলা দশটা। শরীর ঘেমে উঠেছে, মনে হ'ল কোথাও একটা যুদ্ধের মহড়া দিয়ে ফিরছি। একটিমাত্র চায়ের দোকান, সর্ব্বক্লান্তিহর, মনে মনে একে বন্দনা করে নিলাম। বিশ্রাম নিলাম কিছুটা, সেই সঙ্গে কড়া এক ভাঁড় চা। ধরম সিং আর বীরবলরা কখন এসে পৌছবে কে জানে?

ডিণ্ডিলগাঁওর যে উতরাই, তার সীমা গাংনানী পর্য্যন্ত। একটানা উতরাই—এবার শুধু নেমে যাওয়ার পালা। পাহাড়ের উপর উঠে মনে হয় বিরাট একটা মালভূমি আস্তে আস্তে নেমে চলে গেছে যমুনার ধার পর্য্যন্ত। যমুনা এখান থেকে সম্পূর্ণ প্রকাশমানা নয়, তাঁর সাক্ষাৎ

মিলবে গাংনানী পৌঁছানোর পর। ডিণ্ডিলগাঁও থেকে গাংনানী সাড়ে তিন মাইল। আশ্রয়ের ব্যবস্থা সেখানে, খাদ্যবস্তুর সমারোহ সেখানে, এ বিদ্‌ঘুটে পাহাড়টার উপর কেবল ঐ অপাংক্তেয় চায়ের দোকান আর তারই সংলগ্ন একটা নগণ্যতম চালাঘর, যেখানে একটু বসা চলে মাত্র। নামা সুরু হ'ল আমাদের।

যমুনোত্তরী পথের বৈশিষ্ট্য শুধু তার দুর্গমতাই নয়, আর একটি সম্পদও সে যাত্রীদের জন্যে তার নিজস্ব ভাণ্ডারে জমা করে রেখেছে, সেটি জলকষ্ট। মাইলের পর মাইল পেরিয়ে যাচ্ছে, বুকের ভেতরটা মনে হচ্ছে শুকিয়ে উঠেছে—অথচ ধারে কাছে কোথাও এতটুকু জল নেই। পথ থেকে নেমে অনেকটা অনুপ্রবেশের প্রচেষ্টায় ঝর্ণা থেকে জল হয় ত আসে, কিন্তু লাভের কড়ি তাতে যায় ফুরিয়ে। মধ্যে মধ্যে পথে-প্রান্তরে দুধ মেলে—তৃষ্ণার তাই হ'ল কাণ্ডারী। গাংনানীর আগেও তাই—পরেও তাই। ওখানে পৌঁছানোর পর যদি বা যমুনার সাক্ষাৎ মেলে—কিন্তু তাও স্থানবিশেষে অসূর্য্যম্পশ্যা, বহু দূর দিয়ে তিনি প্রবাহিণী, শব্দ শুনে যাত্রীদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। গঙ্গোত্তরীর পথে এটা নেই—মা গঙ্গাকে দরকার মত আহ্বান জানালেই তিনি ধরা দেন। যমুনা রহস্যময়ী, স্তবস্তুতির মধ্যে দিয়েই তাঁর আসা।

বেশ নেমে যাচ্ছি, এ পাথর ডিঙিয়ে, ও পাথর মাড়িয়ে। হাতে লাঠি—দুর্গতদের সহায়। আকাশে মেঘ জমে উঠেছে, জল আসার আগেই গাংনানী পৌঁছলে হয়। সূর্য্যদেব ঠিক মাথার ওপর আসেন নি, বুঝলাম বারটার আগেই ডিণ্ডিলগাঁও পেরিয়ে গেলাম। পশ্চিম দিগন্তের ওদিকটায় একসার অনামী পাখী পাহাড়ের উপর নেমে পড়ল, ওরাও ক্লান্ত! মালভূমির উতরাইয়ের পরই প্রাগৈতিহাসিক পাহাড়গুলো বোবার মত দাঁড়িয়ে—তারও ওদিকটায় যমুনোত্তরী, আমাদের যাত্রার

যেখানে শেষের ইঙ্গিত। নামতে নামতে দেড় মাইলের মাথায় শিম্‌লী পার হলাম। শিম্‌লী ত শিম্‌লী, শুধু নামই সর্ব্বস্ব আর পাণ্ডার বিহ্নুনো হ্যাণ্ডবিলে ওর পরিচয় আছে, আর কিছু নেই। টিম টিম করছে ছু'একটি দোকান, ছু'একখানি ঘর। এখানে নামার মুখে পায়ের ক্লান্তির মধ্যে একটু ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশ আছে। একটু বসে যাওয়া যায়।

গাংনানী পৌছলাম একটা নাগাদ। আজকেও দশ মাইল হাঁটা হ'ল—একটা চড়াই পেরোন হ'ল, এসে গেলাম গাংনানী, যমুনোত্তরীর পথে যে স্থানের সমৃদ্ধির দাবী অনস্বীকার্য্য। যমুনাকে ওখান থেকে পাওয়া যাবে, এখন এরই ধার ধরে আমাদের পথ চলা। তৃষ্ণায় কাতর, অনাহারে ক্লিষ্ট—তার ওপর ধর্ম্মশালার ব্যাপার আছে, যমুনা পরে দেখব, দেখা ত নয়—সে দর্শন। ধর্ম্মশালায় এলাম—উপরের দোতলার ঘরে স্থানও পেলাম। এবারকার তীর্থ পর্য্যটনে এই ঘর পাওয়াটাও নানা দিক থেকে যোগাযোগের পর্য্যায়ে। এখানে যাত্রীর অভাব ছিল না—ভারতভূমির নানা জায়গার নানা মানুষ, সিন্ধী, গুজরাটী, দক্ষিণী··· যমুনোত্তরীর যাত্রী আবার গঙ্গোত্তরীর ফেরত যাত্রী, গাংনানীতে তাদের পায়ের চিহ্ন রেখে যেতে হবে। ভয় ছিল হয়ত বারান্দার একটা ভগ্নাংশ কপালে আছে—কিন্তু আসার সঙ্গে সঙ্গেই আস্তানা জুটে গেল, পেয়ে গেলাম চারটে দেওয়ালের একটা ছুষ্প্রাপ্য সংস্থান, অথচ আমি একাই এসেছি, দোকলা বলে আমার পরিচয় ছিল না। শুধু এখানে নয়—গোটা তীর্থপথেই, কেন জানি না, আশ্রয় আমার জুটে গেছে—আশ্রয় আমি পেয়েছি। সুদূর বাংলাদেশের ঘর গেছে অদৃশ্য হয়ে কিন্তু এখানকার ঘর আমার সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে গঙ্গোত্তরীর মন্দির পর্য্যন্ত। বহু যাত্রীর অভিযোগ পেশ হয়েছে চৌকিদার সমীপে, লাগান-ভাঙানোর কথাটা শুনেছি আমার এই ঘর পাওয়াকে কেন্দ্র করে—তবু আস্ত একখানা

ঘর শেষ পর্য্যন্ত মিলে গেছে। কেদারবদরীর পথে দুর্ভোগের অন্ত ছিল না—এখানে সে দুর্ভোগের একটা কণাও খুঁজে পাই নি। কেন, কে জানে? বোধ হয় মায়েরই অদৃশ্য করুণার স্পর্শ পাওয়া।

কিছুক্ষণ পরে এসে গেল ধরম সিং আর তার পিছু পিছু বীরবলের সংসার। ঘর ত আমি পাবই, এ ত তাদের জানা...সোজা চলে এল আমার ঘরে চারটি প্রাণী। বিছানার মাধ্যমে এলাকা তৈরী হয়ে গেল তাদের...আমিও খুশী, তারাও খুশী।

আগে স্নান, তারপর খাওয়া। খিদে যত না পাক—যমুনাকে প্রাণভরে দেখার প্রয়োজন ছিল বেশী। বেলা একটা তখন, ধরম সিং রান্নাবান্নার কাজে নেমে গেল, আমি চলে গেলাম যমুনার তীরে।

যমুনা, যমুনা—যমুনা এসে গেল, আমি তাঁর তীরে দাঁড়িয়ে। ডিণ্ডিলগাঁও চড়াইয়ের উপর থেকে যমুনাকে প্রথম দেখি, পাহাড়ের গা বেয়ে সরু ফিতের আকারে নেমে আসছে। এই প্রথম দর্শনকে বিশ্লেষণের গণ্ডীতে আনা বৃথা, ব্যক্তিগত অনুভূতিই তার একমাত্র সম্পদ। ধর্ম্মশালার কিছুদূরেই যমুনা, বেশ একটু নেমে আসতে হয়। উপলখণ্ড সমাকীর্ণ তীরভূমি, একটি পারে নানাবিধ গাছের সমারোহ, তাতে পাখীর কাকলী আছে, কূজন আছে। প্রশান্তির ছায়া নেমে আছে যেন। স্রোতধারায় বেগ আছে, অবগাহনের চেষ্টা দুরাশা। এক খণ্ড বড় পাথরের উপর বসে স্নান সেরে নিলাম। কতকটা দূরে যমুনার উপর ব্রীজ দেওয়ার চেষ্টা চলছে, স্থানীয় ইঞ্জিনীয়ারিং বুদ্ধিই এর মুলধন। লোহালক্কড় নেই, স্তূপীকৃত সিমেণ্টের বস্তা নেই, যন্ত্রের ঝন্ঝনা নেই...পাইন কাঠ আর বৃহদাকার প্রস্তরখণ্ডের যুক্ত সম্মেলনের উপর সেতুর আকৃতিকে গড়া হয়েছে। দুটো দিকের প্রসারিত বন্ধনীর উপর একটিমাত্র কাঠের 'লগ্' ফেলা যা বাকী, এটি

সুসম্পন্ন হলেই মানুষের যাতায়াত চলবে, গরু ভেড়াও বাদ যাবে না। যান্ত্রিক সভ্যতাকে এখানে মূল্য দেওয়া হয় নি, মূল্য দেওয়া হয়েছে প্রকৃতিকে আর মানুষের সহজাত বুদ্ধিকে। যমুনার ধারে ধারেই একটি সর্পিল পথ চলে গেছে গাংনানীর অপর পারের রাজতার গ্রামের দিকে, সমৃদ্ধির দিকে যে গ্রামের অবদান অনস্বীকার্য। কাঠ আর পাথর দিয়ে গড়া এই সেতুর কিছু দূরেই বৃহদাকার শাল বৃক্ষ চেরাই করান হচ্ছে, শোনা গেল জুলাই মাসের শেষে যমুনাতে বর্ষার জল নেমে এলে দু'তিন লক্ষ টাকার এই সব সম্পত্তি ভাসতে ভাসতে চলে যাবে উত্তর ভারতের দিকে। কাঠ চেরাই আর যমুনার ধারার শব্দ, দুটো মিলিয়ে সুরের একটা বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছে এখানে।

ভাবলাম, এ শব্দ থেমে যাক···লোকজন অদৃশ্য হয়ে আসুক—যমুনার আওয়াজই যখন চরম হয়ে দাঁড়াবে, তখন আবার আসা যাবে। এখন আমি চলে যাই। প্রবাহিণীর স্বরূপ জানা যাবে না এখন, এর মর্ম্মকথাও নয়।

সন্ধ্যার একটু আগে সকলের অলক্ষ্যে আবার এখানে এসে দাঁড়ালাম। নিঃশব্দ পরিবেশ, বিজন পাহাড়পর্ব্বত, প্রকৃতির চোখে এবার সুপ্তির জড়িমা এসে লেগেছে। পাখীর কাকলি গেছে থেমে, রাজতার গ্রামের সরু রাস্তাটাও অদৃশ্যমান—যমুনার গর্জ্জনই এখন শাশ্বত, অন্য কোন শব্দের অনুকণাও বেঁচে নেই।

শীতবস্ত্রে ঢাকা—চুপ করে জপ করতে করতে পাথরের একটা কোণে এমন করে বসি যাতে যমুনার ধারাকে হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়।

চিন্তার গভীরতা সেইখানে, যেখানে বুঝি প্রকৃতিও গভীর। চোখ দিয়ে দেখার ভেতর যদি অনুভূতির দ্বারোদ্ঘাটন হয়, তাহলে মনের গহনে ও গভীরে অচেনা চেনা হয়—অদৃশ্য রূপ তখন রূপময়ী হতে

থাকে। সন্ধ্যার অবগুণ্ঠনে ঢাকা লজ্জানতা, বেপথুমতী যমুনার কাছে বসে বসে আমার আসল মন্দিরে অকস্মাৎ কাঁসর-ঘণ্টা বেজে ওঠে—অজানিতে ও অলক্ষ্যে। যা ভাবি নি, তাই এল জ্বল জ্বল হয়ে, চিন্ময়ী হয়ে, স্মরণীয় হয়ে।

চোখের সামনে যমুনা—ফিকে সবুজ রঙের গর্ব্বে গরীয়সী। চোখ বুজি, পরিব্রাজক জীবনের দেখা সব নদনদী যায় মিলিয়ে, মাতৃরূপিণী হয়ে ভেসে উঠে চারিটি ধারা, যে ধারাকে মানুষ নিয়েছে জীবনের প্রবাহিণী হিসেবে, সাধকেরা দেখে গেছে তপস্যার ক্ষেত্ররূপে। কেদারনাথকে কেন্দ্র করে, তারই পাশে পাশে প্রবহমানা ঘনশ্যামা মন্দাকিনী এসে মিশেছেন রুদ্রপ্রয়াগে ধূসর অলকানন্দায়। ঘন নীল রং গেছে বিসর্জ্জিত হয়ে সর্ব্বশক্তিরূপী পরমপুরুষের ভিতর···মা সেখানে নিঃস্বা, সর্ব্বস্বত্যাগিনী, তাই অলকানন্দার ধূসর জটাজালই চোখে পড়ে অন্য কিছু নয়, এত যে ঘন নীল রং, রুদ্রপ্রয়াগের আবর্ত্তে তার কণামাত্র পড়ে নেই, তার সব শেষ সেখানে। মার সেখানে নিঃশেষে মিশে যাওয়া, ব্যোমভোলা ত্রিনেত্রই সব আকর্ষণ করে নিয়েছেন, পুরুষ নিয়েছেন প্রকৃতিকে। আবার দেবপ্রয়াগেই ওই মা চিন্ময়ী, আদ্যা-শক্তি—পুরুষ সেখানে শব ও নির্বীর্য্য। সেখানে ধূসর রং গেছে পুঁছে, তপস্বিনী ভাগীরথীর গৈরীক রংটাই সেখানে প্রামাণিক। পুরুষ সেখানে শক্তিহীন ও জড়—পরমাপ্রকৃতি সেখানে সৃষ্টিরূপিণী, সর্ব্বশক্তির আধারভূতা।

যমুনার ধারে বসে বসে মনে হয় ভবতারিণী মায়ের পাশে বসে আছি—সেই স্নেহ, সেই মায়া, সেই চিরন্তন আশ্বাস ও আশ্রয়। এই ফিকে সবুজ রঙের বেনারসী শাড়ীপরা প্রবাহিণী যমুনা এ মায়েরই আর এক রূপ, আর এক উপলব্ধির অধ্যায়। মায়ের দুটো বাহুর ভেতর যে

সব পাওয়ার উষ্ণতা, এখানে বসে বসে তারই স্পর্শ পাই অণুপরমাণু হিসেবে; পুরুষ ও প্রকৃতির লীন হয়ে যাওয়ার ভেতর আধ্যাত্মিক মার্গের সমস্ত কিছু জানার সীমাও শেষ—গাড়োয়াল রাজ্যের মধ্যহিমালয়ের এই ধারা ক'টির ভিতর সে সীমার সার্থকতা ত আছেই—আবার মাতৃস্বরূপার একক রূপটিও এই প্রবাহিণীর ভিতর অলক্ষ্যে যে মিশে আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মাতৃরূপ একটি নয়—সৃষ্টির জন্যে মাতৃরূপের বিকাশ বহুধা ও ব্যাপক। তাঁর সন্তান তাঁকে যে যে ভাবে চেয়েছে, পেয়েছেও সেই সেই ভাবে। এখানে যমুনাকে আমার মা বলেই ডাকা; দেখাও সেইভাবে। যে দয়া তুলনাহীন, যে মায়া বিশেষণহীন, যে স্নেহ পরিমাণহীন—যমুনাকে দেখা আমার ঠিক এইভাবে। গঙ্গোত্রীর পথে বা বদরীকার পথে প্রবাহিণীর একক মূর্ত্তিকে দেখেছি তপস্বিনীরূপে, বৈরাগিণীরূপে। এ দুটি পথের ধারে ধারে মা ভাগীরথী সন্ন্যাসিনীর উত্তরীয় তুলে ধরেছেন সন্তানদের জন্যে, সাধকদের জন্যে, তাপসদের জন্যে—তাই তাঁর গায়ের রঙে গেরুয়ার ছোপ। কেদারনাথের পথে মন্দাকিনীর যে রূপ, সে রূপ মার চণ্ডালিকা রূপ, ভীমা ও ভয়ঙ্করীর রূপ। সে ধারাকে স্থানবিশেষে মানুষ নিয়েছে প্রলয়রূপিণী হিসেবে, খড়্গাধারিণী হিসেবে, তাই ত মায়ের রং সে ধারায় ঘননীল। বদরীকার পথে দেবপ্রয়াগের পর অলকানন্দা যেন রাজরাজেশ্বরী, সর্ব্বঐশ্বর্য্যময়ী, নানালঙ্কারবিভূষিতা। সার্থক রূপের সার্থক পরিচয় সেখানে—নারায়ণের বদরীকার সঙ্গে তার ঐতিহ্যময় সামঞ্জস্য আছে। সুমহান্ সুপ্রাচীন চারিটি তীর্থ—যমুনোত্তরী, গঙ্গোত্তরী, কেদারনাথ ও বদরীকা-নাথ…যুগযুগান্তের ইতিহাস যেখানে জড়ান ও মেশান—তাদেরই পাশে পাশে চিরপ্রবহমাণা যমুনা, গঙ্গা, মন্দাকিনী ও অলকানন্দা—আধ্যাত্মিক মার্গের সার্থক এ সমন্বয়, সার্থক এ সৃষ্টি!

গাংনানীর এই যমুনা, স্নেহাতুর মায়ের অঞ্চলই এ, আর এই অঞ্চল ধরে ধরে আমার বা আমাদের মত অর্ব্বাচীন সন্তানদের উঠে যাওয়া তীর্থের সন্ধানে। সাফল্য একটিমাত্র প্রশ্নের উপর, সেটি হ'ল বিশ্বাসের ও অখণ্ড ভক্তির রক্তজবা দিয়ে এই ফিকে সবুজ শাড়ীপরা রহস্যময়ী মায়ের ছোট্ট দুটি পা আমি পূজো করতে পেরেছি কিনা, বা পারব কিনা। সবকিছুর ভারসাম্য ঐ দুটি জিনিসের উপর—অন্যথায় জীবনে হাহাকার উঠবে, সঞ্চিত সম্পদ যাবে ফুরিয়ে। মূর্ত্তিময়ী মা এখানে চেয়েছেন জীবনের সব, তিতিক্ষার ষোল আনা, এ পথ সেই পথ যে পথে এই ষোল আনারই পূজো চাই, কড়াক্রান্তি তার থেকে ভাঙলে চলবে না। যমুনোত্তরীর আসল পথ এই গাংনানীর পর থেকে, পথের প্রান্তে যা ফেলে এলাম তা সম্পূর্ণ হবে তারই উপর যাকে জীবনভোর বলে এসেছি—'নমঃ।' এ তীর্থভূমি হ'ল মহত্তম, সাধকদের বুকের রক্ত দেওয়া, সিদ্ধযোগীদের আশীর্ব্বাদে যে মহান তীর্থের আকাশ-বাতাস মথিত হয়ে আছে। তাঁরা অলক্ষ্যে টেনেছেন তাই সুকৃতিকে মনে হয়েছে জীবনের আশীর্ব্বাদ, আত্মার পরম সদ্গতি।

রাত্রির প্রথম যাম—আকাশে চাঁদ উঠেছে, গোলাকার ঝক্ঝকে চাঁদ। তরল রূপোর মত চারিদিকে পাহাড়গুলোতে এই চাঁদেরই চাঁদোয়া পরিয়েছে কে! সারা আকাশটা ঘিরে কোটি কোটি নক্ষত্রের মায়াজাল আর নীহারিকার অনন্ত জিজ্ঞাসা—মায়েরই আর এক সার্থক সৃষ্টি! যমুনার জলে চাঁদের আলো পড়েছে, মনে হচ্ছে সমগ্র স্রোত-ধারায় অভ্রের কুচি মেশান, ফিকে সবুজ শাড়ীর উপর এক অদৃশ্য শিল্পী চুম্‌কি বসিয়েছে যেন।

জপের সঙ্গে মিশে গেছে ধ্যান, ধ্যানের বেদীতে বিশ্বচরাচর-সৃষ্টি-কারিণী মাতৃরূপা সমাসীনা...ডুবে গিয়েছিলাম গহনে গভীরে—চমকে

উঠলাম, মনে হ'ল রাত ন'টা বেজে গেছে। উঠে পড়লাম পাষাণখণ্ড থেকে, ফেরা যাক এইবার!

ধর্ম্মশালায় ফিরে এসে দেখি আমার নামে নিরুদ্দেশের পরোয়ানা জারী হয়েছে, আমি যে গাংনানীতে নেই বা কোন অশরীরী আত্মা আমাকে ধরে টেনে নিয়ে গেছে সে বিষয়ে কারুর সন্দেহ নেই। ধরম সিংকে দেখি ধর্ম্মশালার তলাকার বারান্দায় কয়েকজন যাত্রীকে নিয়ে গবেষণায় মশগুল, যে-গবেষণাকে দস্তুরমত প্রথম শ্রেণীর বলা যায়। আমাকে দেখা আর ভূত দেখা কতকটা একই পংক্তিতে, অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে চোখ দুটো বড় বড় করে বলে, "আপ কিধার গিয়া?" কিছু না বলে উপরে উঠে যাই আমি। দেখলাম ঘরেও সেই অবস্থা। বীরবল, তার মা, রুক্মিণী অপেক্ষায় বসে আছে আমার জন্যে, অন্নজল ত্যাগ করে রাত্রির প্রহর গুনছে। কৈফিয়ত দিতে কেটে গেল আধ ঘণ্টা এবং এ রকম আর হবে না এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে তবে তারা সন্তুষ্ট হ'ল। নিষ্কৃতি পেলাম আমি, ঝঞ্ঝাট মিটে গেল।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া চুকে গেল—যাত্রীনিবাস হয়ে এল নিস্তব্ধ, বীরবল এক কাহিনী সুরু করল—যা শুধু আমার মত অর্ব্বাচীন মানুষের জন্যেই নাকি তোলা ছিল। কাহিনীটি অদ্ভুত, সাধারণ বস্তুতান্ত্রিক মানুষের বিশ্বাসের মাপকাঠির ভিতর নাও আসতে পারে—তবে এটা সত্যি, সাময়িক উচ্ছ্বাসের ভিতর ভাব-প্রেরণাকে শিখণ্ডী করে কোন মিথ্যাকে বরণ করা নয়; আমি এটি পুরোপুরি বিশ্বাস করেছি আর মেনেও নিয়েছি। সুকৃতি নিয়ে যারা আসে, কল্যাণ নিয়ে যাদের আসা তারা সবই পায়, অঞ্জলি তাদের ভরে উঠে। বীরবল প্রদত্ত কাহিনীটি শুয়ে শুয়ে যা শুনলাম, তার কতকটা এই—

কাহিনীটি বীরবলের মায়ের। কানায় কানায় তাঁর সবকিছু পূর্ণ

হয়ে ওঠা—তাই তাঁর প্রাপ্তি। ডিণ্ডিলগাঁওয়ের চড়াই পেরিয়ে আসার সময়ে এ ঘটনাটি ঘটে। বৃদ্ধা সকলের আগেই আসছিলেন, বীরবল ও রুক্মিণী ছিল পিছিয়ে। আপন মনেই আসছিলেন তাঁর গুরুজীর নাম স্মরণ করতে করতে, হঠাৎ সামনের দিকে পথের পাশে এক পাইনগাছের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ে গেল— যে পড়ে যাওয়াটা গোটা জীবনের অবিস্মরণীয় সম্পদ। তিনি দেখলেন গাছটির উপরকার শাখা-প্রশাখার ভিতর একটি বৃদ্ধ-মূর্ত্তি—শ্বেতকায় ও শ্মশ্রুমণ্ডিত। গাছের একটি ডালের উপর তিনি বসেছিলেন, বীরবলের মায়ের দিকেই তিনি তাকিয়ে ছিলেন এক দৃষ্টে। মায়ের চলার গতি গেল স্তব্ধ হয়ে, তিনি শুধু দৃষ্টিটুকু খোলা রাখলেন সেই অদ্ভুত মূর্ত্তিটির দিকে। ইতিমধ্যে বীরবলরা এসে যায়। আঙুল বাড়িয়ে বীরবলকে তিনি দেখাতে যাওয়ামাত্র মূর্ত্তি গেল অদৃশ্য হয়ে—দীর্ঘ মহীরুহের কাণ্ড আর ডাল-পালাই রইল দৃশ্যমান হয়ে।

বীরবলের ধারণা তার মাতাজীর তীর্থে আসা সার্থক হয়ে গেল, পাত্র গেল পূর্ণ হয়ে। তার নিজের আক্ষেপ যে তার পাপের বোঝার ফলে সেই অদ্ভুত মূর্ত্তিটির দেখা সে পেল না। যাত্রীনিবাসের ছোট্ট ঘরটুকু তার মর্ম্মান্তিক আক্ষেপে ভারী হয়ে উঠল যেন। তার একমাত্র কথা—"মাতাজীকো দর্শন মিলা, হাম্‌কো নহি।"

বুঝলাম, যা শুনে এসেছি তা চোখের সামনে ধরা পড়ল। যমুনোত্তরীর রহস্যময় অঞ্চলে সিদ্ধযোগীরা দেখা দেন সেই মানুষদের যাদের মন্দিরে ধূপধুনার গন্ধের অভাব নেই—বীরবলের মা সেই মন্দিরেরই যোগ্যা পূজারিণী, তাই দর্শন পেয়েছেন, আশীর্ব্বাদ পেয়েছেন যা সকলের ভাগ্যে জোটে না। এই দর্শন পাওয়ার সার্থকতার রূপ আমরা দেখেছিলাম ওই বৃদ্ধার ভিতর। এই ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার

পর তাঁর জীবনে কোথা থেকে যে অকাল তারুণ্য নেমে এল বুঝলাম না। গাংনানীর পরই তাঁর পায়ের গতি গেল বেড়ে, তিনি বৃদ্ধত্বের গণ্ডী ছাড়িয়ে নেমে এসেছিলেন অদ্ভুত এক পংক্তিতে যেখানে মানুষের আসাটা সচরাচর ঘটে না। যমুনোত্তরীর দুরারোহ দুর্গম পথকে তিনি গ্রাহ্য করেন নি—সকলের আগেই তিনি পথ পেরিয়েছেন, পথ হেঁটেছেন, কোথা থেকে যে শক্তি এসেছিল, কে জানে! যে পথ কান্নার পথ, গোটা জীবনের অধ্যবসায়ের পথ, সেই পথে এই বৃদ্ধাকে দেখেছি হাসতে হাসতে গেছেন বিজয়িনীর মত—অথচ যা অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য। এটি ঘটেছিল ঐ মূর্ত্তিটির সঙ্গে যোগাযোগ ঘটবার পরই।

ভোরবেলা গাংনানী ছাড়লাম—আজকের পাড়ি বিষম পাড়ি, একটানা ষোল মাইল। সামনে চড়াই আছে, বন্ধুর পথ আছে, জলকষ্টও আছে প্রচুর। গাংনানী থেকে খারারী তিন মাইল। যমুনাকে বাঁ দিকে রেখে পথ চলে গেছে পাইনগাছের ভিতর দিয়ে। এ পথটুকুকে অপবাদ দেওয়া যায় না, বরং তাকে সুখ্যাতির পর্য্যায়ে আনা চলে। সমতল রাস্তা—পাহাড়গুলো মারমুখী নয়, এই যা। যমুনা কখন কাছে, কখন দূরে দূরে—ওদিকটায় গাছের সমারোহ নেই, সমারোহ যত পথের ডান দিকে—সারা পথের উপর শুকনো পাতার একটা আস্তরণ। মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট কুটীরের সন্ধান পাওয়া যায়। এখানকার স্ত্রীপুরুষ যা দেখছি—শ্রদ্ধা এসেছে তাদের দেখে। বীর্য্যবান, স্বাস্থ্যবান, রূপবান। পাহাড়ের হাওয়া আর স্বর্গরাজ্যের প্রভাব তারা ষোল আনাই পেয়েছে—কি সহজ, কি সরল, কি অমায়িক। আসার পথে দেখা গেল এমনি একটি অনামী কুটীরে চাল কোটার পর্ব্বে মেতে আছে একটি মেয়ে—আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসল, যে হাসিটুকু এ অঞ্চলেই মেলে, অন্য কোথাও নেই। ধরম সিং

বললে, 'ওর কাছ থেকে কিছু চাল কিনে নেওয়া দরকার।' বুঝিয়ে দি, চটিতে চটিতে আশ্রয় মেলে ওই চাল-ডাল কেনার উপর, 'চাল আমার সঙ্গে কেনা আছে' বললে রাত্রের আশ্রয় নাও মিলতে পারে। ধরম সিং নিরস্ত হয়, মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করাও হয় না তার, সেই সঙ্গে চাল কেনা। খারারীর নাম পাওয়া যায় ছাপার অক্ষরে পাণ্ডাদের দেওয়া বইয়ের ভিতর, তাতে লেখা আছে খারারীতে কমপক্ষে দুটি চটির অস্তিত্ব আছে। তিন মাইল পেরিয়ে এসে দেখি খারারীতে ছোট্ট একটি চায়ের দোকান লোকালয়বর্জ্জিত আবহাওয়ার ভিতর জিজ্ঞাসার মত জেগে আছে—গাছের ছেঁড়া ছেঁড়া পাতার আস্তরণ দেওয়া একটি মাত্র বাস্তুঘর—তারই ভিতর নামমাত্র সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে চায়ের এই বিপণি। দোকানের মালিককে জিজ্ঞাসা করি, "গ্রাম-টাম নেই?" হাত উঁচিয়ে দিক্‌চক্রবালের কাছাকাছি কয়েকটি বিন্দুর মত কুটীর দেখিয়ে দেয়, সেগুলোই নাকি খারারী গ্রামের ভগ্নাংশ। ইতিহাসের পণ্ডিতের কাছ থেকে চুপ করে শুধু চায়ের ভাঁড়টি টেনে নি, উত্তর দিই না। এখানে দুধ বিক্রি করা হচ্ছে, ইচ্ছে করলে কেনা যায়। আমি শুধু চা-ই খেলাম।

সামনে চড়াই—আর এ চড়াইয়ের জের চলল পাঁচ মাইল দূরের যমুনা চটি পর্য্যন্ত। চারিদিকেই পাহাড়, আর এ পাহাড়ের কোনরকম শালীনতাবোধ নেই, খাড়াই ঊর্দ্ধমুখে উঠে গেছে। পথের কৌলীন্যও নেই, তাও নিঃশেষে শেষ হয়ে গেছে·· এদিকে-ওদিকে শুধু পাথর ছড়ান, ঝুরো পাথর,—এর উপর দিয়েই যমুনা চটির অবাস্তব রাস্তা। গাংনানী থেকে খারারী পর্য্যন্ত আমরা দলে ছিলাম সাত-আট জন যাত্রী মাত্র, এর মধ্যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিচ্ছিন্নতা আসে নি। খারারীর পর সব যেন কেটে বেরিয়ে গেলাম, জোড় বলে কিছু রইল না, বিজোড়ই

তখন এ পথের মূলধন। জল নেই—শুধু যমুনার শব্দ শুনেই সন্তুষ্ট হতে হয়। যমুনা এ পথ থেকে বহু দূরেই প্রবহমাণা—মা এখানে তৃষ্ণার্ত্ত যাত্রীকে নিজের শব্দই শুনিয়েছেন শুধু, অঞ্জলিতে বারিবিন্দু দান করেন নি।

কোন রকমে এসে গেলাম পাঁচ মাইলের কৃচ্ছ্রসাধন শেষ করে যমুনা চটিতে—বেলা তখন দশটা। যমুনার ঠিক ধারেই চটির অস্তিত্ব, সেই জন্যে স্থানটির নামের আগে অনিবার্য্য 'যমুনা' শব্দটির যোগ হয়েছে। এখানে এসে ক্লান্তি গেল দূর হয়ে, মনে হ'ল পেছনের ফেলেআসা চড়াই-ভাঙাটা দিবাস্বপ্ন হয়ে গেছে। যমুনা চটি বরণীয় স্থান, রমণীয় এর পরিবেশ। জীবনের চাঞ্চল্য আছে এ স্থানটিতে। আবহাওয়া স্তিমিত নয়—মানুষের পদসঞ্চার আছে। ধর্ম্মশালা রয়েছে কালী কমলীবাবার, দু'পাঁচটা দোকান-পাটের হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকুনীও এখানে বর্ত্তমান। তবে এখানে বিশ্রামের যতটা তাগিদ অনুভবে আসে, রাত্রি যাপনের প্রয়োজনীয়তা ততটা নেই। কেননা সাধারণ যাত্রীদের লক্ষ্য থাকে যমুনা চটি পেরিয়ে আরও আট মাইলের মাথায় হনুমান চটিতে পৌঁছানোর। যারা খারারীর চড়াইয়ের দাপটে অশক্ত হয়ে নেমে আসে, তাদের পক্ষে এখানে মাথা গুঁজে থাকবার বন্দোবস্ত আছে—সে কৌলীন্যের বদনাম যমুনা চটির নেই। তবে আমাদের মুষ্টিমেয় যাত্রীদলে সে রকম অশক্ত কেউ ছিল না। আমরা শুধু বিশ্রাম নিলাম কিছুক্ষণ, তারপর যমুনা চটিকে ছাড়িয়ে পুল পেরিয়ে আবার পথের প্রান্তে নেমে এলাম। এবার আট মাইলের আর একটা পরীক্ষা, আর সেটি উত্তীর্ণ হতে পারলে হনুমান চটিতে পোঁছানোর অধিকার মিলবে।

পরীক্ষা আর পরীক্ষা—চরমতম তথা বৃহত্তম। গাংনানী ছাড়ানোর

পর মা যমুনাকে বাঁ দিকে প্রবহমাণা দেখেছিলাম, এবার যমুনা চটির পর তিনি ডান দিকে এলেন, সেই ফিকে সবুজ শাড়ীপরা মায়াবিনীর রূপ, যাঁর সামান্যতম দর্শনেই সন্তুষ্টির বন্যা নেমে আসে। আধ মাইল পার হবার পর যমুনা ধীরে ধীরে পাহাড়ের গহনতায় অদৃশ্যা হলেন—আমাদের মত যাত্রীদের জন্যে এ সরে যাওয়া বিগত রাত্রির স্বপ্ন মাত্র! মনে হ'ল কাছাকাছি জল আছে, তবে সে জল নয়—জলের আলেয়া। এখানে ব্যথা জমে মনে মনে, অভিমানে বুক ভরে যায়। মনে হয় ফিরে যাই। যমুনোত্তরী তীর্থের ঐতিহাসিক জলকষ্ট এই স্থান থেকেই স্থুরু হয়েছে কেননা সামনের চড়াইয়ের যেমন তুলনা নেই, তেমনি তুলনা হয় না একটিমাত্র অঞ্জলির হা-হুতাশের! যমুনা চটির আগেও জলকষ্ট যে নেই তা নয়, তবে সে মানুষের সহ্য শক্তির সীমাকে পেরিয়ে যায় নি।

যে চড়াইয়ের সামনে এসে দাঁড়ালাম আমরা, উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব্ব থেকে পশ্চিম—সমস্তদিকেই তার একটা অমানুষিক স্পর্দ্ধা যেন ফুটে বেরুচ্ছে। যাত্রীদের জানিয়েছে সর্ব্বাত্মক 'চ্যালেঞ্জ' ও ঔদ্ধত্যের রক্তচক্ষু। এ চড়াই কান্নার চড়াই। পথ ত নেই-ই, তার থাকা শুধু আদলমাত্র—আর এই আদলের উপর লক্ষ কোটি পাথরের বিক্ষিপ্ত আস্তরণ, যার উপর পায়ের পাতা দু'টিকে সমান ভাবে রাখার উপায় নেই যাত্রীদের—অদ্ভুত অসমান পথ, ভাবনা হয়, যাব কি করে? এরকম পথ গঙ্গোত্তরীর পথে নেই—এই ধরনের পথ যমুনোত্তরীরই একমাত্র সম্পদ।

চড়াই যে পেরোই নি তা নয়, যাযাবর জীবনের তলা দিয়ে পথের ইতিহাসই চলে গেছে যেন—তবু সে ইতিহাসের সান্ত্বনা দেখেছি, কেননা অধ্যবসায়ের পরীক্ষায় এমনভাবে স্পর্দ্ধার স্বরূপটি ফুটে ওঠে নি।

কাশ্মীর থেকে কুমারিকা, ভারত-ভূমির নানা প্রান্তে নানা দিকে কাঁধের ঝুলিকে সম্বল করে পথ হেঁটেছি প্রচুর, কেননা জীবনে ভগবান ঘর দিলেও আমার পথকেই করেছেন সত্যের আরাধনা—তাই বেঁচে থাকাটাই আমার পথ আর পথই আমার বেঁচে থাকা। ধরিত্রীর নানা রূপকে দেখেছি দু'চোখ মেলে, কেননা তার প্রয়োজন ছিল পর্য্যটনের খাতার পাতায়। অসমান, বন্ধুর, দুরারোহ, এসব বিশেষণের মাত্রায় ভূপৃষ্ঠের যে ক্রমবিকাশের ধারা আমার ঝুলিতে তার সাক্ষ্য বড় কম নয়। গত বছরে ত্রিযুগী নারায়ণ আর তুঙ্গনাথের সামনে দাঁড়িয়ে ভেবেছিলাম—ঊর্দ্ধমুখী এ বিদ্রোহীযুগলের ভ্রূকুটির সামনে তীর্থপ্রয়াসের ঝুলি শূন্য হয়ে যাবে না ত ? কিন্তু শূন্য হয়নি, লাভই হয়েছে—কেননা সে ভ্রূকুটিকে মেনে নেওয়া যায়, মানুষের সহ্যশক্তির সীমা তারা লঙ্ঘন করে নি। চড়াই সেখানে পথ রেখে গেছে, পথের মর্য্যাদাকে তারা এমন ভাবে নষ্ট করে নি।

কিন্তু এ কি! এর ত কিছুই নেই—এর নিরাভরণতার সবটাই যে অদ্ভুত! না আছে পথ, না আছে পাকদন্তী, না আছে এ দুটি জিনিসের সৃষ্টির এতটুকু প্রয়াস—বিধাতা তাঁর বিরাট খড়্গ নিয়ে শুধু খেয়ালেরই অজুহাতে এ অঞ্চলটিকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন—আর তাঁর একটা অট্টহাস্য এখানকার আকাশে-বাতাসে মথিত হয়ে রয়েছে।

কিন্তু চলতে হবে, পথ ত আমার জন্যে নতুন করে দেখা দেবে না, তাই চড়াইয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। বদ্ধমুষ্টির ভেতর চেপে ধরি লাঠিটাকে—সেই বিপদের কাণ্ডারী হয়ে ওঠে এ পথে। আমি, ধরম সিং আর বীরবলের মা এক সঙ্গেই এসেছি এ পথটুকু—বিচ্ছিন্নতা আসে নি। রুক্মিণী বীরবল আসছিল একটু পিছিয়ে—আমার সঙ্গে তাদের মাতাজী আছে, তাই তাদের সান্ত্বনা ও শান্তি। এক পা,

ছু'পা—মনে হয় এ যেন দিনের শেষের অবসাদ ও খিন্নতা। একটি সমান্তরাল রেখা ধরে এ যেন আট-ন'তলা বাড়ীর আলসে-বরাবর উঠে যাওয়া—সেই জন্য প্রতি পাদবিক্ষেপে বিদ্রোহ ঘনিয়ে উঠে। চড়াই ভাঙার মুখে এক বোম্বাইবাসী দম্পতীর সঙ্গে দেখা হয়। বিপুলকায়া গৃহিণী অসহায়ভাবে বসে পড়েছেন একটি পাথরের উপর, মুখে শারীরিক ক্লান্তিজনিত হা-হুতাশ যে, এত কষ্ট করেও যমুনোত্তরী দর্শন আর হ'ল না—ঘর্ম্মাক্তকলেবরা ও অসহায়ত্বের প্রতিমূর্ত্তি। সঙ্গে চলমান পাণ্ডা ও চারিটি বাহকের পিঠে যাবতীয় ইহলৌকিক তত্ত্বের সাজসরঞ্জাম, এমন কি ট্রাঙ্কও বাদ নেই। বুঝা গেল, রৌপ্যমুদ্রার অভাব নেই, লক্ষ্মী বিরাজমানা। স্বামী শুধু বুঝিয়ে যাচ্ছেন যে, এরকম করে শক্তিহীনা হলে তার হাজার টাকার একটা অঙ্ক সামান্য কারণে ব্যর্থ হয়ে যাবে। কথাবার্ত্তায় বুঝা যায়—আজকের দুঃখ আর তীর্থের নয়, কাঞ্চনমুদ্রার। পাণ্ডাকে ডেকে বলি, "কাণ্ডী করা হয় নি কেন ভদ্রমহিলার জন্যে? টাকার ত অভাব নেই!" সংক্ষেপে উত্তর দেয়, "এত বড় কাণ্ডী পাওয়া দুঃসাধ্য।"

সত্যিই ত! বীরবলের মা নিজের উদাহরণ দেখিয়ে বোম্বাই-বাসিনীকে নানা ভাবে উৎসাহ দেন। এতে কাজও হয় কিছু। কোনরকমে উঠে খানিকটা চলার পর আবার সেই ধ্বংসস্তূপের অবস্থা আর সেই সঙ্গে সেই বুকফাটা কান্নার পুনরাবৃত্তি—'হামকো নেহি হোগা—।' উপায়ন্তর না দেখে আমরা এদের এড়িয়ে যাই। হনুমান চটিতে এদের আমরা দেখি নি তা নয়, দেখেছিলাম—কিন্তু সে এক করুণতম অবস্থা।

চড়াই ভাঙার মুখে তিন মাইলের মাথায় পাওয়া গেল উজলী। নামমাত্র চটি, সেই টিমটিমে চায়ের দোকান একটি, আর তার লাগোয়া

একটি পোড়ো জীর্ণ ঘর। উজলীর পর চড়াইয়ের একটু দয়া-দাক্ষিণ্যের ভাব আছে, অর্থাৎ চারদিকের পাহাড়ের গা বেয়ে যে পথ, তার নিম্নমুখী হওয়ায় ঔদার্য্য আছে খানিকটা। পাইনেরই সমারোহ চলছে একটানা। ধরাসু ছাড়ার পর সেই যে এদের পথ-পরিক্রমা সুরু হয়েছে—এর পরিসমাপ্তি ঘটেছে খরসালীতে। গাছের সারি চলেছে ত চলেছেই, এর আর শেষ নেই। কষ্টসহিষ্ণুতার ভিতর এদের স্মৃতি আমরণ।

এক মাইল নেমে আসার পর যমুনার তীরে একটি স্থানের সামনে এসে দাঁড়ান গেল—যার পরিচয় আমাদের জানা ছিল না। শোনা গেল এ স্থানটির নামকরণ হয়েছে নয়া চটি। কালী কমলীওয়ালার ধর্ম্মশালা তৈরী সুরু হয়েছে, শেষ হতে বেশী দেরি নেই। একতলার কাঠামো শেষ হয়ে গেছে, দোতলাও তাই, শুধু ছাদ হওয়া যা বাকি। ধর্ম্মশালার আশেপাশে জীবনের চাঞ্চল্য—অর্থাৎ দোকানপাটের বনিয়াদ গড়ে উঠেছে সুষ্ঠুভাবে। সবই পাওয়া গেল—চাল, ডাল, আটা, মশলা ও কাঠ। স্নান করা হ'ল যমুনায়—সে স্নান গা ডুবিয়ে নয়, পাথরের ওপর বসে বসে মাথায় জল ঢালা। এখানে যমুনা বেগবতী ও খরস্রোতা।

নয়া চটি থেকে যাত্রা সুরু হ'ল আবার বেলা তিনটায়—এইবার হনুমান চটি, সেখানে বিশ্রাম ও রাত্রিবাস। নয়া চটির সামনেই যে যমুনা তার উপর একটি আস্ত পাইনগাছ ফেলা আছে—ওটাই ব্রীজ আর ওরই নীচে দিয়ে মাত্র চার-পাঁচ ফুট তলাতেই স্রোতস্বিনীর ঝোড়ো রূপ, শুধু পা হড়কে পড়তে যা বাকি, মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হওয়ার সম্ভাবনা। যতবার যমুনাকে পেরুলাম আমরা—ব্রীজের ঐ একটিমাত্র রূপ, অর্থাৎ বিরাটকায় একটি গাছ ফেলা। পেরুতে পারলে ভাল—না পারলেও ও গাছ কস্মিনকালে উঠে অন্যপথ করে দেবে না।

এখান থেকে হনুমান চটি তিন মাইল। আজ তের মাইল হাঁটা শেষ হয়ে গেছে, ষোল মাইল পূর্ণ হলে তবে আজকের মত নিষ্কৃতি পাব, বিশ্রাম পাব। পথ সেই চড়াইয়ের ইতর-বিশেষের মধ্যে দিয়ে চলেছে, একটানা চড়াই আর নেই। যমুনা আবার বাম দিকে এলেন, কেননা পথ ঘুরেছে, নানা বাঁকের মধ্য দিয়ে পথের সোজা পরিচয় আর নেই। এদিকে ওদিকে বন ও উপবন—পাহাড়ের সেই অনন্ত রুক্ষতা। পায়ের উপর মাংসপেশীর চাপ পড়ছে, কেননা একটানা তের মাইলের একটা অঙ্ক শেষ হয়ে গেছে আমার। কাঁধের ওপর ঝোলান একটিমাত্র ব্যাগ, তাই মনে হচ্ছে ভারী, ওটা ফেলে দিলেই হয়। গগ্‌ল্‌সের ভেতর চোখ দুটো হয়ে এসেছে স্তিমিত—মনে হয় ঘুমিয়ে পড়ি। চামড়ার উপরেও কিসের একটা টান পড়েছে, এর কারণ আর কিছু নয়, মর্ত্ত্যের মানুষ আমরা বহুদূর উঠে এসেছি বলে। আকাশ ঘোলাটে, পাংশুবর্ণ—এ আকাশ যেন আমার আকাশ নয়। চারিদিকে নগ্ন পাহাড়-পর্ব্বত—একটানা নীরন্ধ্র নিস্তব্ধতা—এ পৃথিবী যেন আমার চেনা পৃথিবী নয়। গোটা আবহাওয়ায় কি রকম ছমছমে ভাব—মনে হয় আমাদের পথ চলার আওয়াজও এখানে আপাংক্তেয় ও অযৌক্তিক। প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের ভিতর দিয়ে সর্পিল গতিতে চলেছি আমরা মুষ্টিমেয় তীর্থযাত্রী—অবাস্তব উপন্যাসের ছেঁড়া পাতার মত।

হনুমান চটির আগে পাইন ছাড়াও আর এক রকমের গাছের সন্ধান পাওয়া গেল, এ দেখা প্রথম! এ দেশের ভাষায় তাদের নাম রিঙাল, আমাদের ভাষায় শর জাতীয় গাছের ঝোপ! পাহাড়ের নগ্ন আবরণের ভিতর শেকড় চালিয়ে অজস্র এই রিঙালের বেঁচে থাকা—প্রথম দৃষ্টিতে এদের বেখাপ্পা বলে মনে হয়। ভাল ঝুড়ি বোনা

চলে এ দিয়ে! বাংলাদেশ হ'লে কবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। তু'একটা অনামী ফুলের গাছও দেখা গেল—অনামী পাহাড়ী ফুল, নাম জানি না। চটিতে পৌঁছানোর আগে পথটা অদ্ভুত ভঙ্গীতে ঢুকে গেছে গ্রামের ভিতর—যমুনা ছাড়াও আর একটি নদীর উপর দিয়ে কাঠের সেতু পেরিয়ে যাত্রীদের প্রবেশের ব্যবস্থা, পরে জেনেছি ও নদীটির নাম হনুমান, যমুনোত্তরী গ্লেসিয়ার থেকেই যার নেমে আসা। যমুনা ছাড়া এই প্রথম দ্বিতীয় স্রোতস্বিনীর সন্ধান পেলাম আমরা, এর আগে কোথাও পাই নি, যমুনাকেই দেখে এসেছি একমেবাদ্বিতীয়ম্ হিসেবে। সন্ধ্যা হয় হয়—হনুমান চটিতে এসে গেলাম আমরা।

ষোল মাইলের একটা ধাক্কা—জীবনে একটানা পথ কখনও যা হাঁটি নি। এটি সম্ভব হ'ল তার কারণ এটি স্বর্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলে। সবই এখানে সম্ভব—মাইলের পর মাইল কোথা দিয়ে শেষ হয়ে যায় বোঝা যায় না।

এখানে শীত আছে, রাত্রে কম্বলের প্রয়োজন হয়। যমুনা চটিতে শীতের আমেজ লেগেছে, এখানে তার বহিঃপ্রকাশেরই একটা ধাপ, যমুনোত্তরী যে কাছে, এখানকার শীতের অনুভূতিই তার প্রমাণ! রাত্রে ধরম সিং চমৎকার ডাল আর রুটি পাকাল—একটা অদ্ভুত আবেষ্টনীর শিহরণের ভিতর জ্বলন্ত কাঠের সামনে তাই বসে বসে খাওয়া গেল। বীরবলদের রান্নার কিছুটা অংশ কপালে এসে জোটে। আমরা একই ঘরে—এখানেও নির্বিবাদে উপরের ভাল ঘরটি জুটে গেছে আমাদের। পায়ে তেল মাখানোর প্রশ্ন নিয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি হ'ল একবার বীরবলের সঙ্গে, বহু কষ্টে তাকে নিবৃত্ত করা গেল। এ সংসারটি আমাকে মিশিয়েছে কি আমিই নিজের ভিতর তাদের

সংসারকে মিশিয়ে নিয়েছি বুঝা দুষ্কর। অদ্ভুত এক রাজ্যের ভিতর বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে মানুষের কোন পংক্তিভাগ এখানে নেই—সব মিশে একাকার হয়ে গেছে!

অনেক রাত পর্য্যন্ত ঘুম এল না চোখে। নানা রকম ভাবনা, নানা রকমের আত্মবিশ্লেষণ। যা অচিন্ত্যনীয় তাই চলে আসছে স্বীকৃতির ভিতর, সিনেমার পর্দ্দার মত যত রাজ্যের সব চিন্তা ভেসে ভেসে যাচ্ছে। ডানদিকে ধরম সিং—অবোধ শিশুই সে, অঘোরে ঘুমুচ্ছে। ঘরের ভিতর একটিমাত্র লণ্ঠনের স্তিমিত আলোর জ্যোতির সঙ্গে দ্বন্দ্ব বেধেছে ভিতরের ও বাইরের অন্ধকারের—সভ্যতার ও প্রকাশটুকুকেও মনে হয় অর্ব্বাচীন, ও আলোটুকু নিভে গেলেই যেন ভাল হ'ত। ওদিকটায় আপাদমস্তক কম্বলে ঢাকা বীরবল, রুক্মিণী তার শিশু ও মাতাজী—কারুর সাড়া নেই। আমার যেন মনে হয় ওরা বোধ হয় বেঁচে নেই! অশরীরী আত্মার পদসঞ্চারের আবর্ত্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া হনুমান চটি, আমি শুধু প্রহর গুনি। যে চিন্তাটুকু আর সব চিন্তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে বড় হয়ে ওঠে—সে চিন্তা সেই ব্রহ্মতালের, সেই স্বপ্নের ঘোরে দেখা এক মায়াবিনীর রূপ, সেই ফিকে সবুজ শাড়ী! সেই পথটুকু, পাহাড়েরই এক ভগ্নাংশে মিশে যাওয়া একটি পথ, যার এক প্রান্তে দেখা দিয়ে সেই অসূর্য্যম্পশ্যা লঘুচ্ছন্দে মিশে গেলেন আর আমি শুধু কিসের ঘোরে যেন তাই দেখলাম অথচ বুঝা গেল না, জানা গেল না···অনুভূতিতে এসেও যেন হারিয়ে গেল! আজকের এই মায়াময় আবেষ্টনীর এক অখ্যাত প্রান্তে শুয়ে শুয়ে সেই দেখার আলেয়াই কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠে শত বাহু নিয়ে, কিছুতেই ভুলতে পারি না···ঘুম আসে না আমার!

সারা পথ যা পেরিয়ে এলাম তা তন্ন তন্ন করে খুঁজে এলাম,

ব্রহ্মতালে দেখা সেই পথের সঙ্গে যদি মেলে—কিন্তু মেলে নি। সেই বাঁকটুকু, পথের প্রান্তে অনাদৃত দু'একটি পাথরের টুকরো, কয়েকটি পাইনগাছের ছোট্ট একটি উপনিবেশ…সারা পথ অনুসন্ধান করে এলাম, জিজ্ঞাসা কেবল জিজ্ঞাসাই থেকে গেল। কোথায় সেই পথ—কোথায় সেই দেবীমূর্ত্তির ছায়া? পাই নি…এল না। রহস্য শুধু রহস্যতমের আবরণ নিয়ে থেকেছে পথের প্রান্তে—জীবনের প্রান্তে!

অনাস্বাদিত ইতিহাসকে চেনে না কেউ, তাই তার সন্ধানে কেউ বেরোয় না। যা চির অদৃশ্যমান—তা দৃষ্টির সামনে আসেও না, দাগও ফেলে না কোনদিন। জীবনে তারই প্রয়োজন বেশী, যা দুয়ে দুয়ে চার মিলে যাওয়ার মত মিলে যায় জীবনে, তাই সার্থক, তাই মূল্যবান, কিন্তু আলেয়ার মত যে ষড়ৈশ্বর্য্যে শুধু এসেই নিভে গেল, বুঝতে দিলে না, জানতে দিলে না—তার জন্যে কান্না বড় বেশী। দুটো হাতের বৃহৎ অঞ্জলির ভিতর এক তুলনাহীন সম্পদ পুষ্পাঞ্জলি হয়ে যদি বা এল, না পারা গেল তার ঘ্রাণ অনুভবে আনা, না পাওয়া গেল নৈবেদ্য দেওয়ার শেষ অধিকারটুকু। মধ্যরাত্রের আকাশে এ যেন এক বিদ্যুতের আলো, শুধু জ্বলেই নিভে যাওয়া…।

ঘুম আসে না আমার…ঘুম আমার দু'চোখ থেকে কে যেন মুছে দিয়েছে! সবই কি মায়া, সবই কি ভুল? কেবল কি চড়াই-উতরাইয়ের ক্লান্তিটুকু নিয়ে বাড়ী ফিরব? যার জন্যে আসা, তার লাভের কড়ি যদি না ঝুলিতে আসে তা হ'লে যমুনোত্তরী তীর্থের মহাত্ম্যই বা কেন, বা এর ঐতিহ্যের প্রচার কেন দিকে দিকে?

একটা অহেতুক অভিমান বুকের পাঁজরাগুলোতে যেন বেজে ওঠে …কেমন যেন একটা মহাশূন্যতায় মনের ভেতরটা ভরে যায় আমার…।

কালকেই ত পূর্ণিমা—কালকেই যমুনোত্তরী পৌছানোর কথা।

মধ্যে খরসালী ও ভৈরবঘাটি—তার পরেই তীর্থ শেষ, যাত্রার প্রথম অধ্যায়ের হবে পরিসমাপ্তি! উল্কার মত ছুটে এসেছি আমরা হৃতসর্ব্বস্ব এক মনুষ্যগোষ্ঠী—কালকেই তার বেগ হবে প্রশমিত। কোথায় ছিলাম আর কোথায় বা এলাম—একটা জগৎ ছিন্ন হয়ে আর একটা জগৎ যেন তাতে জুড়ে গেছে, আর এই শেষের জগতের একটি স্বর্ণময় যুগের ইতিহাসের সঙ্গে হবে দেখা! কোথায় বাংলাদেশ আর কোথায় যমুনোত্তরীর পথের প্রান্তে নগণ্য এই হনুমান চটির ঘর—সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দশ হাজার ফুটের উপর, আমিই বা কে, ওরাই-বা কে?

আর যেন ভারতে পারি না···কিসের ছেদ পড়ে যায় যেন। আর কয়েক ঘণ্টার ব্যবধান: পাখী ডেকে উঠবে, ঊষার সোনালী আলো ছড়িয়ে পড়বে—সকাল হবে। তারপর পরম পুরস্কার লাভের চেষ্টায় আবার সেই চড়াই ওঠা, উতরাই ভাঙা হবে সুরু! আর একটি দিন... চব্বিশ ঘণ্টার একটা ব্যবধান—তার পরেই মায়ের আশীর্ব্বাদ নেমে আসবে করুণাধারার মত—ধন্য হব আমরা!

ঘড়ির কাঁটার মত যাত্রা সুরু হয়—সকাল ছ'টার মধ্যে হনুমান চটির মায়া কাটিয়ে পথে নেমে আসি, পথ হ'ল একান্তের পরিচিত, একান্তের কাব্য; আজকে নতুন আশা, নতুন উদ্যম...এর যেন শেষ নেই। 'যমুনামায়ী কি জয়' ধ্বনিতে আবহাওয়া ঘন হয়ে ওঠে...মনে হয় যাত্রীরা যেন পুনর্জন্মের পর্য্যায়ে নেমে এসেছে। ক্ষয়িষ্ণু মানুষ বলে এদের আর চেনা যায় না···আজকের দিনে এরা মহত্তমের গণ্ডিতে এসে মিশেছে। যে ভাবের বিকাশটি দেখেছিলাম বদরীকার আগে, সেই হনুমান চটি ছাড়ার পর···যে একাকারের চরমতম পর্য্যায় চোখে পড়েছিল কেদারনাথের আগে রামবরহা ছাড়ার পর—আজকে যমুনোত্তরীর আগেও সেই একই ভাব—সেই একই অনুভূতির প্রকাশ চোখে

পড়ে। বড় সুন্দর, বড় মহান মানুষের এই ভাব—এর তুলনা নেই। গণ্ডীবদ্ধ মানুষের নিঃস্ব ও দেউলে হয়ে যাওয়ার করুণতম ছবিই চোখে পড়ে বেশী, যত পাপ যত দীনতা, অশুচিতার পাকে পাকে আমাদের ভিতরকার সম্পদ হয়ে গেছে ভিখারীর খুদকুড়ো—আমরা তাই আত্মাকে দেখি না, তার অবমাননা করি পদে পদে ! সমাজের স্তরে স্তরে গ্লানির স্তূপ—আর এই স্তূপের পলিমাটির ভিতর আমরা আটকে পড়ে আছি, তাই ভুল আমাদের পদে পদে, রাজসিক ও তামসিক বৃত্তিটাই সর্ব্বস্ব হয়ে উঠেছে।

কিন্তু…।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অনাঘ্রাত পুষ্পের মত একটি বৃত্তিও ভগবান দিয়ে রেখেছেন, সে পুষ্প দুর্লভ, সে অম্লান ! তাকে চিনতে হয় বুদ্ধি দিয়ে—আত্মবিশ্লেষণের ভিতর, তবে সেই ফুলের সার্থকতা। মাটির উর্ব্বরতাই যখন সব—তখন সে ফুলের জন্যে ভাবনা নেই। হনুমান চটি ছাড়ার পর মনে হ'ল মাটির এই উর্ব্বরতার ভিতরে প্রত্যেকটি যাত্রীর সেই বৃত্তির দ্বারোদ্ঘাটন হয়েছে…খুলে গেছে সব। এখানে মানুষ শুধু মানুষই নয়, এখানে তার সংজ্ঞা আলাদা, পরিচয় আলাদা। গাঁইতের মারের মুখে এক একটি বিরাট সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়েছে সকল যাত্রীর ভিতর, তাই মানুষ এখন কেবলমাত্র নর নয়, সে নরোত্তম। যা অসত্য, যা ভুল তাই ধুয়ে মুছে গেছে—মায়ের আশীর্ব্বাদপুত সন্তানের বিরাটত্বের এখানে তুলনা নেই। তাই এই বুকফাটা চীৎকারের ওঙ্কার —'যমুনামায়ী কি জয়'।

তিন মাইল পথ পেরিয়ে এলাম, আর এক মাইল, তার পর খরসালী —যমুনোত্তরী পথের মানুষের গড়া শেষ উপনিবেশ। এই এক মাইল সুরু হ'ল, আর চলতে চলতে চোখে পড়তে লাগল নানাবিধ পুষ্পসম্ভার,

নামী ও অনামী। চিনতে যা পারলাম, তা হ'ল কাঠ গোলাপের ঝোপ কিংশুকের গুচ্ছদল আর বন্যফুলের সম্ভার, আর এদের পটভূমিকায় ধ্যানগম্ভীর বিশাল অর্জ্জুনগাছের অতন্দ্র সাক্ষীর মত জেগে থাকা। পাইনগাছ দেখতে দেখতে এসেছি, মনে হয়েছে এ ছাড়া আর কোন বৃক্ষের সন্ধান নেই এ পথে—ফুল ত চোখে পড়েই নি। খরসালীর আগে এদের পরিচয়টি আকস্মিক ও অনাস্বাদিত ব'লে প্রত্যেক যাত্রীকে ভাবিয়ে তোলে। পাখীর কাকলীর সুরুও এখানে, ইতি সেই খরসালীর শেষে। গোলাপের ঝোপ সংখ্যাহীন—অকৃপণভাবেই পাষাণ মৃত্তিকাকে এরা বর্ণ দিয়েছে, পরিচয় দিয়েছে, আর আবহাওয়াকে ক'রে তুলেছে নম্র ও মিষ্টি। কিংশুকের পরিচয়ও তাই—তারাও সংখ্যাতত্ত্বকে হার মানিয়েছে, যেন প্রত্যেক ফুলটি সৃষ্টিতত্ত্বের এক একটি সম্পদ, মনে হয় দেবাদিদেবের জটাজালের উপর একাদশীর চাঁদের মত এক একটি ফুলের পরিচয়। যত দূর দৃষ্টি চলে শুধু ফুল আর ফুল—আর তার শেষ ঐ খবসালী গ্রামের শেষ সীমান্ত পর্য্যন্ত।

ভাবছিলাম সৃষ্টির কি অপার মহিমা, ধ্যানের ভিতর দিয়ে এ মহিমার সূত্র খোঁজা যায় শুধু। এ ফুল ও ফল ত এমনি নয়, সৃষ্টি হয়েছে এদের একটি বিশেষ অধ্যায়ের জন্যে—এদের সৃষ্টি যেন জীবনের শ্রেষ্ঠতম পূজার নৈবেদ্যের জন্যে, বরণডালা সাজানোর জন্যে। মায়ের মন্দির ত আর বেশী দূর নয়, সামনে খরসালী আর তা ছাড়ানোর পর একটিমাত্র দুরূহ চড়াইয়ের যা ভ্রূকুটি, তার পরেই মা যমুনার আঞ্চলিক আশীর্ব্বাদ নেমে আসবে যাত্রীদের উপর, তাঁরই সৃষ্ট সন্তানদের উপর। আর এই সন্তানদের অঞ্জলির অর্ঘ্যের জন্যে পুষ্পসম্ভারের অভাব রাখেন নি মা, তিনি যে চিন্তাহরণী ও চিন্ময়ী। সারা অঞ্চল জুড়ে শুধু ফুলেরই ইতিহাস আর সেই সঙ্গে পট-পরিবর্ত্তনের আভাস, এ আর কিছু নয়, এ কেবল

তাঁরই প্রয়োজনের জন্যে। ষোড়শোপচারের পূজার জন্যে ফুলসম্ভার... কাঠগোলাপ আর কিংশুক, কিংশুক আর রিঙাল—সবই তিনি কঠিন পাষাণমৃত্তিকার ভিতর থরে-বিথরে সাজিয়ে রেখেছেন। আমরা—যারা হামাগুড়ি দিতে দিতে এত দূরে উঠে এলাম, ঘর সংসারের মায়া কাটিয়ে, আমাদের কর্ত্তব্য হ'ল অঞ্জলির ভিতর এ গুচ্ছদল তুলে নিয়ে মায়ের মন্দিরে বৃহত্তম কল্যাণের জন্যে পৌঁছে দেওয়া। চোখের ভিতর দিয়ে আত্মার উপলব্ধির ভিতর এর সঙ্কেত যদি না আসে, তা হ'লে বুঝব কিছুই চেনা হ'ল না, জানার ভাণ্ডার রইল শূন্য হয়ে।

বিভোর হয়ে চলছিলাম এ পথে। সারা দেহে রোমাঞ্চ আসছিল অদৃশ্যময়ী সেই পরমাশক্তির কথা ভেবে—যাঁর সৃষ্ট বিশ্বচরাচরে কোন কিছুরই অভাব নেই। আমরা তাঁকে দেখি না, খুঁজি না, তাই তিনি আসেন না। অনু থেকে বৃহত্তম, সকলের জন্যে গুছিয়ে রেখেছেন তিনি সব,—আমরা স্থূল দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে তাঁর নির্ব্বিশেষ কল্যাণকে হারিয়ে ফেলি।

খরসালী গ্রামের আগে এই এক মাইল পথ, ফুলের বর্ণ-উচ্ছ্বাসে সমৃদ্ধ ও সুমহান্—চিন্তার ভিতর একটা নেশার আমেজ যেন···বিভোর হয়েই পথচলা আমার।

কত কে আসছে, যাচ্ছে···দেখেও দেখি না, অনামী তারা, পরিচয়-হীন গোত্রহীন মানুষের মিছিল...তীর্থ পথের পাশকাটান নরনারী! আমি ফুলের মহিমা জপতে জপতেই পথ হাঁটছি।

কিন্তু এ কি?

পাহাড়ের নেমে-আসা বাঁকের মুখে পথেরই উপর এই পাশকাটান নর ও নারীর ভিতর একটি অদ্ভুত লাবণ্যসমৃদ্ধা অষ্টাদশীর আবির্ভাব··· ফিকে সবুজ শাড়ী অঙ্গে জড়ান, হন্ হন্ করে আসছে এদিকে।

দেখেও দেখি না—ঐ পরিচয়হীনদের ভিতর কেউ হবে বা। ছু'পাশে ফুলের যে সমারোহ তার উপরেই আমার দৃষ্টি—আর তার আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণেই মন ছায়াচ্ছন্ন, তাই সূত্র হারিয়ে ফেলি, দেখেও দেখি না, বুঝেও বুঝি না। আমার পাশ ঘেঁষেই অষ্টাদশী চলে গেল একটি বিশেষ অনাবিষ্কৃত ছন্দের মত, তরঙ্গের উচ্ছ্বাসের মত।

কেমন একটা শিহরণ—কিসের একটা অদ্ভুত অনুভূতি শিরা-উপশিরায়···ঝিমঝিম করে ওঠে সারাটা শরীর আমার।

এ রকম ত হয় না, এ অনুভূতি ত নতুন, এ যে-এক অনাস্বাদিত শিহরণ।

চমকে মুখ ফিরিয়ে তাকাই—অনামী কান্তার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের উপর ফেলা ফিকে সবুজ শাড়ীর অবগুণ্ঠন, মাথার সিঁথীর সীমন্তে সোনার একটি টিকলী, ছায়াঘন-পল্লবিত ছুটি চোখ—মায়াবিনী পথেরই প্রান্তে অদৃশ্য হয়ে কর্পূরের মত উবে যায়—।

আমারই সামনে—তৃষাতুর ছুটো চোখেরই সামনে এ অষ্টাদশীর বাতাসে বিলীন হয়ে যাওয়া! কয়েকটি মুহূর্ত—তার পরেই বাজ পড়ার মত উপলব্ধির আকাশে চৈতন্যোদয়ের একটা চোখ ধাঁধান আলোর ঝলক, যা সমস্ত জীবনের বুদ্ধি ও অনুভূতিকে বিদীর্ণ ও মথিত করে চলে যায়।

কয়েকটি সেকেণ্ড, তার পরেই জ্বলজ্বলিয়ে সেই ব্রহ্মতালে দেখা দৃশ্যসম্পদ ভেসে ওঠে মনের পটভূমিকায়। যে পথে চলেছিলাম—তাকে আবার দেখি, বিচার করে নি, মিলিয়ে নি।

সেই পথের বাঁক—অসমাপ্ত তরুবীথিকার ছায়াছন্ন পরিবেশ! সেই ফিকে সবুজ শাড়ী, সেই রহস্যময়ীর অদৃশ্য হয়ে যাওয়া—সব ঠিক, কোন ভুল নেই।

কিন্তু আমারই ভুল হয়ে গেল। ভুল হয়ে গেল গোটা জীবনের। এ ভুল সর্ব্বগ্রাসী ভুল। মা ফুল দেখিয়ে ভুলিয়ে রেখেছিলেন আমার মত নির্ব্বোধ শিশুকে, তারই আকর্ষণে এক দুর্লভতম সম্পদ হারালাম আমি—। এক মিনিটের ইতিহাস জীবন-ইতিহাসে যা চির আরাধনার, বন্দনার ও সর্ব্বোত্তম সুকৃতির ; হারালাম আমি—।

হনুমান চটির অন্ধকারাচ্ছন্ন ধর্ম্মশালার ঘরের একটি প্রান্তে বুক-ভরা অভিমান সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ফুলে ফুলে উঠেছে গত রাত্রে —তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখেছি মনের ভিতর ফেলে-আসা পথকে যদি ব্রহ্মতালে দেখা সেই স্বপ্নের পথপ্রান্তটুকুকে সামঞ্জস্যের সীমায় আনা যায়···অভিমানই থেকে গেছে, সে পথের সাদৃশ্য পাই নি কোনখানে।

কিন্তু···।

একটি রাত্রের পর সে অভিমান ঘোচাতে এলেন সেই মাতৃমূর্ত্তি, পরে এলেন নানালঙ্কার বিভূষিতা হয়ে, ফিকে সবুজ শাড়ী পরে। যে পথকে দেখেছিলাম সেই পথই ছবির মত খরসালীর প্রান্তসীমায় ফুটে উঠল বাস্তব হয়ে, সত্য হয়ে, শাশ্বত হয়ে। আমি ফুল দেখলাম, তার রং বুঝলাম—অথচ আসল ফুল অঞ্জলিতে নিলাম না—তার রংও আমি চিনলাম না।

সংমূঢ়ের মত আমি মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় বসে পড়ি একটি পাথরের উপর। চোখে হাত দিলাম। কাঁদছি আমি—কখন যে অশ্রু নেমেছে বুঝতে পারি নি। সব হারানোর হাহাকারে বুকের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছিঁড়ে গেল রেণু রেণু হয়ে—মনে হ'ল পাগলের শেষ দশা আমার। আমি কি হারালাম? ভবতারিণী মা কিসের কোন সম্পদ থেকে বঞ্চিত করলেন আমাকে? আক্ষেপের আবর্ত্তে আমি যেন শতধাবিভক্ত হয়ে যাই।

কলম ও কালি দিয়ে এ নিগূঢ় তত্ত্বের মর্ম্মকথার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন সম্ভব নয়, তাই সে প্রচেষ্টাকে নিবৃত্তির পথে টেনে আনাই উচিত। যে জিনিস দেখেছি, হারিয়েছি যে সম্পদ সামান্য ভুলের জন্যে, ভবিষ্যৎ জীবনেতিহাসের পাতায় পাতায় তার প্রভাব কতখানি—তার কড়া-ক্রান্তির হিসেব এখানে থাক। এ প্রচেষ্টা আমার শুধু মায়ের কাঠামোর উপর অবোধ শিল্পীর মত রং বুলান মাত্র, আসল রং কি দেওয়া যায়? সে রং থাক আমার মনেরই ভিতর অবগুণ্ঠনময়ী হয়ে।

যা গুহ্য তা চিরকালই মূক, যা অব্যক্ত তা চির মৌন···খরসালীর পথপ্রান্তে ফেলে-আসা কাহিনী এই পর্য্যায়ের—একে বাক্য দিয়ে, বিশেষণ দিয়ে বুঝান যাবে না কোনদিন।

তবে উপসংহারের তাগিদ মত এইটুকু মাত্র বলে রাখি—পাত্র পূর্ণ হওয়া চাই, না হলে আরাধ্য সম্পদ আসবে না, এলেও তা মরীচিকার মায়াই শুধু জীবনে এনে দেবে। মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনধারণে সারবস্তু সে জীবনের যোগাযোগ—তারও মাপ আছে, পরিধি আছে, ব্যাপ্তি আছে। এই যোগাযোগ আসে তখনই যখন আত্মা প্রদীপের ঊর্দ্ধশিখার মত তাঁরই উদ্দেশ্যে জ্বলতে পারে যাঁকে আমরা চিরকাল জীবনের প্রণাম জানিয়েছি। এ প্রণাম হওয়া চাই পূর্ণাঙ্গ—স্বয়ংসম্পূর্ণ—জপের ভিতর দিয়ে এ প্রণাম অষ্টপ্রহরের হওয়া চাই। না হ'লে হাহাকারই থেকে যাবে, সব পেয়েও শূন্য হয়ে যাবে সব।

যমুনোত্তরী দুর্জ্ঞেয় অঞ্চল—রহস্যের পীঠস্থান। এমন কোন জিনিস নেই যা মেলে না ওখানে। অতন্দ্র বিশ্বাস নিয়ে এগুতে হবে, পথ চলতে হবে—ভুল হ'লে চলবে না। সম্পদের পর সম্পদ—ঐশ্বর্য্যের পর ঐশ্বর্য্য—শুধু প্রাপ্তির জন্যেই ওখানে থরে-বিথরে সাজান

—স্বকৃতির মাহেন্দ্রক্ষণে যোগাযোগের সন্ধিপূজায় মানুষের জীবনে এদের স্রোতস্বিনীর মত নেমে আসা অপরিহার্য্য ও অমোঘ।

এক মাইলের এই স্বর্ণাঞ্চল শেষ হয়ে গেল, এসে গেল খরসালী—সমাজবদ্ধ মানুষের গড়া যমুনোত্তরী পথের শেষ জনপদ। দুটো পথ, প্রথম পথটি গ্রামকে হাতছানি দিয়ে দূর দিয়ে চলে গেছে, গিয়ে মিশেছে যমুনার ধার বরাবর। দ্বিতীয় পথটি খরসালী গ্রামের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে এঁকে-বেঁকে—এরও শেষ যমুনার স্রোতস্বিনীতে। খরসালীর নাম এর আগে কতবার শুনেছি—না দেখেই যাব? দ্বিতীয় পথকেই বেছে নিলাম। রাস্তার দু'ধারেই লাইনবন্দী ঘর অর্থাৎ মকান আর রাস্তাটি এ বাড়ীর উঠান, ও-বাড়ীর চাতালের তলা দিয়ে চলে গেছে—আমরা যেন ব্যক্তিবিশেষের বাড়ীর অন্দরমহলের ভিতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। পথঘাট নোংরা—অশুচিতায় ভরা যেন সমগ্র খরসালী গ্রাম—অথচ যমুনোত্তরী মন্দিরের অধিকাংশ পাণ্ডাদের আস্তানা এখানে। বদরীকার পথের পাণ্ডুকেশ্বরকে স্মরণ করিয়ে দেয় অপরিচ্ছন্নতার দিক থেকে। একটি মন্দির চোখে পড়ে—অনামী মন্দির, নাম পেলাম না বা বিগ্রহ দর্শন হ'ল না। ছোট্ট গ্রাম খরসালী, তবে বসতি ঘন—প্রাণের চাঞ্চল্য আছে। আধ ঘণ্টার চলার পর খরসালী গ্রাম মায়া কাটাল আমাদের, এসে পড়লাম যমুনার তীরে। এখানেও সেতুর সেই সহজ সংস্করণ চোখে পড়ে অর্থাৎ কাঠের গুঁড়ি ফেলা আছে—কোনরকমে পার হয়ে যাই। যমুনার স্রোত এখানে মারমুখী ও ভীষণা—উন্মাদিনীর মূর্ত্তিতে পৃথিবীর দিকে ছুটে চলেছেন। গাংনানীর সে যমুনা এ নয়—যমুনা এখানে চণ্ডালিকা।

যমুনার অপর পারে জানকীমাই চটি। বিশ্রামের যোগ্য স্থান বটে—হেঁটে এসেছি অনেকটা, সামনে ভৈরবঘাঁটির বিখ্যাত

প্রাগৈতিহাসিক চড়াই—বসে যাই একটু যমুনার ধারে—শান্তি মিলবে।

ধরম সিং হঠাৎ পেছন থেকে ব'লে উঠে—"বাবাজী, উধার দেখ।" চা খাচ্ছিলাম, ঘাড় ফিরিয়ে দেখি দৃশ্যের এক বৃহত্তম সম্পদ। দূর আকাশের নীলিমায় যমুনোত্তরী পর্ব্বতশ্রেণীর অভ্রভেদী রূপ, সুমহান্ ও শাশ্বত। গোটা দিক্‌চক্রবাল ঘিরে তুষারমণ্ডিত গিরিশ্রেণীর অন্তহীন শোভাযাত্রা একটি অখণ্ড জিজ্ঞাসার মত ফুটে আছে—পাতলা মেঘের একটি আস্তরণ এই শোভাযাত্রার উপর মালার মত জড়ান। যা দেখলাম—এরই নাম যমুনোত্তরী গ্লেশিয়ার, এর রূপ ব্যাখ্যায় আনা দুঃসাধ্য। যা দেখেছিলাম কেদারের পথে অগস্ত্যমুনি ছাড়ার পর, এধার থেকে ওধার পর্য্যন্ত ধূম্র জটাজালের প্রচ্ছন্ন রূপ, জানকীমাই থেকে সেই দেখার আর এক অধ্যায়ের সৃষ্টি। ঐ পর্ব্বতশৃঙ্গের তলায় যমুনা-মায়ের মন্দির—যার জন্যে আমাদের সুদূর বাংলা দেশ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে আসা।

আর দেরি নেই—পথ শেষ হয়ে এল!

॥ পাঁচ ॥

বেলা তখন এগারটা—খাওয়ার তাগিদ ছিল, জানকীমাই চটিতে পুরি ভাজিয়ে নেওয়া হ'ল। ছোট্ট একটি ছেলে আটা আনল, ঘি আনল আর তার কাজ সমাপনের ভার নিল স্বয়ং ধরম সিং। কাজটি সে এক রকম জোর করেই নিল, অবশ্য অন্য উদ্দেশ্যে নয়, সময়ের অপচয় দূর করার জন্যে। গরম গরম পুরি খাওয়া যমুনোত্তরীর পথে এই আমার প্রথম—রৌপ্য মুদ্রার অভাবের জন্যে এ পর্য্যন্ত ধরম সিঙের হাতে গড়া শুক্‌নো রুটিই গলাধঃকরণ করতে হয়েছে। আমার রুচি ছিল না, তাই এ জিনিসও বাধ বাধ ঠেকে—বীরবলরা বেশী করেই ভাজায় আর খায়ও বেশী। খাওয়ার পাট তখনও চলছে, এমন সময়ে একটি বাঙালী সন্ন্যাসী এসে পড়েন—পরিচয় হয়ে যায় নিবিড় ভাবে। এ পথে এই প্রথম বাঙালীর দর্শন পাওয়া, তাও সন্ন্যাসীর উত্তরীয় পরা বাঙালী। তাঁর মতে সামনের যে চড়াই এটাই এ পথের বৃহত্তম ও কঠিনতম। সাড়ে তিন মাইলের চড়াইকে মনে হবে দশ মাইলের চড়াই, চড়াই হিসেবে যার তুলনা নেই।

বললাম, "যমুনা চটির পর যে চড়াইটা পেরিয়ে এলাম, সেটা?"

বললেন, "ওটা এর তুলনায় শিশু। চড়াই হিসেবে তারও মূল্য আছে, তবে ভৈরবঘাটি যাত্রীর প্রাণশক্তিকে যেন শুষে নেয়। কিন্তু প্রত্যেক যাত্রীর ওপর তাঁর করুণার অভাব নেই, নচেৎ যমুনোত্তরীর মন্দিরে যেত কে? শঙ্কার কারণ নেই, তাঁকে স্মরণে রাখবেন, তা হ'লেই হ'ল।"

বাঙালী মূর্ত্তি পণ্ডিত ওঙ্কারনাথের শিষ্য, হুগলী জেলায় বাড়ী। আধ ঘণ্টা কথাবার্ত্তার পর উঠে গেলেন—গন্তব্যস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করেও উত্তর পেলুম না। আমরাও উঠে পড়ি। খরসালী গ্রামের আগে দিয়ে যে রাস্তা এসে যমুনাকে ছুঁয়ে অপর পারে এসে পড়েছে, আমাদের চলা সুরু হয় এই পথকে সম্বল ক'রে। আধ মাইল বড় জোর যমুনার ধার বরাবর পথ—এটি পেরুনোর পর আচমকা যমদূতের মত একটা পাহাড় মারমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে আমাদের সামনে, চড়াইয়ের সুরু এরই পর থেকে···ভৈরবঘাটির ঐতিহাসিক চড়াই! বিহ্বল হয়ে আমরা দাঁড়িয়ে যাই!

লাঠি মার্কা চড়াই—এর নাম শুনেছিলাম, পরিচয়টা হ'ল এখানে। নির্ভেজাল চড়াই···একটা বিকটাকার পাহাড় একেবারে মৃত্তিকার বুক চিরে হাউইয়ের মত আকাশের দিকে ছুটে গেছে কিসের একটা প্রচণ্ড তাড়া খেয়ে। মনে হ'ল, বর্ণনার মধ্যে ভুল থেকে গেছে—যমুনা চটির পর পাহাড়গুলোকে চড়াইয়ের দিক থেকে প্রাধান্য দিয়ে। সত্যিই তারা শিশু···পথের সামনে যা এল এর অগ্রজ হওয়ার দাবী আমার পরিব্রাজক জীবনে আর কেউ করে নি। সত্যিই এর তুলনা নেই—সমগ্র জীবনকে যেন তাল ঠুকে চোখ রাঙিয়েছে সামনের ওই পাহাড়—এই প্রাগৈতিহাসিক পাষাণসম্ভার!

তলা থেকেই দেখতে পাচ্ছি এক থাক্, দু'থাক্, তিন থাক্ যাত্রীর এক একটি ভগ্নাংশ পাহাড়ের বিভিন্ন স্তরবিন্যাসের ভিতর পিঁপড়ের সারির মত চলেছে, দূর থেকে তাদের চলমান বিন্দুর মিছিল ব'লে মনে হয়। ঘোরানো সিঁড়ির মত একটি সর্পিল পথরেখা ঘুরে ঘুরে আকাশের মেঘের মধ্যে যেন হারিয়ে গেছে। চড়াইয়ের সামনে আমাদের বুক অজানিত শঙ্কায় দুরু দুরু ক'রে ওঠে—মনে হয় তিতিক্ষার

কাঠামোতে অদৃশ্য মহাশক্তির বিশাল বাহুর একটা টান পড়েছে যাতে এই মুহূর্ত্তে সে কাঠামো ভেঙে চুরে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যেতে পারে।

নিরেট একটি অখণ্ড পাহাড়···মহাকালের মত পথ রুখে দাঁড়িয়ে আছে। এর দম্ভের যেমন সীমা নেই—তেমনি নেই এর স্পর্দ্ধার। দুর্গানাম স্মরণ ক'রে মুষ্টিমেয় আমরা চড়াইয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। অগ্রসরমান এই দলের প্রথমে কাণ্ডারীর মত বীরবল হঠাৎ গেয়ে ওঠে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সেই গান—'কদম কদম বড়াহে যা—।' ওর মার কাছ থেকেই শোনা, মিলিটারীতে কাজ করত বীরবল—সেখান থেকেই তার এ গান শেখা—তবে শুনি নি কোন দিন। অদ্ভুত এক আবেগ সৃষ্টি হয় এ গানে, রক্তে তার প্রভাব বুঝতে পারি। বীরবলের পেছনে আমি—তার পর মাতাজী ও রুক্মিণী—সব শেষে ধরম সিং। এক মাইলের একটা পথ—হ্যাঁ, সে পথই বটে! সেই ছায়ামাত্র, আর কোন কিছুর বালাই নেই। অসংখ্য খণ্ডবিখণ্ড পাথর ছড়ান পথের উপর—দু'ধারে ঘন জঙ্গল আর এই জঙ্গলের জঠরে স্তূপীকৃত অন্ধকারের রাজত্ব—সূর্য্যের আলোর পরাভব ঘটেছে যেখানে। দশ পা কোন রকমে ওঠবার পরেই বসে পড়ি—দম নি, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ভিতর অযথা একটা বিরোধ বাধে। বীরবলের প্রাণমাতানো গান পাহাড়ের নির্জ্জনতায় একটা অবদানের সৃষ্টি করে, মনে হয় বীরবলের এ গান ভিন্ন চলতাম কি ক'রে? জাতীয় সঙ্গীতের সুর, তাল, লয়, মান বীরবল হুবহু অনুকরণ করেছে—আজকের এই অর্ব্বাচীন পথের ওপর এ অনুকরণের মর্য্যাদা যেন শত গুণে বেড়ে ওঠে। মোটামুটি এক মাইল এই রকম শ্বাসকষ্টকর যুদ্ধের ব্যাপারটি—তার পর এই পথটি নেমে গেছে সোজাসুজি উৎরাইয়ের সামান্য একটু সান্ত্বনার ভিতর—যার শেষে একটি ঝর্ণার ধারার উৎপত্তি আর তারই পাশে

পাহাড়ের গায়ে একটি ছোট্ট চায়ের দোকান। এখানে এলাম আমরা শূন্য হয়ে, দেউলে হয়ে, রিক্ত হয়ে!

রুক্মিণীর মুখের দিকে তাকাই, দেখি ক্লান্তিতে তার মুখটি কালো হয়ে উঠেছে—পিঠের ওপর তার শিশুটিকে সে বেঁধেছে যত্ন করে নানাবিধ গরম কাপড়ের অরণ্যের ভিতর। বড় সুন্দর লাগে ওকে, বৈরাগ্যের পথে মাতৃমূর্ত্তির এক মহিমান্বিত রূপ! জিজ্ঞাসা ক'রে হা হুতাশের একটি শব্দও তার কাছ থেকে পাই না। বুঝিয়ে দেয় কষ্ট না করলে ভগবান মেলে না। দুটো চোখ বসে গেছে—রুক্ষ এক মাথা চুলের বন্যা, ডুরে শাড়ীপরা আহমদাবাদী অনুকরণে, দাঁতে দাঁত বসে গেছে রুক্মিণীর—তবু তৃষাতুর দুটো ঠোঁটের ওপর বিজয়িনীর হাসি।

বীরবলের মাতাজীও অটুট ও সঙ্কল্পে মহত্তমা···বৃদ্ধাকে এখানে গোটা হিন্দুধর্ম্মের একটা বিশেষ ধারা বলে মনে হয় আমার···বড় ভাল লাগে। বীরবলের ত কথাই নেই—আজকে সে এই উর্দ্ধমুখী পাহাড়ের মতই সর্ব্ব দিক দিয়ে বড় হয়ে উঠেছে···এরও তুলনা পাই না। এখানে চা ছাড়াও গরম দুধ মেলে—দুরতিক্রম্য একটা চড়াইয়ের পর এই দুধের অবদানটিও কম নয়!

যে চড়াইকে ফেলে এলাম তার চতুর্গুণ দুরারোহ এই শেষের পথটুকু। এক মাইলের কৃচ্ছ্রসাধনার পর চা ও দুধের মনোরম পরিবেশটুকু, এ আর কিছু নয়, সামনের এই দু'মাইলের লাঠিমার্কা চড়াই-এর আগে সান্ত্বনার একটা ছেঁড়া পাতা। ভৈরবঘাটির এই দুই মাইলের পরীক্ষা, এর শেষও যেমন নেই, তেমনি নেই এর অর্থের ব্যাপকতা। আদিম এই পাহাড়—বর্ব্বর এই চড়াই···যমুনোত্তরী যাত্রীর শেষের এই পরীক্ষার তুলনা ভারতভূমির কোন তীর্থের ইতিহাসে নেই। গঙ্গোত্তরী মন্দিরের আগে

আর এক ভৈরবঘাটির চোখ ধাঁধান বহিঃপ্রকাশ আছে—কিন্তু সেখানে ভৈরবের রক্তচক্ষুতে মৃদু সান্ত্বনার ইঙ্গিত আছে, এখানে সেটির গুরুতর অভাব। ভৈরব এখানে ক্ষেপা ও উলঙ্গ···।

তুঙ্গনাথ ও ত্রিযুগীনারায়ণের উপর উঠে যাঁরা আত্মপ্রসাদে সন্তুষ্ট হন—তাঁরা যেন একবার এদিকে এসে এই শেষের দু'মাইলের শিক্ষাটি উত্তীর্ণ হ'য়ে যান। মান্ধাতার রূপ যেমন পাহাড়ের—তেমনি অবিনাশী রূপ এই সঙ্কীর্ণ পথরেখার। সৃষ্টির এ রকম দানবীয় রূপ আর কোথাও দেখি নি আমি। সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে এক বিশাল পাহাড় ধীর গম্ভীর মূর্ত্তিতে অসীমের দিকে ধাওয়া করে গেছে···অদ্ভুত এই পাহাড়, অবিস্মরণীয় এর স্মৃতি! পথ কোথাও কৃপণতম—কোথাও সে একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে পাহাড়ের গহনতায়। পথচলা সুরু হতে মনে হ'ল আমি হারিয়ে গেলাম চিরদিনের মত—এ বিলুপ্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই! কে যেন গ্রাস করে নিল সব—উদ্গীরণের অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে এর। পথ ত প্রায় নেই—স্থানবিশেষে উপরকার ধ্বস নেমে আসার ফলে তার ক্ষীণ পরিচয়ও হারিয়ে গেছে। কোথাও ন'দশ ইঞ্চির পথের হারিয়ে যাওয়ার ভিতরও পরীক্ষার এক উলঙ্গতা প্রকাশ হয়েছে···আসতে আসতে দেখা যায় পথ একেবারেই নেই, তার উপর কেবলমাত্র একটি কাঠ ফেলা। এক হাতে পাহাড়ের গা ধরে পাশের অন্তহীন খাদের দিকে একবারও না তাকিয়ে এই কাঠটিকে সম্বল করে যাত্রীদের এগোতে হয় এক পা এক পা করে—পা ফসকালেই মৃত্যু আর মৃত্যুই চরম এখানে। সেই বাঙালী সন্ন্যাসীর কথাই সত্যি—"তিন মাইলের চড়াই মনে হবে দশ মাইল। তাঁর কথা স্মরণে রাখবেন, তা হলেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন।"

কথাটা সত্যি শুধু নয়—এমন প্রামাণিক বাস্তব আর কিছু নেই। পরীক্ষাই বটে—এ পরীক্ষা ষোল আনার ওপর আঠার আনা। সর্ব্বক্ষেত্রেই এই একই সূত্র—একই ধারা। ভারতভূমির কেদারনাথ—বদরিকানাথ—গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী মন্দির দর্শনের আগে অবিচ্ছেদ্য এই পরীক্ষার ইতিহাসটি প্রত্যেকটি তীর্থের সঙ্গে যুক্ত ও অবিভাজ্য। কেদারের প্রবেশপথে তুষার ঝঞ্ঝা ও প্রাকৃতিক নিরাভরণতার বৈধব্য রূপ—বদরীকার আগে হনুমান চটির পর সুবিশাল সেই দিগন্তবিস্তারী চড়াইয়ের ভ্রূকুটি ও তুষারক্ষেত্র আর আজকের এই ভৈরবঘাটির 'রণং দেহি' মূর্ত্তি—একটি সূত্রে গাঁথা মালার মত—একই তিতিক্ষার মর্ম্মকথাটি যেন কানে শুনতে পাওয়া যায়। মা তাঁর শাশ্বত অবস্থানের স্বরূপটি সার্থক ভাবে দর্শন করানোর আগে সন্তানদের একটা আত্মবিশ্লেষণরূপ বাধার সৃষ্টি করে রেখেছেন সব জায়গায়—যমুনোত্তরীর ভৈরবঘাটির এই তু'মাইলের প্রাণান্তকর পরিচ্ছেদ তারই একটা জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ। তিনি এখানে প্রতিটি পাদবিক্ষেপের ভিতর দিয়ে শারীরিক ও মানসিক অবসাদের ভিতর অবগাহন স্নান করিয়েছেন যাত্রীদের, বুঝিয়ে দিয়েছেন—'কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না।' এখানে মা নিঃস্ব করে নিয়েছেন যাত্রীদের, নিঃশেষ করে নিয়েছেন অধ্যবসায়ের সঞ্চয়। কেদার-বদরীর পথে যা ভেবেছিলাম হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে, এখানে সেই ভাবনার আর এক রূপান্তর।

এক পা, তু'পা—এমনি করে মাত্র দশটি পাদবিক্ষেপ—তার পরেই বুকের ভিতর হাতুড়ি বেজে ওঠে—স্বাভাবিক রক্তসঞ্চালনে বাধা আসে, মনে হয় মুখের ভিতর দিয়ে প্রাণের ধুকপুকুনিটা বেরিয়ে যাবে। উঃ! কি অদ্ভুত চড়াই, কি নির্ব্বিশেষ পরীক্ষা!

পা আর চলে না, বিদ্রোহ করে ওঠে শিরা-উপশিরা, মনে হয়—ভগবান, এ কি তোমার পরীক্ষা। এ পরীক্ষার কি শেষ নেই? কাঁটার আঘাতে পা যায় ছিঁড়ে—বসে পড়ি, রক্ত মুছে নি—তবু চলা চাই…অন্ধকার ঘনিয়ে আসার যে আর দেরী নেই! মধ্যাহ্নকে মনে হয় রাত্রির প্রথম প্রহর—কোটি কোটি মহীরুহের শাখাপ্রশাখার বেড়াজালে আকাশের সূর্য্যের আলো গেছে মুছে, তাঁর আলোর প্রবেশাধিকার এ রাজত্বে অপাংক্তেয় হয়ে গেছে। এ এক প্রাগৈতিহাসিক সৃষ্টিতত্ত্বের প্রথম পাতার পরিচয়—বিংশ শতাব্দীর সবকিছুকে এ ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছে।

এমনি করে দু'মাইলের এই নিষ্ঠুর পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল—পৌঁছে গেলাম পাহাড়ের শীর্ষে—যেখানে এ কৃচ্ছ্রসাধনের শেষ। মাতাজীই পৌঁছে গেলেন সকলের আগে—তার পর আমি—তার পর বীরবল ও রুক্মিণী। যে বৃদ্ধার ঘরে থাকার কথা নানা পরিজন-শুশ্রূষার ভেতর—আজকে দেখলাম তাঁরই জয় হ'ল প্রথম—অশীতিপরা বৃদ্ধা আগেই পৌঁছে গেলেন। অদৃশ্য করুণার এও এক সুদুর্লভ আশীর্ব্বাদ—বুদ্ধি দিয়ে যার ব্যাখ্যা চলে না।

এখানে ভৈরবনাথের জীর্ণ মন্দির—শতধা বিভক্ত, প্রাচীন ইতিহাসের স্বাক্ষরমণ্ডিত। ছোট্ট মন্দির—রূপ নেই, বিলাস নেই, নিরাভরণ মন্দির এ। ভিতরে ঢুকে বিগ্রহ দর্শন করলাম। কালিকা মূর্ত্তি—চতুর্ভুজা নন, দ্বিভুজা। এক হাতে ত্রিশূল আর এক হাতে খণ্ডিত রুধিরাক্ত নরমুণ্ড। কালিকা মূর্ত্তির হাতে ভৈরবের ত্রিশূল—এর সামঞ্জস্য ভারতবর্ষের অন্য কোথাও আছে বলে জানা নেই। মাতৃমূর্ত্তিকে আমরা উপলব্ধি করেছি চতুর্ভুজা হিসেবে—বরাভয়দাত্রী, খড়্গধারিণী ও নৃমুণ্ডমালিনীরূপে—মায়ের পূজা সেই রূপেই! কিন্তু

এ ত্রিশূল মায়ের ডান হাতের মুষ্টির ভিতর আবদ্ধ কেন? এই প্রশ্নের উত্তর প্রচ্ছন্ন হয়ে এখানেই আছে—মুহূর্তের চিন্তাতেই তার স্বরূপ ধরা পড়ে। মা এখানে সাধকের দৃষ্টিতে সর্ব্বশক্তিরূপিণী—শবরূপী পুরুষের বুকের উপর মহাশক্তির আধারভূতা, তাই শিব লীন হয়ে গেছেন মাতৃশক্তিতে—ত্রিশূলের আর দ্বিতীয় সংজ্ঞা নেই, মায়ের দক্ষিণ হস্তেই সে মহাস্ত্রের সার্থকতা চরম ভাবে প্রকট হয়েছে। ভৈরবনাথের মন্দির এটি, অথচ ভৈরব নেই, নিগূঢ় কোন কারণে সাধকেরা এখানে প্রকৃতিকেই প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। মন্দিরের সামনেই একটি নামহীন গাছ, তাতে অসংখ্য কাপড়ের ছিন্ন অংশ বাঁধা—শোনা গেল ঐ গাছটিকেই ভৈরব বলে মেনে নেওয়া হয়। বদরীকার পথে চীরবাস ভৈরবেরও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নেই, সেখানেও ভৈরবকে বস্ত্র-দান প্রথাকে বড় করে নেওয়া হয়েছে। সেখানে কালীকামূর্ত্তিকে দেখি নি, এখানে দেখা গেল। অদ্ভুত এক বিদকুটে আবহাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে দশ হাজার ফুটের উপর এই ঘোররূপা শ্মশানচারিণীর অধিষ্ঠানকে কেমন যেন অদ্ভুত বলে মনে হয়। মায়ের রূপে চতুর্ভুজেরই স্বাক্ষর মিলেছে যুগে যুগে—এখানে তারই যেন ব্যতিক্রম। কত শতাব্দী আগে এক তাপস এ মূর্ত্তিকে প্রতিষ্ঠা করে মাতৃসাধনা করে গেছেন কে জানে—তাঁর দেখা স্বপ্নে মা যে কি ভাবে এসেছিলেন তার ঐতিহাসিক তত্ত্বকে খুঁজে বার করা এখানে দুঃসাধ্য। আমরা এগিয়ে যাই, রেখে যাই জীবনের সশ্রদ্ধ প্রণামের একটি অঞ্জলি।

ভৈরবনাথের মন্দির থেকে আর আধ মাইল পথ, এই পথই ক্রমশঃ ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখী হয়ে চলে গেছে যমুনোত্তরীর গহ্বরে। এ পথটুকুও পথ নয়—এ পথটুকুতেও ক্লান্তি আছে ষোল আনা।

কখন উঠে—কখন বসে এ পাথর থেকে সে পাথরের উপর পা রেখে নেমে যেতে হয়। চোখের সামনেই গ্লেশিয়ারের তুষারশুভ্র অভ্রভেদী রূপ—তার বুক থেকে দেখা যায় মা যমুনার ক্ষীণ রূপালি ধারা নেমে এসেছে পৃথিবীর বুকে—এ যে কি দৃশ্য তা বোঝাই কি করে? চারিদিকের যে পাহাড়শ্রেণী তার মধ্যে দুটি পাহাড় রঙ্গমঞ্চের 'উইংসে'র মত দু'দিক থেকে তলায় নেমে গেছে—এর মধ্যে যে স্বল্প ব্যবধান, তারই সামনে বহু দূরে ঐ গ্লেশিয়ারের অন্তহীন শোভাযাত্রা। অদ্ভুত এই দৃশ্যটি! যমুনোত্তরী মন্দিরকে পাহাড়ের উপর থেকে দেখা যায় না। এ মন্দিরের অবস্থান যে প্রকৃতির গহ্বরের ভিতর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সমগ্র অঞ্চলটি কিসের যেন এক অন্তহীন লজ্জায় অধোবদনের রূপটি নিয়ে আছে—এও এক প্রাকৃতিক বিস্ময়। চারিদিকের পাহাড়ের সে উদ্ধত রূপটি আর নেই—একই ছন্দে একই তালে সকলের যেন একটুকরো ভূখণ্ডকে গহ্বরের আকার দেওয়ার জন্যে কাড়াকাড়ি। মন্দিরের এ রকম সাংস্কৃতিক আশ্চর্য্য রূপ ভারতবর্ষে আর কোথাও নেই। যমুনোত্তরী তীর্থের সবটাই এক রহস্য, এই আধ মাইল পথ নামতে নামতে সেই কথাটাই আবার আমার মনে হ'ল।

এ পাথর থেকে সে পাথর—ওঠা-বসার এই রকম এক পরীক্ষা শেষ করে অবশেষে পৌঁছে গেলাম যমুনার তীরে কালীকমলীবাবার ধর্ম্মশালায়—সন্ধ্যার তখন আর বেশী দেরী নেই। গোলাকার ঝক্ঝকে একটি চাঁদ উঠে গেছে আকাশের নক্ষত্র নীহারিকার মায়াজালের ভিতর··· আজ পূর্ণিমা, মনে হয় এ পূর্ণিমা আমার জীবনেরও।

এ দুর্গম তীর্থেও কালীকমলীওয়ালার ধর্ম্মশালা, অবাক হয়ে যেতে হয় এই ভেবে যে ইট কাঠ পাথরের তৈরী আশ্রয়ের এ মহামূল্যবান আচ্ছাদনটুকু তৈরী হ'ল কি করে আর কোন্ মানুষ

করাল। মানুষের মনুষ্যত্বের এও এক সার্থক জয়যাত্রা। অভিমান নিয়ে, বেদনা নিয়ে তীর্থপর্য্যটনের শেষে কমলীবাবার এই দুঃখই বেশী করে বেজে ওঠে যে তীর্থযাত্রীদের কষ্টের অবধি নেই কেবল আশ্রয়ের জন্যে, চারটে দেয়ালের আচ্ছাদনের জন্যে। তাঁর ঘরে ছিল লক্ষ্মী, টাকার তাঁর অভাব ছিল না। আর এই টাকার এক বিরাট অংশ অকাতরে ব্যয় করেছেন ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি তীর্থপ্রান্তরে। তাঁরই চেষ্টায় গড়ে উঠেছে নামী অনামী সংখ্যাহীন তীর্থভূমির ওপর ঘরবাড়ী ও সদাব্রত। সন্ন্যাসীদের জন্যে তৈরী হয়েছে কুটীর ও রম্য পরিবেশ। তাঁর এই বিরাট ও বিপুল অবদান প্রত্যেক তীর্থযাত্রীর অমূল্য পাথেয়— এ অবদান তিনি সৃষ্টি না করে গেলে তীর্থমাহাত্ম্য প্রচার হ'ত না, মায়ের করুণা পেত না কেউ। আজকের এই যমুনোত্তরী তীর্থে কমলীবাবার ধর্ম্মশালায় একটি ঘরের উত্তাপ পেয়ে মনে হ'ল সার্থক সেই মহাপ্রাণ মানুষ, সার্থকতম তাঁর দান। এ ধর্ম্মশালাটি এখানে গড়ে না উঠলে এ তীর্থে আসত না কেউ, অন্ততঃ আমাদের মত গৃহগতপ্রাণ মানুষ। নির্জ্জনতার রাজত্ব হ'ত···যমুনোত্তরী যাত্রীর কলধ্বনি আর শোনা যেত না এখানে।

কি সাঙ্ঘাতিক শীত। পা জড়িয়ে যায়—রক্ত জমে আসে, তুষার রাজ্যে এসে গেছি আমরা, তাই শীতই এখানে একমাত্র আবহাওয়ার খবর। একে ঐ ভৈরবঘাটির রাক্ষুসে চড়াই পেরুনো, তার উপর এই উলঙ্গ শীতের প্রকোপ, তিনখানা কম্বলের অরণ্যে শুয়েও মনে হ'ল এই বুঝি জমে যাব। কেদারে পৌঁছে গত বছর এই রকম হয়েছিল—কিন্তু সে জিনিস এ নয়। এ শীত আদিম ও অমানুষিক, মাথা পর্য্যন্ত ঘুরে যায়! ভাবছিলাম আজ থাক, বিশ্রাম নিই, মানুষের মত হই, তার পর কাল সকালে মন্দির দেখব। কিন্তু পাণ্ডার হাত

থেকে নিষ্কৃতি পাই না, স্মরণ করিয়ে দেয়—আজ পূর্ণিমা। এই বিশেষ দিনে যাত্রী বিশেষের মন্দির দর্শন জীবনের সুকৃতি ছাড়া কিছু নয়।

কম্বল ছেড়ে উঠে পড়ি! মনে হয়, সত্যিই ত, ভুলেই গিয়েছিলাম যে আকাশে অদ্ভুত সুন্দর একখানা চাঁদ আমারই জন্যে অপেক্ষা করে আছে। গরম জামার স্তূপ হয়ে বেরিয়ে পড়ি। আমার আগেই ধরম সিং আর বীরবলরা বেরিয়ে গেছে।

যমুনোত্তরীতে পূর্ণিমা। মুঠো মুঠো তারা আর তারা—আকাশের দূর প্রান্তে একটি মাত্র ছায়াপথ, আর এই স্বর্গরাজ্যের উপর অতন্দ্র নিশাচর সাক্ষীর মত ধকধকে একখানা চাঁদ ফুটেছে। মনে হ'ল ধ্যানের পালা চলেছে চারিদিকের নিস্তব্ধ পাহাড়গুলোর, তারা যেন নিঃসীম হয়ে মিশে গেছে প্রকৃতি-পুরুষের আরাধনার ভিতর। চারিদিক এত চুপচাপ, এত নিথর যে মনে হয় সুপ্তির জড়িমায় মায়ের চোখদুটি বোজা, এ সুপ্তি যেন অনাদি অনন্তকালের। কাঠের সেতুর তলা দিয়ে যমুনা পেরিয়ে গেল—অপর পারে মন্দির, মুখারবিন্দ ও তপ্তকুণ্ড। চাঁদের আলোয় ঝলমলে মা যমুনার ছল-ছলানি কানে আসে—তার পর মর্ম্মে পৌঁছয় আর সে মর্ম্ম কিসের এক অনুভূতিতে অনড় হয়ে যায়, স্তব্ধ হয়ে যায়। হিমবাহজাতা যমুনার প্রস্তরখণ্ডের ধাক্কায় তার ধারার সে কি উচ্ছ্বাস, লক্ষ কোটি জলবুদ্বুদের ফেনিল আক্ষেপ আর এই উচ্ছ্বাসের উপর নেমে এসেছে তরল আলোর বন্যা। স্রোতস্বিনীকে দেখে মনে হয় আশেপাশে কোথাও অভ্রের খনি আবিষ্কৃত হয়েছে আর তারই মুকুট মাথায় করে মা যমুনার এই উচ্ছ্বাসময় গতিপথের আকুলি। মুহূর্ত্তের জন্যে অবশ হয়ে যাই—মনে হয় এখানে একটি কুটীর বাঁধি, থেকে যাই চিরকাল।

পাহাড়েরই একটি ধাপ, তারই পাশে আসল তপ্তকুণ্ডের ধকধকানি, এখানে এখন যাত্রীর ভিড় নেই। তার কারণ এই কুণ্ডের জলেই যাবতীয় আহার্য্যবস্তু পক্ক হয়ে আহারের উপযোগী হওয়ার ব্যাপারটি—জলের ভিতর আটার লেচি কিম্বা চালের পুঁটুলি ফেলে দিয়ে আধ ঘণ্টার মত অপেক্ষা করে থাকা, তার পরই কুণ্ডতা উদ্গীরণ করে দেবে সিদ্ধ অবস্থায়, এখানে কাঠ জ্বেলে রান্নাবাড়ার পাট নেই, ঐ তপ্তকুণ্ডের জলই সব। এই কুণ্ডের বাঁ দিকে ঐ পাহাড়ের ধাপের একাংশে বহু প্রাচীন একটি গুহা—তার ওদিকে কুণ্ডের কোল ঘেঁষে যমুনোত্তরীর মন্দির।

নিরাভরণ মন্দির—অলঙ্কারবর্জ্জিত মন্দির। ভাস্কর্য্য নেই, শিল্পীর আরাধনা নেই—নগ্ন পরিবেশের ভিতর নগ্ন মন্দির—এই রূপেই একে মানিয়েছে, দেখিয়েছে মহান্। কাঠের রেলিং দিয়ে ওপরে উঠে যেতে হয়। মন্দিরের দ্বার বন্ধ ছিল—পয়সার বিনিময়ে পুরোহিত অনুগ্রহ করে খুলে দিলেন সেটি—প্রবেশাধিকার মিলল, চোখে পড়ল গঙ্গা-যমুনার মূর্ত্তি, এদিক-ওদিকে আরও কয়েকটি বিগ্রহের নামমাত্র থাকা। একটি প্রদীপ জ্বলছে উর্দ্ধমুখী হয়ে—তার আলোর সামান্য একটু প্রকাশ—মন্দিরের গর্ভগৃহে বাদবাকী অন্ধকারাচ্ছন্ন। যাত্রীদের ফিস ফিস আওয়াজ কানে আসে, মন্ত্র উচ্চারণ ও স্তবস্তুতি শুনতে পাই···আপাদ-মস্তক ঢেকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি এখানে কিছুক্ষণ। বিগ্রহের উদ্দেশে প্রণাম জানাই—শ্রদ্ধা জানাই। তীর্থে তীর্থে মন্দিরকেই প্রাধান্য দিয়েছে মানুষ, যা কিছু স্তবস্তুতি ঐ মন্দিরকে ঘিরে, মাথা কোটা, আকুলি-বিকুলি সব সেখানেই অর্থাৎ মন্দিরের পাষাণবিগ্রহকে ঘিরে। কিন্তু যমুনোত্তরীর মন্দিরে তারই অভাব। মন্দির গড়ে উঠেছে বটে—গঙ্গা যমুনার মৃন্ময়মূর্ত্তি সমাসীন, তবু তীর্থযাত্রীর ভিড় থাকলেও

ভক্তির উচ্ছ্বাসের ব্যাঘাত ঘটেছে। মন্দির প্রাচীন নয়, নবীন—বর্ত্তমান শতাব্দীতেই শোনা যায় এ মন্দিরের বনিয়াদ গড়ে উঠেছে আর এই গড়ে ওঠাটুকু মনে হয় অনিবার্য্য কারণের জন্যে, যার সঙ্গে ভক্তিমার্গের সম্পর্কটা কতকটা ছিন্ন হয়ে গেছে। এ তীর্থের যাবতীয় মাহাত্ম্যের ব্যাপকতা এখানকার মুখারবিন্দকে ঘিরে—ছোট্ট একটি চতুষ্কোণ গহ্বর থেকে দু'-তিনটি স্বতঃ উৎসের নামমাত্র যা ধুকপুকনি, শোনা যায় এই কুণ্ডটুকু যমুনার উৎসের মূলসূত্র—তার হৃৎপিণ্ড। তীর্থযাত্রীদের পূজা-অর্চ্চনা, প্রসাদ দান—ভক্তির উচ্ছ্বাসকে এই মুখারবিন্দের ঐতিহাসিক তত্ত্ব গ্রাস করে নিয়েছে—এখানেই মানুষের জলের স্পর্শ নিয়ে জীবনকে ধন্য করার নিদারুণ প্রয়াস। সামনের হিমবাহ থেকে নেমে আসা যমুনার অদৃশ্য ধারার প্রাণটুকু নাকি এখানেই উচ্ছ্বসিত—তাঁর মুখ অরবিন্দের মুখ—তাই এই মুখারবিন্দের যুগব্যাপী সম্বর্দ্ধনা। চতুষ্কোণ একটি গহ্বর—এরই জন্যে আমাদের ছুটে আসা, তিতিক্ষার প্রাণান্তকর অভিযান। মন্দির হয়ে গেছে মূল্যহীন, অর্ব্বাচীন—গহ্বরই মানুষকে দুর্লভতমের ইতিহাস শুনিয়েছে। পূর্ণিমার রাত্রে নক্ষত্রখচিত উন্মুক্ত আকাশের তলায় পূজা দিলাম আমি—উৎসের জল মাথায় ছিটিয়ে জীবনকে ধন্য করি! মুখারবিন্দের কাছেই দুটি তপ্তকুণ্ড... এদের গহ্বর পূর্ণ হয়েছে সামনের ঐ বড় কুণ্ড থেকে, মন্দিরের পাশেই যার অবস্থিতি। জল বাধা মানে না...পাত্র পূর্ণ হ'লেই তার উচ্ছলতা স্বাভাবিক, এ দুটি কুণ্ড ঐ স্বাভাবিকতাতেই পুষ্ট হয়ে চলেছে যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী। এখানে স্নানের ব্যবস্থা...গরম জল একটি পাত্রে করে মাথাটুকুকে ভিজিয়ে নিতে হয়, এইটাই মহিমা। আমরা তাই করলাম। সাক্ষী রইল পূর্ণিমার চাঁদ...জীবনের স্বাক্ষর হয়ে রইল সে।

এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, কেন জানি না, কেদারনাথকে বড় বেশী করে মনে হয়ে গেল। এও তীর্থের তীর্থ মহাতীর্থ, কেদারও ত তাই⋯মনে হ'ল যেন স্বয়ম্ভু মহাদেবের অনন্ত জটাজালের বিস্তারের প্রভাব যাত্রিক জীবনে বড় বেশী ব্যাপক। সেখানে মন্দিরের পিচ্ছিল গর্ভগৃহের ভিতর পুঞ্জীভূত অন্ধকারের পরিবেশের মধ্যে ব্যক্তি-বিশেষের যে উচ্ছ্বাস দেখেছি তার তুলনা একমাত্র কেদারনাথেই সম্ভব। মানুষ নিজেকে যেন ঢেলে দিয়েছে অসীমতার উপলব্ধির ভিতর—ভিখারী শিবের ভিক্ষার পাত্রে পূর্ণ করে দিয়েছে যেন জীবনের পূর্ণাহুতির নৈবেদ্য। কেদারনাথে মানুষের পাগল হয়ে যাওয়া—দেউলে হয়ে যাওয়া। ধকধক করে জ্বলছে পঞ্চপ্রদীপের উর্দ্ধমুখী শিখা, তারই সামনে পাষাণ-মৃত্তিকার বুক চিরে দেবাদিদেবের অদ্ভুত প্রকাশ, দেখেছি মানুষ কাঁদছে হাউ হাউ করে—বুক দিয়ে পড়েছে শিবলিঙ্গের উপর—মানুষের সে পর্য্যায় নরোত্তমের পর্য্যায়—নর ও নারায়ণের মিশে যাওয়া যেন। এখানে সবই আছে—কিন্তু সেই অবর্ণনীয় উচ্ছ্বাসটি নেই। এখানে এসে ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার অভিমানের কথা বলছি না—যা নেই তাই বলছি। শক্তিই যে বড় আর অনাদিদেবই যে শক্তির আদি—কেদারনাথের মন্দিরাভ্যন্তরে মানুষের যে প্রকাশ—সেই বিরাটত্বেরই ইতিহাস তৈরী হয়েছে সেখানে।

আমার মনে হয় যমুনোত্তরী তীর্থের চরম প্রকাশ প্রকৃতিতে—প্রকৃতিই এখানে সর্ব্বাতীতের সন্ধান দিয়েছে। দৃষ্টির সম্মুখে তুষার-শুভ্র হিমবাহ থেকে সরু রূপালি ফিতের মত যমুনার যে ধারা আর সেই ধারার দুটি পাশে আর দুটি ধারার যে সহযাত্রিক গতিপথ—মানুষের অন্তরের অন্তরে এই প্রকৃতিস্বরূপিণী এখানে আসার বৃহত্তম পুরস্কার। মনে হয় সমস্ত জীবন ধরে শুধু ঐ হিমবাহের দিকে চেয়ে থাকি!

মন্দির পড়ে থাক, মুখারবিন্দ পড়ে থাক—একদৃষ্টে অপলকনেত্রে ঐ দৃশ্য দেখে দেখে আমার ধ্যান নেমে আসুক, আমি মগ্ন হয়ে যাই। "উইংসের" মত দুটি যে পাহাড়, তারও যেমন তুলনা নেই, তেমনি তুলনা নেই এখানকার প্রাকৃতিক নিস্তব্ধতার মায়াময় রূপের। যাত্রীর সংখ্যা এখানে অল্প, তাই নিস্তব্ধতার নিজস্ব সত্তাটি এখানে বেঁচে আছে। এখানে প্রত্যেকটি পাহাড়ের অর্থ অজানা, ব্যঞ্জনা আলাদা, বিশেষণ আলাদা। প্রাকৃতিক গহ্বরের ভিতর ঐতিহাসিক এই মহাতীর্থ...এর তুলনা অন্য কোথাও আছে বলে মনে হয় না আমার।

যমুনোত্তরীতে দ্বিতীয় দিনের সুরু হ'ল যমুনার মূর্চ্ছনার ভিতর।

স্মরণীয় একটি দিনের শেষে আর একটি দিনের সুরু...প্রাকৃতিক গহ্বরে আর একটি দিনের ইতিহাসের উন্মোচন।

ধরম সিং চা সংগ্রহ করে আনে—মুখ ধোয়ার জন্যে গরম জলও সংগ্রহ করে এনেছে সে। মাতাজী উঠেছেন আর জপের মালা নিয়ে বসেছেন—বীরবল রুক্মিণী তখনও অকাতরে ঘুমুচ্ছে। আমরা এখানেও একটি ঘরে আশ্রয় পেয়েছি যোগাযোগের একটি পাতার মত।

আজকেও এখানে থেকে যাব—কাল সব কিছু জানা হয় নি, বোঝা হয় নি। এত দূর এলাম, যদি আর একটি দিনের স্মৃতি সঞ্চয়ের ভাণ্ডারে না আসে তা হলে এত দূর এলাম কেন? তা ছাড়া থেকে যাওয়ার বিশেষ কারণও ছিল।

একজন বিখ্যাত পরিব্রাজকের লেখা বইয়ের ভিতর পড়েছিলাম যে তিনি এখানে এসে মন্দিরের পুরোহিতের সাহায্য নিয়ে যমুনোত্তরীর বিখ্যাত গ্লেশিয়ারের ওপর উঠে দূর থেকে চম্পা সরোবর দেখেছিলেন: তাঁর মতে ঐ সরোবরই যমুনার উৎপত্তিস্থান আর সে অঞ্চল অগম্য ও দেবতাদের আবাসভূমি। বান্দরপুচ্ছ পর্ব্বতের শেষাংশও তিনি

দেখেছিলেন আর পৃথিবীর বুকে নেমে আসা তিনটি ধারার তিনি বর্ণনা দিয়েছেন অপূর্ব্বভাবে সে বইয়ের ভেতর।

হনুমান চটিতে রাত্রে শুয়ে শুয়ে সে বইয়ের কথা আমার স্মরণে যে আসে নি তা নয়, এসেছিল, আর মনের অবচেতনায় সঙ্কল্প ব্যাপকতার রূপ যে পরিগ্রহ করে নি তাও নয়। ভেবেছিলাম, যমুনোত্তরীতে পৌঁছে একবার চেষ্টা করে দেখব।

চা খাওয়া শেষ করে ধরম সিংকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি পাহাড়ের আবিষ্কারে। 'উহংস' অর্থাৎ ডানার মত যে দুটি পাহাড় যমুনার ধার বরাবর নেমে চলে এসেছে, তারও ওদিকে মন্দিরের পশ্চিমাংশে পাহাড়-গুলোতে সন্ধান নিই যদি পাহাড়ের ওপরে উঠে সামনের গ্লেশিয়ারে রওনা দেওয়ার কোন সূত্র খুঁজে পাই কি না। কাঁটার ঝোপ—মহী-রুহের একছত্র রাজত্ব পাহাড়গুলোতে—কত যুগ থেকে যে এ রাজত্ব গড়ে উঠেছে কে জানে? তবুও উঠে যাই কতকটা—দৃষ্টিটাকে মেলে ধরি দূর দিকচক্রবালের অনন্ততায়—কিন্তু ঐ তিনটি ধারার অস্পষ্ট গতি-রেখাই চোখে পড়ে, অন্য কিছু নয়। বহু দূরে গ্লেশিয়ারের পরিক্রমণ—তারই বুক থেকে নেমে আসা ঐ যমুনার ক্ষীণ ধারা, সেই ধারাই ধরাতলে নেমে এসে হারিয়ে গেছে এটুকু বেশ বোঝা যায়। কিন্তু ঐ হিমবাহ-রাজ্যে যাওয়া দূরের কথা, স্বপ্ন দেখাও ত চলে না। মন্দিরের সামনেই যে যমুনা তার ভীম গর্জ্জনের প্রবাহ ঐ দুটি পাহাড়ের মধ্য দিয়ে প্রবহমাণ। পেছনেই ওই গ্লেশিয়ার, যা বহু বহু দূরে—মানুষের যাওয়া সেখানে সাধ্যাতীত। পাহাড়ের ওপর উঠে পরিষ্কার ধারণা হয়ে গেল মনুষ্যদেহী মানুষের ও গ্লেশিয়ারের সন্ধানে চম্পা সরোবরের আবিষ্কারের নেশায় যাওয়া চলে না—ওটা অসম্ভব বলেই মনে হ'ল আমার। শুধু শুভ্র তুষারের রাজ্য সে—মানুষের যাওয়া সেখানে

চলে না। তবে যমুনোত্তরীর এ তীর্থে সিদ্ধ যোগীদের নিঃশব্দ পদসঞ্চার আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই—তাঁদের ধ্যানস্থ মূর্ত্তি ওখানে থাকা অসম্ভব নয়। তবে নিঃসন্দেহে বলা যায়—সাধারণের পক্ষে ওস্থান অগম্য। যমুনোত্তরীতে দ্বিতীয় দিনটি কাটে আমার শুধু পাহাড়ের আবিষ্কারের নেশায় নয়, অন্যান্য কর্ম্মতৎপরতাও ছিল। সারাটা দুপুর আর বিকেল কেটেছে মন্দিরের কাছে, যমুনার তীর বরাবর আর সুদূরপ্রসারী হিমবাহের হাতছানিতে। যাত্রী যারা এসেছে বা এল তাদের সঙ্গে পরিচয়সূত্রে সঞ্চয় তুলে নিয়েছি প্রচুর। কত দেশের মানুষ—যমুনোত্তরীর গহ্বরে এসে একাকারের পর্য্যায়ে এসে সব মিশে গেছে যেন। সকলের লক্ষ্য এক, তাই ভূমিকা গেছে লুপ্ত হয়ে—এখানে একটিমাত্র উপন্যাস, সে উপন্যাস মানুষের জয়যাত্রার উপন্যাস। এখানে মানুষের সুর এক, ছন্দ এক, প্রকৃতি এক। অথচ নিম্নভূমিতে এই সোনার মনুষ্যগোষ্ঠীকে আর চেনা যায় না,—সকল কল্যাণ পুঁছে গেছে যেন—।

সেই বেনিয়া দম্পতি অবশেষে এসে গেছে, সেই বিপুলকায়া বোম্বাইবাসিনীকেও দেখলাম মুখারবিন্দের কাছে। কায়া বিদ্রোহী হয়েছিল, কিন্তু মন ছিল অটুট, তাই মাথার ঘাম পায়ে ফেলা সার্থক হয়েছে। মুখে-চোখে একটা দিগ্বিজয়ের ছাপ—চলাফেরায় বিজয়িনীর চমক। আলাপ হয়—নিমন্ত্রণ পাই বোম্বাই গিয়ে একবার পায়ের ধূলা দেওয়ার। বললাম, "যাব—।" মনে মনে ভাবি, এখানে যে পরিচয়ের হৃদ্যতা, তা বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে—দেখলে চিনতে পারা দুষ্কর হয় ত হবে বোম্বাইতে। দশ হাজার ফুটেরও ওপর যমুনোত্তরী, মানুষের মন উঁচু হওয়াটা এখানে স্বাভাবিক।

ঘুরি, ফিরি আর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়। কনকনে বাতাস, এ বাতাস ঐ গ্লেশিয়ারকে মুছে নেওয়া—তাই হাড়ের ভিতর গিয়ে ঢুকে আর বেরুতে চায় না। সাধু সন্ন্যাসীর খোঁজে নিরালা স্থানের খোঁজ নিই, দেখা পাই না কারুর।

সবই দেখি, সবই বুঝি কিন্তু খরসালীর সে স্মৃতি সবকিছুকে গ্রাস করে নেয় যেন, কেমন যেন বিষণ্ণ বোধ করি নিজেকে, কিছুই যেন ভাল লাগে না আমার, মহাশূন্যতায় সব কিছু ভরে ওঠে যেন।

এবার ফেরার পালা, তীর্থ পর্য্যটনের একটি ইতিহাস শেষ হয়ে গেল, আর একটি বাকী। তৃতীয় দিনে সকাল হতে না হতেই সুরু হ'ল গোছগাছ, মালপত্র বেঁধে নেওয়া। দুটি দিনের মাত্র স্মৃতি—এ স্মৃতি সঞ্চয় হয়ে থাক জীবনে, জপমালার ভিতর এ স্মৃতির ঐশ্বর্য্য নেমে আসুক। আসা— আসা—আসা—এসে গেলাম অবশেষে, চড়াই ভেঙে, উতরাই ভেঙে, বন্ধুর পথরেখায় জীবনের মায়া কাটিয়ে, স্বপ্নের যমুনোত্তরীতে এসে গেলাম।

॥ ছয় ॥

এবার ফেরার পালা, মাত্র দুটি দিন···জীবনে তাই সার্থক হ'য়ে জ্বলে থাক। একটি অধ্যায় শেষ হয়ে গেল, জীবনেরও একটি পূর্ণ অধ্যায়ের যেন শেষ হয়ে যাওয়া। কি পেলাম আর কি হারালাম, তার কড়াক্রান্তির হিসেব জমা করে তুলে রাখি জীবনে, ভবিষ্যতের ইতিহাসে এ হিসেব হয় ত বা মূলধন হয়েই দেখা দেবে।

আসার লগ্ন এসেছিল তাই এসেছিলাম, এ লগ্ন সৃষ্টির মালিক ত আমি নই, তাই গতিবেগটাকেই বুঝেছি, অন্য কিছু নয়। এ লগ্ন শেষ হয়ে গেল, তাই ফিরে যাওয়া। পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ, একটি খসে গেল জীবনের বৃন্ত থেকে, আর একটি পরিচ্ছেদের শেষ হবে ভাগীরথীর উৎস সন্ধানের কৃচ্ছ্রসাধনে।

তাই চলা সুরু হ'ল আবার। একটি স্বর্ণাঞ্চলের শেষে আর একটি স্বর্ণাঞ্চলের অদৃশ্য ইশারা, তারই জন্যে যাযাবর জীবনে পা দুটোকে নিবৃত্তি দেওয়ার উপায় নেই। জগদীশ্বর অনন্ত পথ এঁকে দিয়েছেন জীবনে, তাই পথেরই প্রান্তে নেমে আসি যমুনোত্তরীর স্মৃতির মায়া কাটিয়ে।

বীরবলদের পিছনে রেখে ধরম সিং আর আমি রওনা দিলাম। মন্দিরে ওরা শেষের পূজাটি দিয়ে যেতে চায়, তাই এই বিলম্ব। বললাম, হনুমানচটিতে দেখা হবে আবার। আমার পূজা আর দেওয়া হ'ল না, জীবনের পূজা ত দেওয়াই রইল।

প্রকৃতির গহ্বর থেকে হেঁচড়ে উঠে আসি উপরে, আধ মাইলের

সমতল ভূমির মায়া কাটিয়ে দেখা হয় সেই জীর্ণ মন্দিরটির সঙ্গে, যার ঐতিহাসিক তত্ত্ব সাধারণ যাত্রীদের কাছে অজানা ও অচেনা। যমুনোত্তরীর ঐ মন্দিরের সঙ্গে এ মন্দিরের কোন কিছুর মিল না থাকলেও প্রাচীনতায় কে বড় বোঝা গেল না, হয় ত এই মন্দিরই অগ্রজ। ত্রিশূল হাতে নেওয়া কালীমূর্ত্তিকে আবার দেখে নি প্রাণভরে, ভাবি মা যমুনার মোহিনীমূর্ত্তির রাজত্বে ঐ ঘনশ্যামার উদ্ভব কেন? প্রণাম জানাই, তার পর আবার এগিয়ে চলি।

যে ঐরাবত অজগর পাহাড় চড়াই হিসেবে অধ্যবসায়ের শেষ কণাটুকু শুষে নিয়েছে, নেমে আসার মুখে তার সান্ত্বনার আভাসমাত্র পাই না। উতরাই হয়েছে চড়াই আর চড়াই উতরাই; সেই দু'তিন ঘণ্টার ধ্বস্তাধ্বস্তি পাহাড়ের সঙ্গে, থেমে যাওয়া আর দম নেওয়া, তবে এবার একটু সহজ বলে মনে হয় যেহেতু কষ্টসাধনার উপর এক পসলা বর্ষণ ত আসার মুখেই হয়ে গেছে।

জানকীমাঈ চটিতে এসে যাই সকাল সকাল, চায়ের পাত্র টেনে নিই, এখানে একটু বিশ্রাম ও কিছু আহার্য্যবস্তু গ্রহণ করা এই যা। তার পর ধীরে ধীরে পুল পেরিয়ে যাই যমুনার, সেই যমুনা, স্মৃতির ভিতর যা ধারার মতই বয়ে চলেছে!

পাহাড়ের ঢালু অংশে মানুষের বহু আয়াসের ফলে গড়ে ওঠা শস্যশ্যামলা ধান্যক্ষেত্রটি পেরিয়ে যাই, এর পর খরসালী গ্রাম এসে যায়।

আস্তে আস্তে চলি, গতিবেগে মন্থরতা নেমে আসে, কি জানি কেন! সেই খরসালী—জীবনে যা অনন্ত প্রশ্ন হয়ে রয়ে গেল। এ গ্রামখানা জীবনের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে জড়িয়ে গেছে যেন! বাড়ী-ঘরদোর—অনামী সেই গ্রাম্যমন্দিরটি পেরিয়ে যাই, এসে পড়ি সেই পথটুকুতে,

যা উপলব্ধির বুকের উপর সব হারানোর বিষণ্ণতার চিতা জ্বালিয়ে দিয়েছে। সেই নিস্তব্ধ নিথর পথের মায়া, তরুবিথীকার ছায়ার পরিবেশ—এখানে থেমে যাই নিজের অগোচরে!

অবুঝ ধরম সিংকে কিছু না বললেও জীবনের উপর দিয়ে একটা যে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে আর সে ঝড়ের রুদ্রমূর্ত্তি যে এই খরসালীর গ্রামের পথপ্রান্তে প্রকাশ পেয়েছে সেটা সে তার ছোট্ট মন দিয়ে বুঝেছিল। চুপচাপ একটা পাথরের উপর যখন বসে আছি তখন সে এসে যায়—তারপর পিঠ থেকে বোঝা নামিয়ে সেও আমার সঙ্গে বসে পড়ে। তারপর সুরু করে সান্ত্বনা আর প্রবোধবাক্য—বন্ধুর মত, গুরুজনের মত, পরমাত্মীয়ের মত। বাহক হয়ে উঠে মন জানাজানির সেতু—উত্তরকাশীর বালক হয়ে উঠে আলোকবর্ত্তিকা। অথচ এ পথটুকুতে বিবর্ত্তনবাদের যে ইতিহাস তৈরি হয়ে গেল আমার জীবনে, তার একটা কণাও তার জানা নেই। খেয়ালখুসিমত সে সান্ত্বনা দেয়—আমিও তাই শুনে যাই।

আর কি মায়াবিনীকে দেখা যায়? সে ফিকে সবুজ শাড়ীপরা রহস্যময়ীর সন্ধান আর কি আমি পাই? যা হারাল—তা হারাল, মাথা খুঁড়ে মরে গেলেও আমি আর তা পাব না! ওসব জিনিস আসে একবারই…ছ'বার নয়! হাহাকারের শূন্যতাই জীবনে থেকে গেল…আমি যে পথের প্রান্তে ফুল দেখেছি, তাই এ অভিশাপের গ্লানি ও মরুভূমির দগ্ধতা।

সরু সীমন্তের উপর স্বর্ণময় টিক্‌লী…ওই স্মৃতির ভিতর রজনী-গন্ধার মত ফুটে থাক…। খরসালী থেকে ছ'মাইলের মাথায় হনুমানচটি এসে পৌঁছই দ্বিপ্রহরের আগে—আজকের মত এখানে রাত কাটানো, তারপর গাংনানীর পথে পাড়ি দেওয়া। সেই হনুমান-

চটি, চিন্তার স্তূপ যেখানে মনের ভিতর বাসা বেঁধেছিল, যার থেকে নিষ্কৃতি প্রত্যাবর্ত্তনের পথেও নেই। সন্ধ্যার ঝোঁকে যমুনার তীরে চলে যাই, বসে থাকি অনেকক্ষণ...যমুনোত্তরীর স্মৃতি তোলপাড় করতে থাকে মনের ভিতর। শীতের কাঁপুনি এখানেও—তাই বেশীক্ষণ বসা যায় না, উঠে পড়ি। বীরবলরা এসে গেছে...আমার ঘরেই তারা এসেছে, একসঙ্গে থাকার ব্যতিক্রম ঘটে নি, হনুমান-চটিতেও সেই উপরের ঘর...যাত্রার পথে যে ঘরটিতে কাটিয়ে গেছি একটি রাত্রি। অদ্ভুত এই যোগাযোগ...ধর্ম্মশালার আন্তর্জাতিক দাক্ষিণ্যের ভিতরেও আমি ঘরের দিকে বেশী না ছুটলেও ঘরই ছুটে এসেছে আমার দিকে বেশী করে। এর বিশ্লেষণ করেও সূত্র খুঁজে পাই নি। বীরবলদের এমন এক অদ্ভুত বিশ্বাস জন্মে গেছে যে আমি ধর্ম্মশালায় পৌঁছলেই ঘর পাব আর সে ঘর হবে উপরের ঘর, মজবুত ঘর, আভিজাত্যের পরিচয় আছে যাতে। উত্তরকাশী পর্য্যন্ত তাদের এ বিশ্বাসটি ভাঙে নি আর ভাঙে নি বলেই ওরা ঘর পাওয়া না পাওয়া নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় নি।

সকাল হতে না হতেই চলা সুরু হয়। উজলী পেরিয়ে গেল—অনামী, গোত্রহীন উজলী! উজলীর পর যমুনাচটি—এখানে এসে গেলাম ন'টার মধ্যেই। যাওয়ার মুখে যে চড়াইটা বুকে বেজেছিল বেশী করে, এবার সেটা উতরাইয়ের আকারে সুদে-আসলে আদায় করে নিয়েছে—তবে একবার অভিজ্ঞতার মধ্যে এসে গেলে সংশয় যায় কমে, ক্লান্তি আসে কম। কাজেই ও চড়াইটা আর বিরাট কিছু হয়ে আসে নি—তবে সেই জলকষ্ট, যেটি যমুনোত্তরীর পথের নিত্য সঙ্গী। ধরম সিং যমুনাচটির আগে কোথা থেকে জল নিয়ে এসে আমাকে খাওয়ায় বুঝতে পারি না। পাহাড়ী ছেলে—অদৃশ্য ঝর্ণাকেও শুঁকে বার করে যেন। যমুনাচটিতে স্নান সেরে নি—চা খাই আর সেই সঙ্গে

গতরাত্রের হনুমানচটি থেকে আনা কিছু খাবার। কতক্ষণ থাকব এখানে? মাত্র সকাল ত ন'টা—তাই পথের প্রান্তে আবার নেমে আসি।

যমুনাচটি থেকে খারারী—তারপর সেই গাংনানী। বেলা একটার মধ্যেই পৌঁছে যাই। আজকের মত রাত্রিবাস এখানে—তারপর কাল রওনা হতে হবে গঙ্গোত্তরীর দিকে।

একটি মহাতীর্থ পরিক্রমা শেষে আর একটি মহাতীর্থের সংযোগ-স্থলে এসে গেলাম! এই নব ইতিহাসের পাতায় পাতায় আমার মত মূল্যহীন মানুষের জন্য কি কাহিনী লিপিবদ্ধ হওয়ার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে জানি না…! যাই থাকুক, তাকে অঞ্জলি ভরে পূর্ণভাবে গ্রহণ করা চাই—সামান্য ভুলের জন্যে খরসালীর পথপ্রান্তে সেই অত্যাশ্চর্য্য সম্পদের অর্ঘ্য হারানোর বিষাদসিন্ধুর উৎপত্তি না হয়।

সোনার বদরিকানারায়ণের কথা মনে পড়ে যায় আমার। প্রত্যাবর্ত্তনের পথে নারায়ণকে শেষের প্রণাম জানিয়ে আসতে গিয়ে মন্দিরের উত্তর প্রান্ত সীমায় এক মহাপুরুষ অতিমানুষের সঙ্গে দেখা—যাঁর দেওয়া ইঙ্গিত—'গঙ্গোত্তরী জানেসে মিল জায়গা'। সেই দুর্লভ ইঙ্গিতটুকুর সন্ধানেই এ মহাতীর্থে আসা আমার। গাংনানীর পর থেকে জাহ্নবীর ধারে ধারে সেই চরম ইঙ্গিতের ইতিহাস সুরু……।

॥ সাত ॥

সিলকিয়ারার পাহাড় থেকে নেমে আসার পর গাংনানীর আগে ছোট্ট একটি ঝর্ণাধারার সন্ধান মেলে—তার ওপর একটি কাঠের সেতু আর ঐ সেতুটি পেরুলেই গাংনানী জনপদের এক্তিয়ার। এবার পথের স্মুরু ঐ সেতু পেরিয়ে নয়, তারই ধার বরাবর দুটি পথরেখার সন্ধিস্থলের পাশে। একটি পথ উল্টোমুখে চলে গেছে ধরাসুর দিকে, আর একটি পথ চলে গেছে গঙ্গোত্তরীর দিকে। ঐ পুলের কিছুটা দূরে সাধারণ যাত্রীদের জন্যে বিজ্ঞপ্তি 'গঙ্গোত্তরী কো সড়ক।'

এখান থেকেই প্রকৃত পক্ষে আর একটি মহাতীর্থের প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম পাতাটির আবিষ্কার...পুণ্যলোভাতুর যাত্রীদের এই বার্ত্তাফলকই নূতন জীবনের তথা পুন্যতম অভিজ্ঞতার আহ্বান জানিয়েছে।

ধরাসু থেকে যাত্রার প্রারম্ভে যাত্রীসংখ্যা ছিল দশ-বার জন, অদৃশ্য এক সংখ্যাতত্ত্বের মন্থনে সেই ন্যূনতম সংখ্যা যে কি করে বাইশে দাঁড়াল তা ভেবে পাই না। অচেনা মুখ দেখতে পাই—অচেনা দল চোখে পড়ে। এরা রাতারাতি যমুনোত্তরী তীর্থ শেষ করে কি করে যে গাংনানীর ধর্ম্মশালায় এসে গেছে তার হিসেব খুঁজে পাই না আমি—সব এসে গেছে এই যা! স্রোতের মুখে কুটোর মত সব এরা, ভাসতে ভাসতে চলে এসেছে, আর এই চলে আসাটাই সত্যি। জানি, অচেনা বলে যাদের মনে হ'ল, একাকারের ঘূর্ণিবায়ুতে সে সব যাবে উড়ে···আমরা সব মিশে যাব

একটি ধারায়···একটি প্রবাহিণীতে। এ পুণ্যরাজ্যে চেনা-অচেনার কুহেলিকা মাত্র একটি মুহূর্ত্তের—অপরিচিত বলে যাদের মনে হচ্ছে, পথ চলার গতিবেগে সে মনে হওয়া আর থাকবে না।

ঝর্ণার সেই ধারাকে বাঁ দিকে রেখে পথ চলেছে এঁকেবেঁকে, প্রায় এক মাইলের মাথায় সেই পথটি একটি চায়ের দোকানের সামনে এসে শেষ হয়ে গেল। বোঝা গেল চায়ের দোকানটির অস্তিত্ব এখানে সাঙ্ঘাতিক—সামনেই চড়াই—তারই আগাম বিজ্ঞপ্তি জানিয়েছে।

সত্যি তাই, সিঙ্গুটের বিখ্যাত চড়াইটা এর পর থেকেই সুরু। গাংনানীর ধর্ম্মশালায় যাত্রীদের মুখে মুখে যার কাহিনী আমার শোনা।

শোনা গেল, চড়াইটা একটানা ছ'মাইল—উতরাই তিন মাইল।

বেদের বাঁশী শুনে গোখরো সাপ বেরিয়ে এসে ফণা উঁচিয়ে দাঁড়ায়, গান শোনে। সেখানে বাঁশী, তাই তার বিষের হাত থেকে বেদের নিষ্কৃতি। কিন্তু এখানে বাঁশী কৈ? যে সর্পিল পথ কুণ্ডলী পাকিয়ে এই পাহাড়ী ময়াল সাপকে বেষ্টন করে আছে—তাকে থামাই কি করে? কাজেই সাপকেই গ্রাহ্য করে নিতে হয়, এগুতে হয় এক পা এক পা করে। সিঙ্গুটের চড়াইটা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে গরীয়ান্, এ তীর্থভূমির কোন চড়াইয়ের সঙ্গে তার মিল নেই। যমুনোত্তরীতে যাওয়া ও ফিরে আসার মধ্যে যতগুলো চড়াই পাওয়া গেছে—এ চড়াইটা তাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে নিজের মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে নি। চড়াই কখন পাহাড়কে বেষ্টন করে অথবা এ পাহাড় শেষ হয়ে অন্য পাহাড়ে—সিঙ্গুটের এ চড়াই-পথ একেবারে ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের শীর্ষ দিয়ে তার ক্রমোচ্চ গতিকে শেষ করেছে, তার পর তার উতরাই অভিযান। এ রকমটি

অন্য কোথাও নেই। কিছু দূর ওঠার পর পাইনের প্রাচুর্য্যের শেষ—এ অঞ্চলে দেখা যাচ্ছে নিম্নভূমির মায়াই হ'ল পাইনের মূলধন, উচ্চতার মাপকাঠিতে সে মায়াও আর নেই, সে মূলধনও হারিয়ে গেছে। চড়াই ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে পাইনের সে নয়নাভিরাম দৃশ্যের বদলে দেখা দিল অনামী মহীরুহের দ্বীপ ও উপমহাদেশ—লতাগুল্মের ঘেরাটোপের ভিতর ছায়াচ্ছন্ন বনানীর আত্মপ্রকাশের কুহেলিকা। বিজন পথ ও নিঃশব্দ আবেষ্টনীর সঙ্গে শারীরিক ক্লান্তির একটা দ্বন্দ্ব বেধে যায়। কত রকমের গাছ যুগযুগান্তের সাক্ষীর মত পাষাণ মৃত্তিকার বুক চিরে জেগে আছে—এ সব গাছের পরিচয় নেই, এরা গোত্রহীন। ঐরাবত সিঙ্গুটের পাহাড় যেন যাত্রার স্বুরুতেই এক নির্ব্বিশেষ পরীক্ষার ভূমিকা হয়ে আছে।

সিলকিয়ারার পাহাড়, যমুনা চটির পর চড়াইয়ের দাপাদাপি, তারপর ভৈরবঘাটির সেই অমানুষিক পরিশ্রম—সবই ত পেরিয়ে এলাম, কাজেই বুকের রক্ত জল করে সিঙ্গুটকেও হারিয়ে দি, একেবারে পাহাড়ের চূড়োতে গিয়ে উঠি—লাটিমের পাকের মত পাকদণ্ডী পথ পাহাড়ের মাথায় গিয়ে শেষ হয়েছে। ক্রমোচ্চ পথটি শেষ করে যখন পাহাড়ের ওপর উঠলাম তখন বেশ বোঝা গেল আমি নিঃশেষ হয়ে গেছি। পাহাড়ের শীর্ষদেশ ঠিক সেলাইয়ের ছুঁচের আকৃতি নয়, এখানে মৃত্তিকার সামান্য দাক্ষিণ্য আছে—খানিকটা সমতলভূমি যাত্রীসমারোহকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে যেন। এখানেও একটি চায়ের দোকান, নিঃশেষিত প্রাণশক্তিকে ফিরিয়ে আনার জন্যেই যেন এর সৃষ্টি! একেবারে পাহাড়ের চূড়োর ওপর এরকম চায়ের বিজ্ঞপ্তি পরিব্রাজক জীবনে অন্য কোথাও খুঁজে পাই নি। দোকানটি দেখে মনে হ'ল, যাক্, সভ্যতা এখনও বেঁচে আছে···আমরা এখনও

হারিয়ে যাই নি। গুটি গুটি এখানে হাজির হই এক ভাঁড় চায়ের আশায়।

সিঙ্গুটের এই পাহাড়টির ওপর উঠবার পর চারদিকের দৃশ্যাবলী যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করে তার তুলনা যমুনোত্তরী ও গঙ্গোত্তরীর ইতিহাসে অন্য কোথাও নেই। এ রকমটি যে দেখব আশা ছিল না বা বুঝিও নি। সাড়ে আট হাজার ফুটের এই পাহাড়ের আকাশমুখী অভিযান—অসমাপ্ত উপন্যাসের মতই এর স্বরূপ। ধু ধু করছে চারদিক—আবহাওয়া যেন দৈব আবহাওয়া। দৃষ্টির বাধা নেই এখানে—গোটা পৃথিবীটাই যেন আকস্মিকভাবে উন্মুক্ত হয়ে গেছে চোখের সামনে। শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে জীবন কেটে যায় যেন। মনে হয় এই মৃত্তিকার এই স্বল্প পরিসরের দাক্ষিণ্যের ভেতর ছোট্ট একটি কুটীর বাঁধি—আর সমস্ত দিনরাত কেবল এই অসীমতার ও শূন্যতার মায়ার ভেতর দৃষ্টিটাকে মেলে রাখি...আর কিছুর প্রয়োজন নেই এখানে, শুধু চেয়ে থাকতে পারলেই ব্যক্তিবিশেষের জীবন ধন্য হয়ে যাবে।

সমগ্র পূর্ব্ব ও পশ্চিমকে কেন্দ্র করে দিকচক্রবালের মেখলায় তুষারাচ্ছন্ন গিরীশ্রেণীর অন্তহীন শোভাযাত্রা, মনে হ'য় ভস্মাচ্ছাদিত মহাদেবের গলায় একটি হীরের মালা জড়ান রয়েছে। ফুলের স্তবকের মত একটির পর একটি গিরীশৃঙ্গের ফুটে থাকা—দৃষ্টির সামনে এই মহিমার রূপবর্ণনা করি কি করে? এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পূর্ব্ব প্রান্তে যে গিরীশৃঙ্গ চোখে পড়ে ওটি কেদারনাথের, যা গত বছরে দেখে এসেছি। তারই পাশে যমুনোত্তরী হিমবাহের শুভ্র গিরিশৃঙ্গ, যা দেখে এলাম, যা স্মৃতিতে এখনও জাগরূক হয়ে আছে। তার পাশে একটী সমান্তরাল রেখায় গঙ্গোত্তরী

গ্লেশিয়ারের অস্ফুট এক হাতছানি, যার আকর্ষণে আজকের এই মহাযাত্রা। দূরে সরু ক্ষীয়মান একটা ধারা দেখতে পাচ্ছি, ইনিই গাংনানীর মা যমুনা, যাঁর দর্শনে ধন্য হয়ে এলাম। আমার ডান দিকে বিন্দুর মত ছোট ছোট ঘড় বাড়ী, ওই হ'ল স্বপ্নের উত্তর কাশী, যেখানে পৌঁছতে আর দেরী নেই—এই বিন্দুর সারির পাশে আর একটা প্রবাহিণীর সন্ধান মেলে; ধরম সিং পরিচয় করিয়ে দেয়, ওই মা ভাগিরথী, যাঁর পাশে পাশে আমাদের যাত্রার সুরু। সারা দিগন্ত জুড়ে যে গিরিশ্রেণীর যুগব্যাপী পরিক্রমা—সামনের ওই গঙ্গোত্তরী হিমবাহের পেছনেই কৈলাসশৃঙ্গ আর মান্ধাতার ইঙ্গিত। যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু পাহাড় আর পাহাড় আর. তার জঠরের ভেতর মর্ত্ত্যের মানুষের ছোট ছোট সংসারের জনপদের আকুলি! এধার থেকে ওধার—পরমাশক্তির এক অত্যাশ্চর্য সৃষ্টিতত্ত্বের প্রকাশের ভেতর দিয়ে মানুষের অন্তরে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের স্তূপ নেমে আসে। এ দৃশ্য সার্থক দৃশ্য—এ দৃশ্যের তুলনা নেই!

সিঙ্গুটের পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বড় বেশী করে চেনা যায় কেদারনাথকে আর যমুনোত্তরীকে, আর এ দেখা—অনুভূতির এক নবতম রূপের প্রকাশ মাত্র। গত বছরের দেখা কেদারের সে মহিমামণ্ডিত শাশ্বত অবিনাশী শৈলরাজি যে চোখের সামনে আবার ফুটে উঠবে তা জানা ছিল না, তাই দেখার ভিতর দিয়ে আনন্দের আর এক উচ্ছ্বাস সৃষ্টি হ'ল এখানে। যমুনোত্তরীকে দেখা এই ত ক'দিনের—আবার তারই রূপ দেখলাম আর এক সৃষ্টির অধ্যায়ে, এখানে তার একক রূপটি নেই—বহুর ভেতরেই সে হিমবাহের নবজন্মের রূপ! গঙ্গোত্তরীর হিমবাহকে এখনও দেখা হয় নি, তাই এ দেখাও চরম দেখা। কৈলাসকে এখান থেকে দেখা

না গেলেও বুঝা যায় যে, এই শোভাযাত্রার পেছনে আর একটা সুপ্রাচীন তীর্থভূমি অদৃশ্য হয়ে জেগে আছে। এখানে এসে ক্লান্তি গেল দূর হয়ে—শ্রান্তি হ'ল নিঃশেষ। আমরা নীচেকার মানুষ, তাই ছোট প্রবৃত্তির ছোট হাতার পরিবেশনে সন্তুষ্ট থেকে যাই...উঁচুতে আমরা উঠি না, তাই আমাদের আধ্যাত্মিক সঞ্চয়ে এত ক্ষয় ও ক্ষতি। এখানে তাই উঠে আসার পর ব্যক্তিবিশেষের তলাকার ফেলে আসা মাটির কথা মনে থাকে না, সাময়িক হলেও এ দৈব ভাবের স্পর্শটি বড় মধুর। দার্শনিক হয়ে ওঠে মন—গণ্ডী যায় লুপ্ত হ'য়ে। পাহাড় এখানে শুধু পাহাড় নয়—মানুষী প্রবৃত্তির যা কিছু মহৎ, যা কিছু মহান্ তাই যেন ঊর্দ্ধমুখে উঠিয়ে নিয়ে গেছে...পাহাড়ের বিরাটত্বের তাই সহজ সম্বন্ধ আছে এখানে। ইটকাঠ পাথরের মধ্যে দৃষ্টির যে বিরোধ, তার বিরোধ আত্মারও সঙ্গে, জীবনের বৃহত্তর কল্যাণের সঙ্গেও —কিন্তু এখানে যে অনন্ত প্রসারিত দৃষ্টির সুযোগ ভগবান করে রেখেছেন, তার সঙ্গে মানুষের নারায়ণে রূপান্তরিত হওয়ারও সুযোগ আছে। পাহাড়ের গুহায়, পর্ব্বতের ঊর্দ্ধদেশে তাই তাপসের বাঘছাল পাতা...সাধকের হোমাগ্নির আগুন তাই সেখানে জ্বলে।

আমার পাশ দিয়েই বীরবলরা নেমে উতরাইয়ের পথ ধরলে, অপেক্ষা তারা করল না, সিঙ্গুটের ধর্ম্মশালায় যদি না উঠে সোজা নাকুরীতে গিয়ে উঠি সেই ভয়ে আমাকে তারা অবতরণকেই মেনে নেয়। ধরম সিং আর আমি এখানে অনেকক্ষণ থাকি—প্রায় একঘণ্টা। এ অল্প পরিসর স্থানটুকু আমার কাছে কাব্য হয়ে ওঠে, সম্পদ হয়ে ওঠে ...দেখে দেখে আর আশ মেটে না। কিন্তু দীর্ঘনিশ্বাস নেমে আসে এই ভেবে যে এই কাব্য প্রাত্যহিক জীবনের কাব্য নয়—এ কাব্যের আয়ু মাত্র এক ঘণ্টা।

এবার নামা। যেমন ওঠার ব্যাপারটি, তেমনি অবতরণেরও, একেবারে খাড়াই পথ নেমে গেছে টানা তিন মাইল। উঁকি মেরে তাকিয়ে দেখলাম বহুদূরে সমান্তরাল রেখায় পিঁপড়ের সারির মত মানুষের যাতায়াত—উতরাইয়ের ইতরবিশেষের ভেতর যেটি সম্ভব নয়। এ পাথর আর সে পাথর—এ গাছের কাণ্ড আর ও গাছের শাখা-প্রশাখার প্রান্তভাগ, এই ধরে ধরে নামতে নামতে তিন মাইলের এই পরীক্ষাটুকুও পার হওয়া গেল। পাহাড়ের তলাতেই সিঙ্গুট—একটি ধর্ম্মশালা আর তৎসংলগ্ন একটি মাত্র দোকান। ব্যস! এই নাকি সিঙ্গুট যার জন্যে আমরা ন'মাইলের এই ভীষণ ব্যাপারটি শেষ করে এলাম। আজকে এইখানেই আমাদের রাত্রিবাস।

বেলা তখন একটা—শুয়ে আছি, ঘরে মাতাজী আর রুক্মিণী, বীরবল আর ধরম সিং নেই, ওরা গেছে চাল-ডালের জোগাড় করতে। হঠাৎ একটা গুঞ্জরণ উঠল তলাকার দোকান থেকে। ব্যাপার কি? উঠে এসে বারান্দা থেকে দেখলাম বীরবল ভীষণ হাত-পা ছুঁড়ে মিলিটারি কায়দায় দোকানীকে কি সব বোঝাচ্ছে, আশেপাশে দশ-বার জন যাত্রী, তারাও বীরবলের দলে বলে মনে হ'ল। ভাল করে কান পেতে বীরবলের হাত-পা ছোঁড়ার অর্থ বোঝা গেল। আটার সের চৌদ্দ আনা, বাইশ জনের যাত্রীর দল দেখেই দোকানী টাকায় উঠে গেছে—তাই বীরবলের এই প্রতিবাদের ঝড় তোলা। দশ-বার মিনিট এই যুদ্ধ, তার পর শান্তি, ঐ চৌদ্দ আনা সেরদরের আটাই বীরবল আর ধরম সিং আদায় করে নিয়ে এল। ও যে মিলিটারিতে এক দিন ছিল তারই প্রমাণ পাওয়া গেল এখানে।

খাওয়া-দাওয়া সারতেই পাঁচটা বেজে গেল, তার পর এ অঞ্চলে যে রকম হয়, দেখতে দেখতে অন্ধকার নেমে এল। রাত আটটা পর্য্যন্ত

লোকজনের কথাবার্ত্তার আওয়াজ যা কানে আসে, তারপরেই নিথর হয়ে যায় ধর্ম্মশালা, একটানা নিস্তব্ধতার রাজত্ব হয়ে ওঠে। কান পেতে শুধু ঝিঁঝিঁপোকার শব্দ শুনি আমি...।

এবার উত্তরকাশীর পথে। সকাল হয়ে যায়, চলাও সুরু হয়। আজকেও সেই ন'মাইলের ব্যাপার।

শোনা গেল এ ন'মাইলের মধ্যে সিঙ্গুট পাহাড়ের মত একটা প্রতিবন্ধকের পাঁচিল তোলা নেই—এ পথ সরল ও সোজা পথ। ধর্ম্মশালার তলায় নেমে আসি, চা খাই তার পর বার্ম্মিজ ব্যাগটা কাঁধের ওপর তুলে নি...নেমে আসি পথের প্রান্তে। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই মনের ভেতর আনন্দের বন্যা নেমেছে আজ...সোনার উত্তরকাশীতে আজ পৌঁছব। একটু দেরী করেই রওনা দি'...ভিড় যে আমার সইবে না!

যে উতরাইটা নেমে এসে সিঙ্গুটে শেষ হয়েছে তারই জের চলে গেছে এক মাইল পর্য্যন্ত। দু' মাইল একটু চড়াইয়ের ভাব—তার পরেই নাকুরী।

ওদিকে ভাগীরথীলাঞ্ছিতা নাকুরী, এদিকে যমুনালাঞ্ছিতা গাংনানী। ফিকে সবুজ সাড়ীর বাহার আর নেই—মার এখানে তপস্বিনীর মূর্ত্তি—সারা অঙ্গে তাঁর গৈরিক উত্তরীয়। রঙের এই পরিবর্ত্তনটি আনল কে? গাংনানীতে এসে যমুনাদর্শনে যে আনন্দের মূর্চ্ছনা—এখানেও সেই আনন্দের আর এক অধ্যায়। সেখানে এক ভাব, এখানে আর এক ভাব। যে বৈরাগিনী গঙ্গাকে এখানে প্রথম দেখা, এরই রূপের মহিমা জপতে জপতে যেতে হবে গঙ্গোত্তরী আর তারও ওদিকে গোমুখ।

জাহ্নবীর রূপ এখানে মাতৃরূপিণী, তাঁর নিঃশব্দ আশীর্ব্বাদই আমাদের সঞ্চয়, আমাদের সবকিছু। এখানে এসে প্রবাহিণীকে দেখে মনে হ'ল কতদিন আমাদের ছাড়াছাড়ি, কতদিনের আমাদের বিচ্ছেদ।

দেখা হ'ল আমাদের নূতন এক আবেশের ভেতর···অনুভূতির ভেতর। এ মিলন শুধু চোখের মিলন নয়, এ মিলন যেন জীবনের সঙ্গে জীবনের। এ যেন দীর্ঘ প্রবাস জীবনের অসহনীয় বিচ্ছেদের পর বাড়ী ফিরে এসে মার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে অমৃতকুম্ভের সন্ধান পাওয়া!

ভাগীরথী এলেন যাত্রাপথের ডানদিকে—তিন মাইলের নাকুরী পেরিয়ে গেলাম, উত্তরকাশীর সোজা সড়কটা চোখে পড়ল—ছ' মাইলের একটানা পথ। গাংনানীর পর যমুনা যেমন অদৃশ্যা মায়াবিনী, এ পথে মা গঙ্গার ধারায় সে সুদূরের হাতছানি নেই ঃ সর্ব্বসময়ের জন্যেই তিনি সহজলভ্যা।

উত্তরকাশীর পথে এ ছ' মাইলের হিসেবে কোন লাভ-লোকসানের ব্যাপার নেই, এ পথটুকুতে পাহাড়ের কোলে কোলে ক্ষেতখামারের শ্যামলিমা, সবুজ ও হলদে রঙের মায়াজাল। মানুষের এ অঞ্চলে বাঁচবার চেষ্টা, ফসল বুনে গৃহস্থালীকে সার্থক করবার শুভবুদ্ধি। এই শুভবুদ্ধির সঙ্গে পাহাড়গুলোরও সাদৃশ্য আছে—তারা তাদের বৃহৎ অবয়ব দিয়ে বাধার আগড় টানে নি। পাঁচ মাইল পেরিয়ে যাওয়ার পর দূর থেকে দেখা গেল মুনিঋষিদের ছোট ছোট কুটিরশ্রেণী, বৈরাগ্যের সাধনা চলছে তাঁদের। এ সব পেরিয়ে যাই, শুধু চোখের দেখাই সার্থক হয়ে থাকে! শেষের এক মাইলের পরিচয়ে বাংলাদেশের আবহাওয়া—দেখা গেল কলাগাছের ঝাড় ও পেয়ারা গাছের সারি। মনে হ'ল ফেলে আসা দেশের একটা ছেঁড়া পাতা এখানে হাওয়ার উড়ে এসেছে যেন।

এই এক মাইলের পথটুকুও শেষ হয়ে যায়, এসে যাই উত্তর-কাশীতে···বিশ্বনাথের রাজত্বে, পরমপুরুষের আশীর্ব্বাদের ভেতর।

পথটা একটা হ্যাঁচকা টান মেরে ওপরে উঠে গেছে, সামনেই একটা

ল্যাম্পপোষ্ট পথের ওপর অর্ব্বাচীনের মত দাঁড়িয়ে—ধরম সিং বুঝিয়ে দেয় এই পোষ্টটাই উত্তরকাশীর সীমানাকে নির্দ্দেশ করেছে, এর পর থেকেই শহরের স্থুরু।

সিঙ্গুট ছাড়ানোর পর ধরম সিঙের ভাবান্তর স্থুরু। ও এখন অন্য মানুষ, অনামী মানুষের পংক্তিতে ও আর পড়ে না। তার সাধের উত্তরকাশী এসে যাচ্ছে, যার মৃত্তিকার আশীর্ব্বাদেই ওর আঠারোটা বৎসর গড়ে উঠেছে। এখানেই ওর জন্ম, তার বড় হয়ে ওঠা। হৃষিকেশ থেকে পেয়েছি আমি ওকে, যমুনোত্তরী শেষ হয়ে গেছে... পথচলার ইতিহাসের পাতায় ধরম সিঙের অবদান বড় কম নয়, বাহক হলেও তাকে পেয়েছি সখ্যের ও অন্তরঙ্গতার ভেতর। অনেক আগেই সে আমার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়েছে যে, উত্তরকাশীতে পৌঁছে তার বাড়ীতে আমি যাব আর একটা রাত আমার সেখানে কাটবে।

সেই স্বপ্নের উত্তরকাশী তার এসে গেল। ধরম সিং এখানে ঢুকল বাহকের মত নয়, বীরের মত, আলেকজাণ্ডারের থেকে কোন অংশে সে কম নয় আজ। মুখেচোখে খুশী তার উপচে পড়ছে—একগাল হাসি নিয়েই ওর এখানে প্রবেশ। যাকে ফেলে এসেছি পেছনে, সেই আজ আমার আগে আগে উত্তরকাশীতে ঢোকে, শিশুর পায়ের নাচন ওর পা ছুটোয়। যে ছু'একটা দিন এখানে আমার থাকার কথা, সবই যেন ওর —আমার কিছুই করার নেই এখানে। সিলকিয়ারা, গাংনানীর ধরম সিং ও নয়, পরিচয় বদলে গেছে ওর—আর একান্তভাবেই ধরম সিং উত্তরকাশীর।

এখানে ছুটি ধর্ম্মশালা। কালীকমলীবাবার ত আছেই, তা ছাড়া বিড়লার তৈরী একটি প্রাসাদোপম ধর্ম্মশালাও এখানে তৈরী হয়েছে। ধরম সিং জিজ্ঞাসা করে কোনটা আমার পছন্দ। কোটিপতি বিড়লা

আমার সহ্য হয় না—যে কোটিপতি দানে নিঃস্ব হতে পেরেছে তাঁকেই বেছে নি। বেলা দশটার ভেতরেই ধর্ম্মশালায় পৌঁছে যাই। ইট-কাঠ-পাথরের তিনমহলা বাড়ী, কমসে কম একশটা ঘর—ধরম সিং জানায় উত্তরাখণ্ডের পথে এত বড় যাত্রীনিবাস আর কোথাও নেই।

ধর্ম্মশালার চৌকীদার ত ধরম সিঙের দেশোয়ালী—পরিচয়ের সখ্যতা হু'জনের, তাই ভাল ঘর পেতে বেগ পেতে হয় না। দোতলার ওপর একটা চমৎকার ঘর জুটে যায়, যার হু'দিকেই টানা বারান্দা চলে গেছে। ভাবলাম, যাক বাঁচা গেল, হু' একদিন আরাম করে কাটানো যাবে। সামনেই গঙ্গার প্রবাহিণী—বড় সুন্দর দৃশ্যটি। গোটা পরিবেশটুকুকে মনে-প্রাণে বরণ করে নি। বীরবলদের খোঁজ পাই না। বৃহৎ অট্টালিকার গর্ভে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে ওরা। ভাবি, পরে খুঁজে নেওয়া যাবে। উপস্থিত একটা ঘরেই আমার একাকিত্বের আধিপত্য।

এই ত মাত্র দশটা, একটু ঘুরে আসা যাক। এই একটু ঘুরে আসার তাৎপর্য্যটা ধরম সিং বুঝত। বিনা বাক্যব্যয়ে সে সম্মতি জানিয়ে তৈরী হ'য়ে নেয়।

ধর্ম্মশালার কিছু দূরেই একটা চায়ের দোকান। বৃদ্ধ দোকানী, দেখে বড় ভাল লেগে গেল। এখানে চা খাই আর তার দীর্ঘ দিনের অবস্থানের সুযোগ নিয়ে কথাবার্ত্তার ভেতর দিয়ে এখানকার সাধুসন্তদের খবরগুলো জেনে নি। ধরম সিঙের এ সব জানা, তাই হু'জনের চোখের ভেতর দিয়ে অব্যক্ত ইঙ্গিতের একটা বুঝা-পড়া হয়। বৃদ্ধের মতে—গঙ্গার ধারে উত্তরকাশীর একটু দূরে পশ্চিমাংশে একজন মহা-সাধক থাকেন, নাম বিষ্ণুদত্ত। তাঁর দর্শনই সেরা দর্শন, তাঁর পাওয়া আশীর্ব্বাদই ব্যক্তিবিশেষের জীবনে চরম···অন্য কোথাও ঘুরে না বেড়িয়ে

তাঁর কাছেই যাওয়া দরকার, সুকৃতির অঞ্জলিতে অশেষ সম্পদ এসে যেতে পারে।

বৃদ্ধের কথা মেনে নি। ধরম সিংকে বলি—"চল, বহোত দের হুয়ায়, থোড়া উধারসে, ঘুমকে চলে আয়েঙ্গে।" সঙ্গে দোকানীর কথামত একটা পাত্রে কিছু দুধ আর চিনি নি।'

যে পথকে উত্তরকাশীতে ঢোকবার আগে ফেলে এসেছি, ওই পথটাই উত্তরদিকে সীমন্তের মত গঙ্গার ধারে ধারে চলে গেছে। জনবহুল উত্তরকাশীর আওতার বাইরে এ পথের নির্দ্দেশ। তাই দু'একজনকে না জিজ্ঞাসা করে নিলে এ পথের ঠিক মত হদিস মিলবে না পথটি অনুসরণ করে এসে দেখা গেল তা দুটি কুটীরের সামনে এসে শেষ হয়ে গেছে। বেশ বোঝা যায় এর পর পথের সঠিক পরিচয় আর নেই।

দুটি কুটীর...নগ্ন ও অনাদৃত। একটির সামনে বাঁশের আনলার ওপর গৈরিক রঙের একটা ল্যাঙট ঝুলছে, আর চারিদিক খোলা হাঁ হাঁ করছে। জনমানবহীন...শুধু মানুষের থাকার ঐ একটিমাত্র পরিচয়, গৈরিক ল্যাঙট। বুঝলাম, আর কোন ভুল নেই, এখানেই বিষ্ণুদত্ত থাকেন। সব শেষ হয়ে গেছে যাঁর, ত্যাগের পূর্ণকলসে যাঁর আত্মার জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ, দুনিয়ায় যাঁর কেবলমাত্র সম্বল ঐ ল্যাঙট, আবার তারও রং গেরুয়া। সব মিলে যায়, সিদ্ধান্তে ভুল হয় না। নির্জ্জন পরিবেশ, শান্ত সমাহিত আবহাওয়া, কুটীর দুটির সামনে গঙ্গা···উঁচু পাড়, ধারাকে এখান থেকে দেখা যায় না, কিন্তু শব্দটুকু শোনা যায়। এখানেই অপেক্ষায় বসা যাক, হয় ত কোথাও গেছেন, আসবেন এখুনি।

শূন্য কুটীর দুটির সামনে বসে বসে অনেক কিছুই ভাবছিলাম, এমন সময়ে আজানুলম্বিত গৈরিকবসন-পরিহিত এক মূর্ত্তির আবির্ভাব। আমাদের প্রত্যাশা করেন নি, তাই তাঁর গলার স্বরে বিস্ময়ের ভাবটা

ফুটে ওঠে। জিজ্ঞাসা করেন—কোথা থেকে আসছি আমরা, কি চাই। উত্তর দিই সাধ্যমত। উত্তরে নিজের পরিচয় দেন। বলেন, কুটীর দুটির মধ্যে একটি তাঁর, বিষ্ণুদত্ত তাঁরই গুরু। দর্শনের ঔৎসুক্য প্রকাশ করাতে বলেন—"উন্‌কা সাথ দর্শন মিলনা বড়া মুসীবত হ্যায়, কেঁও কি উয়ে গঙ্গাজীকা উপর পুজামে ব্যস্ত হ্যায়। দোপহর কে দো বজে কে আগে তো অধিকতর গঙ্গাজী সে নহী উঠতে।"

কি রকম একটা অদ্ভুত জেদ চেপে যায় আমার। না খাওয়া, না দাওয়া...বিকেলের দিকে এলেও ত চলে, তবু যখন এসেছি তখন দর্শন আমার চাই। বলি—"তিনি না আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করব, যখন এসেছি তখন দেখে যাব—।" তিনি আবার ঐ কথারই জের টানেন— "দূর হী সে পরণাম কিজীয়ে গা। উসী সে ফলপ্রাপ্তি হোগা।"

আমি যখন ওঁর সঙ্গে কথাবর্ত্তায় ব্যস্ত, তখন দেখি সামনের ঐ উঁচু পাড়টার ধার ঘেঁষে সম্পূর্ণ একটি উলঙ্গ মূর্ত্তি আস্তে আস্তে উঠে আসছেন এদিকে। আসছিলেন নিজের ভাবে বিভোর হ'য়ে, হঠাৎ আমাকে দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন প্রস্তরমূর্ত্তির মত, তারপর খানিকক্ষণ একদৃষ্টে আমাকে দেখে নিলেন ঘাড় ঘুরিয়ে, আর দেখার পর বিনাবাক্যব্যয়ে আবার গঙ্গার গর্ভে নেমে গেলেন। বুঝলাম ইনিই বিষ্ণুদত্ত—উত্তর-কাশীর সাধনমার্গের মধ্যমণি। উলঙ্গ মূর্ত্তি, বস্ত্রের একটি কুচিও শরীরে কোথাও নাই, অনাবৃত মাথাটির ওপর সাদা সাদা চুলের রেখা···জটাবিহীন। মূর্ত্তিটীকে দেখে মনে হ'ল, আমি যা চাইছিলাম তার ষোল আনার ওপর আঠার আনা সামঞ্জস্য আছে এঁর ভেতর। ওঁর প্রস্থানপর্ব্বটির ভেতর কিসের একটা ইঙ্গিত ছিল। মনে হ'ল এখানে অপেক্ষা না করে ওদিকটায় যাওয়া যাক, তিনি এখানে আসবেন না এখন। দুধের পাত্রটি শিষ্যটির হাতে সমর্পণ করে গঙ্গার পাড়ের ওপর

এসে যাই, দেখি আত্মসমাহিত অবস্থায় উলঙ্গ বিষ্ণুদত্ত অৰ্দ্ধনিমজ্জিত অবস্থায় সূর্য্যের দিকে চেয়ে আছেন, হাত দুটি প্রণামের ভঙ্গীতে বুকের ওপর জড়ো করা। একটি নগ্ন শিশু যেন—জাহ্নবীর বুকের ওপর একটা গোটা ঐতিহ্যের মত দাঁড়িয়ে আছেন। স্তব করছেন সূর্য্যের···পৃথিবী গেছে লুপ্ত হয়ে। আমাদের দিকে ওঁর শরীরের পশ্চাদ্ভাগ...একটা পাথরের ওপর ঝপ করে বসে পড়ি আমি—দূর থেকেই অতিমানুষটির কার্য্যকলাপ দেখে যাই, তাতেই জীবন ধন্য হওয়ার সম্ভাবনা।

স্তব শেষ হয়, দেখি—সামনের গঙ্গার তীরভূমির ওপর ছড়ানো কয়েকটি বিশেষ পাথরের ওপর অঞ্জলি ভরে জল ছিটোতে সুরু করেন। বিষ্ণুদত্ত কয়েকটি বিশেষ কালো রঙের পাথর জল ছিটিয়ে পরিষ্কার করে নিচ্ছেন, সে পাথরগুলোও বিষ্ণুদত্তের হাতে স্নানের পর্ব্বে হয়ত গরীয়ান। এ পর্ব্বটির মধ্যেও ওঁর যেন অদ্ভুতভাবে বিভোর হয়ে যাওয়া। সূর্য্যের স্তব আবার ঐ পাথরগুলিরও পর জল সিঞ্চন, এই চলতে থাকে সমানে—এমনি করেই ব্যয় হয় সময়ের এক বৃহৎ ভগ্নাংশ।

আমি শুধু নির্নিমেষ হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখি একটি শিশুর খেলা। একদল পাহাড়ী মেয়েছেলে কিছু দূরে স্নান করতে নামে...বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই সে দিকে; কে এল আর কে গেল তাতে তাঁর কি? আমরাও যে পেছনে এসে বসে আছি সে খেয়ালও তাঁর নেই।

পেছন ফিরে তাকাই, দেখি ওঁর শিষ্যটি আমাদের অনুসরণ করে কখন যে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন বুঝতে পারি নি। বলি—"ঐভাবে পাথরগুলোকে স্নান করানোর অর্থ কি?" বলেন—"জব তক্ উয়ে স্নান ঔর সূরজদেবকে পূজা মেঁ লগে রহতে হৈঁ, তবতক দেবতাওঁ কে আবির্ভাব উন্হী পত্থরো পর হোতা হৈঁ। হামলোগোঁ কো তো নহী দীখতা, পরন্ত বেঁ তো হৈঁ সিদ্ধ যোগী—যোগকে পরভাওয়সে উন্হেঁ সব

দিখাই দেতা হৈ। উন পত্থরোকী কিমৎ উনকে লিয়ে তো উনকে প্রাণ সে ভী অধিক হৈ। ইসী লিয়ে ওয়হ ভগওয়ানজী কী বেদী ঔর ইন্ সব পত্থরো কে য়ে স্নান করাতে হৈ। কোই কিসী প্রকার কী অপবিত্রতা উন পর ফৈলাতা হৈ তো জরুর উসকী কোই বড়ী—দুর্গতি হোতী হৈ।" অদ্ভুত তথ্য। কিন্তু বিশ্বাস করি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে। চোখের সামনে যে অতিমানুষকে বিশ্বসংসার-ভোলা অবস্থায় দেখছি, তাঁর উপাসনার মহেন্দ্রক্ষণে সাক্ষাৎ শঙ্কর এসে যে পাথরগুলোকে বেছে নেবেন আপন বেদী হিসেবে, তাতে আর অবিশ্বাসের কি আছে? এ সব মানুষ অতীন্দ্রিয় সত্তায় লীন হয়ে গেছেন, এঁদের বিচার বস্তুতান্ত্রিক চোখ দিয়ে চলে না...এঁদের জীবন-ইতিহাসে সবই সম্ভব। শিষ্যটি আবার বলেন—"আপ পরনাম ইয়হী সে কর লিজীয়ে। লাখ কোশিশ পর ভী বে তো গঙ্গাজী সে নহী উঠেঙ্গে, ঔর নহি বোলেঙ্গে।" আমার চোখের সামনেই ওঁর পেছন দিক। ভাবি, উনি মুখ না ফেরালে প্রণাম করি কি করে? শিষ্যটিকে জানাতে তিনি দূর থেকে প্রণাম করার অনুরোধই জানান।

যে মুহূর্ত্তে প্রণাম জানাই, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই তিনি চকিতে ফিরে তাকান, যেন আমার প্রণামটির সঙ্গে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সম্বন্ধ আছে। হাত দুটিকে তিনি আশীর্ব্বাদের ভঙ্গীতে উর্দ্ধাকাশে তুলে ধরেন।

এ রকমটি যে হবে, প্রণামের অঞ্জলিতে যে একজন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ঘুরে দাঁড়াবে এটা জানা ছিল না...অভিজ্ঞতার শিহরণে আমি যেন পাথর হয়ে গেলাম।

বিষ্ণুদত্ত যে কি জিনিস, কত দূরদূরান্তে যে এ মানুষটির গতিবিধি তার প্রমাণ মিলে গেল। দূর থেকে পেছন ফিরে যে প্রণামকে বুঝতে পারে, সে মানুষের বিশ্লেষণ করি কি ক'রে?

বিষ্ণুদত্ত...উত্তরকাশীর সম্পদ বিশেষ...একটি বিশেষ ইতিহাসের মুর্ত্তিমান প্রতীক...আধ্যাত্মিক সাধনার পূর্ণকুম্ভ যেন। বিভোর হয়ে উঠে আসি গঙ্গার তীর হতে। দুটি বাহুর আশীর্ব্বাদই জীবনের সঞ্চয় হয়ে থাক : কথা নাই বা হ'ল, যা পেলাম তাই সার্থক—তাই পুণ্যময়।

চলে আসার সময় শান্তমূর্ত্তি শিষ্যটি বলে দেন—"ঔর এক সিদ্ধ মহাত্মাজী ইয়হীঁ উন কে সাথ রহতে থে—বিলকুল নঙ্গে। উয়ে অব ইয়হাঁ নহী রহতে হৈঁ অব উয়ে গঙ্গোত্তরী মন্দির কে উল্লী পার ভারী জঙ্গল মে রহতে হৈঁ। বড়ে বিরাট পুরুষ হৈঁ উয়ে—অগর আপকী সুকৃতি হৈ তো উনকা দর্শন মিলনা অসম্ভব নহী হৈ। অগর উনকী আশীর্ব্বাদ মিলে তো সমঝিয়ে কি ঈশ্বর আপ পর প্রসন্ন হৈ—।

বলি—"আচ্ছা।"

ধর্ম্মশালায় ফিরে আসি যখন তখন বেলা দেড়টা। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ, ঠিক যেন বাংলাদেশের আবহাওয়া। বিষ্ণুদত্তের কথা চিন্তা করতে করতেই সময় পার হয়ে গেছে, খাওয়াদাওয়ার কথা মনেই ছিল না। ধরম সিং স্মরণ করিয়ে দেয়, বিকেলে ওদের বাড়ীতে যাওয়ার কথা—ভাইয়ের মারফত সে অনেক আগেই খবর পাঠিয়ে দিয়েছে তাদের গ্রামে। আজকের রাত্রে আমি নাকি ওদের সম্মানীয় অতিথি। তাও ত বটে! বলি—"রান্নাবাড়া যা হোক চুটো করে নে—সাড়ে তিনটের ভেতরেই রওনা হব, ভয় নেই।"

কালীকমলীওয়ালা ধর্ম্মশালার লাগোয়া প্রশস্ত ঘাট—নাম রাজঘাট। অপর পারে মণিকর্ণিকা, কেদারঘাট। কাশীরই স্মৃতি বহন করেছে উত্তরকাশী। ওদিকে ত্রিবেণী-বরুণা ও অসি সেখানে মিলেছেন। যে অসি-বরুণার সন্ধান পাই বারাণসীতে—এখানেই সে দুটি ধারার সার্থক পরিচয়। রাজঘাটের ব্যবস্থাটি বড় সুন্দর, যে ব্যবস্থার দ্বিতীয়

রূপ আর কোথাও নেই। গঙ্গার খরস্রোতকে পাথরের বৃত্তের ভেতর বন্দী করা হয়েছে আর ধর্ম্মশালার অন্দরমহল থেকেই পাকা বাঁধনো সিঁড়ি নেমে এসেছে গঙ্গার জল পর্য্যন্ত। স্নানার্থীদের জন্যে সিঁড়ির দু'পাশে লোহার শেকল শক্ত করে বাঁধা। এখানে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে স্নান সেরে নি।

কিন্তু পরিতৃপ্তি স্নানেরই হ'ল শুধু, থাকার নয়। ঘরে আসার দশ মিনিটের মধ্যেই গৈরিকবসনপরিহিত একটি ভোজপুরী মানুষের অবাঞ্ছিত উপস্থিতিতে একাকিত্বের আরামটুকু কর্পূরের মত উবে যায়। বিষ্ণুদত্তেরই ধ্যানে ছিলাম, ছিঁড়ে গেল তা। ঘরের ভেতর ঢুকলেন হুড়মুড়িয়ে, যেন আমি কেউ নই। কৈফিয়ত তলব করবার আগেই পরিচয় দিলেন চড়া গলায় যে তিনিই মূর্ত্তিমান কালীকমলীওয়ালা, যমুনোত্তরী ও গঙ্গোত্তরী পথের যাবতীয় ধর্ম্মশালার তিনিই একছত্র কাণ্ডারী। অদ্ভুত দম্ভের সুর গলায়, হাত-পা নেড়ে কথা বলার ভেতর আশ্চর্য্য এক নাটকীয় ভাব। জানতে চাইলেন, তাঁর অনুমতি না নিয়ে এ ঘর কে আমাকে দিয়েছে?

রাগে সমস্ত শরীর আচমকা যেন বিষিয়ে ওঠে, লোকটির ওপর অশ্রদ্ধায় যেন ভেঙে পড়ি। তারই সুর হুবহু অনুকরণ করে বলি যে, চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী চৌকিদারের কাছ থেকেই ঘর নেওয়া হয়েছে। অন্যায় কিছু করা হয় নি। উত্তরে বলেন—"ওসব বাত ছোড়দো। কম্‌রা দেনে ন দেনে কা মালিক তো খুদ বহী হৈ—। চৌকিদার কোই নহী হৈ। ইস কম্‌রে মে অকেলা রহনা তো হোগা নহী—কমসে কম ঔর চার যাত্রী মেরে ইস কমরে মে আয়েঙ্গে।"

এর পর আর কিছু বলাও চলে না অন্ততঃ এ মানুষের সঙ্গে। ধরম সিংকে ডাকি, বলি বিছানাপত্র বেঁধে নাও—এ ঘরে থাকা চলবে না।

ধরম সিং বোঝে তার অনুপস্থিতিতে গুরুতর একটা কিছু ঘটেছে। বিনাবাক্যব্যয়ে সে সব গুছিয়ে নেয় আর আমিও দ্বিরুক্তি না করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। কালীকমলীওয়ালা ধর্ম্মশালায় থাকা এইখানেই আমার ইতি। লোকটি শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় আমার দিকে ভীরুর মত। এখান থেকে সোজা চলে আসি বিড়লার ধর্ম্মশালায় যেখানে কোন কিছুর অভাব আমার হয় নি। শাপে আমার বর হয়ে যায়। পরে শুনেছিলাম, বীরপুঙ্গবটির ঔদ্ধত্যের পরিচয় উত্তরকাশীর আপামর জনসাধারণের জানা। অর্থের লালসা তাকে অমানুষ করেছে, অধর্ম্মকে ধর্ম্মের খোলস পরাতে এরকম ওস্তাদ মানুষ এখানে খুব কমই আছে। কমলীবাবার মহান যাত্রীবাসের বুকের ওপর এ বসে আছে জগদ্দল পাথরের মত। সকলেই চায় এ এখান থেকে সরে যাক্— যাত্রীনিবাসে শৃঙ্খলা ও ন্যায় নেমে আসুক।

খাওয়াদাওয়া শেষ হ'ল, ধরম সিঙের হুকুমও সুরু হ'ল। এখানে যেন আমি কেউ নই, বিছানার ভেতর থেকে বার করল পাতলা ধবধবে কাপড়, সেই সঙ্গে কাচানো একটা জামা। আলোয়ানটা ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করে নেয়, চোখের গগ্‌লসটা ঠিক করে রাখে। আমার যাত্রাপথের চিরন্তন পোষাককে খুলে নেয় সে—আজকে সে আসল বাঙালী সাজেই আমাকে দেখতে চায়। বালকের আবদারটুকু অমূল্য বলে মনে হয়, তার সব অনুরোধগুলো মেনে নি। পরে নি কাপড়, কাচানো গেঞ্জী, পাঞ্জাবী ও আলোয়ান—সেই ছোট ছুটি হাত দিয়ে আমার শরীরে জড়িয়ে দেয়। গগল্‌সটা চোখে দি, তার মতে এতে নাকি আমাকে ভীষণ মানায়। হাতে লাঠিটা পুরে দেয়, জুতো ছুটোকে ঝেড়েঝুড়ে সেই পরায়। উত্তরকাশীর পথে যখন চলতে সুরু করি তখন মনে হয় তামাম ছুনিয়া জয় করে ফিরছি আমি, আর পুরোভাগে চলেছেন আমার

প্রধান সেনাপতি। ধরম সিঙের সে কি খুশী খুশী ভাব—যাকেই সামনে পায় তাকেই বলে, "কলকাত্তাসে আয়া হ্যায়…বাঙালী বাবু—মেরা মোকামমে যাতা"

একটা খাড়াই পাহাড়ের ওপর ধরম সিংদের বাড়ী, গাঁয়ের নাম বোংওয়ারী। উঠতে পরিশ্রম হ'ল কম নয়, কিন্তু ওপরে উঠে পরিশ্রমের এক কণাও পড়ে রইল না আমার। পাহাড়ের শীর্ষে একটি নরম ঘাসের আস্তরণ পাতা যেন, দূর থেকে দেখলাম পাহাড়ী তরুণীরা মাথায় করে জিনিষপত্র বয়ে নিয়ে চলেছে আর সেই সঙ্গে তাদের এক সঙ্গে গাওয়া গানের সুরও কানে ভেসে আসে। এই দুর্ব্বাদলের আস্তরণের মধ্যে ছোট ছোট কুটীরের সমারোহ…এ পাশে পাহাড়, ওপাশে পাহাড়, তারই মধ্যে এই অনামী পার্ব্বত্য গ্রাম…এত সুন্দর পরিবেশের ভেতর যে ধরম সিঙের বাড়ী জানা ছিল না। ভেবেছিলাম, উত্তরকাশী জনপদের ভেতরেই ওর বাড়ী ; কিন্তু এখানে এসে বুঝলাম ধরম সিং কেন এত নির্ম্মল, কেন এত সুন্দর। যে পরিবেশের ভেতর ও মানুষ হয়েছে তার ষোল আনা সার্থকতা সে যে পেয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আমার আসার সংবাদ যে এ গ্রামে ধরম সিঙের ভাই মারফত ভাল ভাবে পরিবেশিত হয়েছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ রইল না ; ঢোকার মুখেই পেলাম সম্বর্দ্ধনা—রাজকীয় কায়দাকানুন। অনেকে জড়ো হয়েছে, স্ত্রী-পুরুষ, ও শিশুর দল। "কলকাতার বঙালীবাবু"র এ গ্রামে আসাটা যে বিশেষ সম্মানজনক ব্যাপার সেটা জানা ছিল না। তাই যা পেলাম তাই আমার কাছে অবিশ্বাস্য। ধরম সিঙের বাড়ীতে যখন পৌঁছলাম, তখন পেছনে দেখি সারা গ্রামের লোক জড়ো হয়েছে।

ছোট্ট একটি কাঠের বাড়ী, মাত্র দুটি ঘরের সংস্থান। একটি ঘরে

আমার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছে, ধবধবে একটি বিছানা পাতা, আর তারই একটি কোণে রান্নাবান্নার ব্যাপার। ধরম সিঙের ভাই ছাড়াও একটি বোন আছে, নাম সোনা। বড় সুন্দর দেখতে। ওর মাকে দেখে, আতিথেয়তার আর সেবার সম্রাজ্ঞী মনে হ'ল! কি অদ্ভুত সরল মন—আমাকে তিনি কি ভাবে নিলেন তার গভীরতা মাপা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। একটি রাত আর এক বেলা তাঁর আদর-আপ্যায়নে আমি যেন ডুবে যাই। ধরম সিঙের মাকে ভোলা যাবে না কোন দিন। রাত্রে গ্রামের প্রধানেরা এলেন, ধরম সিং পিতৃহীন, তাই আমার অসুবিধার কথা চিন্তা করেই তাঁদের আসা। অনেক কথাবার্ত্তা হ'ল এঁদের সঙ্গে, সুখদুঃখের ও হাসিকান্নার। সরলতার প্রতীক—মানুষের মত মানুষ। অনেক রাত্রে খাওয়া শেষ হয়, আজকে সে ডাল-রুটির অদ্ভুত ব্যাপারটি নেই, মাতৃস্বরূপার হাতের নানাবিধ রান্না খেলাম আজ, যা অনেকদিন আমার ভাগ্যে জোটে নি।

কোথাকার মানুষ কোথায় আমার রাত কাটানো...হৃষিকেশের ধরম সিং, সেই আজ পরম সুহৃদ, মনুষ্যত্বে যে আমার থেকেও বড়। অদ্ভুত আবেষ্টনী ও পরিবেশ...পরিচয়হীন একটি পরিবারের সঙ্গে যে এমন করে মিশে যাব জানা ছিল না। রাত্রে যখন শুলাম তখন দেখা গেল আমারই পায়ের তলায় ধরম সিং, সোনা আর তার ভাই একটী লাইনে শুয়েছে। ও ঘরে ওর মা—এ ঘরে আমরা। আমিই বা কে? ওরাই বা কারা? মানুষের সহজাত শুভবুদ্ধির আবর্ত্তে পংক্তিভাগ উড়ে গেছে, সারল্য ও হৃদয়বৃত্তির অঞ্জলিতে লোক-লৌকিকতা কোথায় ভেসে গেছে। এরা পাহাড়ের মানুষ, অতিথিকে তাই এরা ভগবান বলে মেনে নেয়। অখ্যাত ও অনামী এরা—তাই তথাকথিত সভ্যতার অভিশাপ এরা পায়নি।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়, ঘরের বাইরে চলে আসি নিঃশব্দে, কাউকে না জাগিয়ে। কেন যে আচমকা ঘুম ভেঙ্গে গেল বুঝি না। কুটীরের সামনে যে একফালি বারান্দা, তারই একটা কাঠের খুঁটি ধরে হঠাৎ থেমে যাই।

নিশুতি ও নিস্তব্ধ রাত…ঘন অন্ধকারে অবলুপ্তপ্রায় প্রপঞ্চজগৎ। পাহাড়গুলোর অবয়ব চোখে পড়ে না, তাদের চূড়োগুলো যেন বর্শাফলকের মত ঊর্দ্ধাকাশে উঠে গেছে, অন্ধকারের ভেতর তাদের ছায়ামাত্র দেখতে পাই, আর কিছু নয়। মধ্যরাত্রের ঠাণ্ডা বাতাস… চাদরটাকে গায়ে টেনে নি আমি।

অখণ্ড একটা আকাশ। সপ্তর্ষিমণ্ডলের দুটি বৃহৎ তারা ওদিকটার পাহাড়ের ওপর জ্বলজ্বল করে জ্বলছে…নীহারিকার জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ গেছে মুছে…অতন্দ্র মায়াময় ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাসে শুধু ঐ তারার প্রহর-জাগা, আর সব যোগনিদ্রায় লীন হয়ে গেছে যেন। মনে হ'ল দুটিমাত্র তারা অনন্ত এক জপমালা গুনে চলেছে কিসের এক অন্তহীন আরাধনায়। আজকের রাত্রে ওরাই প্রাণময়—বাদবাকী মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন যেন।

অনুভূতির পর অনুভূতি…সে সব যায় লুপ্ত হয়ে,…শাশ্বত হয়ে যে মহাতত্ত্বটি জেগে ওঠে প্রদীপের ঊর্দ্ধশিখার মত তার তুলনা পাই না। বিশেষ স্থানে বিশেষ আত্মানুসন্ধানের পাতা উল্টে যায় আমার…।

ও দুটি তারার ত ঘুম নেই, ওরাই বা অমন করে প্রহর গুনছে কেন? ওরা কারা?

একটি নয়, দুটি—একটি তারাকেই বা দেখি না কেন? এর অর্থ কি? এ যোগের ব্যঞ্জনা কোথায়?

জপের মন্ত্রের ভেতর দিয়ে চিন্তার আচ্ছন্নতার বেদীতে ও দুটি তারাকে আর তারা বলে মনে হয় না আমার। মনে হয় মাথার ওপর আশীর্ব্বাদের মত প্রকৃতি ও পুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। একটি পরম-শক্তি আর একটি পরমাশক্তিরূপিণী—একটি শিব আর একটি মহামায়া। গাংনানীর যমুনার তীরে সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রবাহিণীর ফিকে সবুজ রঙের ভেতর আজকের এই ভাবটির প্রথম পরিচ্ছেদ উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল আমার কাছে, এখানে সেই ভাবটির ভাস্বর রূপ আরও বেশী করে প্রকট হয়ে ওঠে। নিস্তব্ধ হয়ে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পিতৃসত্তা ও মাতৃসত্তার চরম যুক্ত বিকাশকে যেন মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝতে পারি। যেখানে প্রকৃতি সেইখানেই পুরুষ, যেখানে পুরুষ সেইখানেই প্রকৃতি।

জ্বলজ্বলে ও দুটি তারা আর কেউ নয়—আমার বোধেরও প্রকৃতি-পুরুষ।

মানুষের আরাধনা শুধু একটিমাত্র শক্তিকে ঘিরে নয়—আরাধনার সবকিছু যুক্তশক্তির বেদীতে। মাতৃসত্তাকে অগ্রাহ্য করে শক্তিকে জাগান যায় নি কোন কালে, সাধনার সর্ব্বোচ্চ স্তর দুটি শক্তিকে ঘিরেই। সূর্য্যের চারিধারে যেমন এই পৃথিবীর পরিক্রমণ, তেমনি সাধনমার্গের পরি-ক্রমা পুরুষ-প্রকৃতিতে। মাতৃগর্ভে সৃষ্টির সম্ভাবনায় শুধু মা-ই সব নয়, সেখানে পুরুষের অমোঘ অবদান আছে। শক্তিপূজায় দীক্ষিত সাধকের তপস্যায় একটি শক্তিকে আবাহন করা হয় নি, সেখানে সাধিকার প্রয়োজন হয়েছে যুগে যুগে। শ্রীকৃষ্ণের লীলাখেলায় শ্রীরাধিকা আছেন, গোপিনীরা তাই সেখানে দুয়ে দুয়ে চার মিলে যাওয়ার মত। তান্ত্রিকের শব সাধনায় ভৈরবীর প্রয়োজন হয়েছে, ভৈরব সেখানে একা নয়। পুরুষের দেহ সেখানে শবের মত যেখানে তার বুকের ওপর

কালিকামূর্ত্তির ঘনশ্যামা মূর্ত্তিটি নেই। বরাভয়দায়িনীকে তখনই আনতে পারা যাবে, যখন শিবের পূজোয় আমরা বিভোর হয়ে যাব। চিন্ময়ী মায়ের বিকাশ ভিখারী মহাদেবের ভিতর, আবার মহাদেবের সকল সার্থকতা অন্নপূর্ণার মহাদানে।

সকালবেলা ধরম সিং নিয়ে যায় একটি সাধুর কাছে। গ্রামের তিনি প্রাণস্বরূপ। এঁর কথা ও আমাকে বহু বার বলেছে।

গ্রামের শেষ প্রান্তসীমায়, পাহাড়ের খানিকটা ঢালু জমি, তার পর নানাবিধ গাছপালার ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশ, এরই মধ্যে অনামী একটি পর্ণকুটীর—এইখানেই তিনি থাকেন। ভিতরে ঢুকে দেখলাম মধ্যে বিরাট একটি বাঘছাল পাতা। একপাশে কমণ্ডলু আর চিমটে—আর বাঘছালটির ওপর তিনি বসে আছেন আসনের ভঙ্গীতে। বসে পড়ি একপাশে, তারপর হাতটা বাড়িয়ে দি' প্রণামের উদ্দেশ্যে। প্রণাম তিনি নেন, একটু হাসেন, তারপর ডান হাতটা আশীর্ব্বাদের ভঙ্গীতে উর্দ্ধাকাশে তুলে ধরেন। মনে হ'ল, এ ভিন্‌গাঁয়ে আমার মত একটা 'বাঙালী বাবুর' আসার খবর লোকমারফত আগেই তিনি পেয়েছেন। আমার সঙ্গে ধরম সিংকে দেখে তাঁর বিস্ময় জাগে, কৌতূহল ফুটে ওঠে। বিনা ভূমিকাতেই জিজ্ঞাসা করেন ধরম সিংকে দেখিয়ে—"আরে, উন্‌সে আপ কিধার মিলে? এ জিজ্ঞাসা তিন-চারবারই তিনি আমাকে করেন। বুঝিয়ে দি তাঁকে সব ইতিহাস, হৃষিকেশ থেকে সুরু করে যমুনোত্তরী ঘুরে ধরম সিংকে কি ভাবে পেয়েছি, কি ভাবে সে আমাকে সাহায্য করেছে তার সব কিছুই তাঁকে শোনাই। শোনার পর মন্তব্য হয়, "আপ বহুত আচ্ছে আদমী মিলে, মেরে সাথ ইহ লেড়কা সগরু গিয়া। আপকা পুণ্য—পরতাপ হী ইসে মিলা দিয়া। মেরে সাথ

চার যাত্রী ঔর থে—উনমে সে কোই ভী নহী সহ সকে—ইস বালককে দ্বারা ওহে সম্ভব হুয়া থা—।”

ছাঁত করে ওঠে মনটা। মনে পড়ে সব। সগরুর বহু গল্প, ধরম সিং পথে যেতে যেতে বলেছে: জানিয়েছিল সগরুর সেই জায়গা যেখানে সাধুসঙ্গের ষোলকলা পূর্ণ হয়ে যায়। দুর্গম দুরারোহ সে তীর্থ, সবাই যেতে পারে না, যারা পারে তাদের ওপর অশেষ কল্যাণ নেমে আসে, না পাওয়ার তাদের কিছু থাকে না। ধরম সিঙের চলতি গল্প কতক শুনেছি, কতক শুনি নি—কতক বিশ্বাস করেছিলাম, কতক অবিশ্বাসের পর্য্যায়ে থেকে গেছে। কিন্তু এখানে এই সাধুমূর্ত্তির মুখে যা শুনি—তাতে ধরম সিঙের ওপর শ্রদ্ধা আমার বেড়ে যায়, মনে হয় একে পাওয়া যোগাযোগের পাওয়া।

ভাটোয়ারী থেকে বেশ কিছু দূরে গঙ্গার পূর্ব্বদিকে পাহাড়-পর্ব্বতের বেড়াজালের ভিতর সগরু তীর্থ, সিদ্ধ যোগীপুরুষদের আবাসভূমি, তাঁদের সাধনার পীঠস্থান। সগর রাজার নাম থেকে সগরু শব্দের উৎপত্তি, সে তীর্থ তুষারতীর্থ, সাধারণ যাত্রীদের তথা মানুষের কাছে সগরু, ‘দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে—।’ নানা কথাবার্ত্তার মধ্যে ঐ তীর্থ-উপাখ্যানটি বড় হয়ে ওঠে, ব্যাপক হয়ে ওঠে। বুঝতে পারি ধরম সিঙের ধার্ম্মিক জীবনে তিতিক্ষার উৎকর্ষ—তাঁর আশীর্ব্বাদই সে শুধু পায় নি, সঙ্গী হিসেবে যাওয়ার বিরাট সম্মানটুকুও সে পেয়েছে। সগরুর কথা আমি এর আগে অন্য কোথাও পাই নি, বা পড়ি নি। যেটুকু তথ্য ইনি পরিবেশন করেন তাতে মনে হয় সে তীর্থভূমি মহাপুণ্যের, মহাভাগ্যের। বলেন, গঙ্গোত্তরী শেষ করে ফেরার পথে আমার যদি যাওয়ার ইচ্ছে হয় তা হলে তিনি আমার সঙ্গী হতে পারেন। নানা কারণে এ যাওয়া আমার ঘটে ওঠে নি। সগরু

যাওয়া গল্প আমার কাছে আলেয়াই থেকে গেছে। যে সগর বংশের ধ্বংসের ফলে ভাগীরথীর উৎপত্তি, ভগীরথ যে শাপ খণ্ডনের জন্যে মহা-তপস্যায় রত ছিলেন—সেই ইতিহাস-আকীর্ণ সগরুকেই দেখা হয় নি। এই সাধুটি আমাকে যোগাযোগের পথ করে দিয়েছিলেন, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে আমি সেই যোগাযোগকে বরণ করে নিতে পারি নি।

ধরম সিঙের মা ছাড়েন না—গরম গরম ভাত, আলুর তরকারি, চাটনি ইত্যাদি খেতেই হ'ল। মাতৃস্নেহ অসীম, সে যে কোন নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়—তার জ্বলজ্বলে প্রমাণ পাই এঁর ভেতর। ধরম সিঙের মত ছেলের তিনি মা—তাই রত্নপ্রসবিনী। আগের রাত্রে আমার আসাকে উপলক্ষ্য করে ভূরিভোজনের যে প্রমাণ পেয়েছি তাও মনে থাকার কথা। কাছে বসিয়ে খাইয়েছেন, আমি খেয়েছি আর সেই সঙ্গে এও বুঝেছি সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে মাতৃমূর্ত্তি সমান। ধরম সিঙের বাবা অনেকদিন আগেই মারা গেছেন। এখানে এসে আর একবার বুঝে গেলাম যে, দারিদ্র্যের সংসারে বেশী করে মায়া থাকে, স্নেহ থাকে, মানুষের আত্মা এখানে অবমানিত হয় না। যেখানে অর্থের অভিমান নেই, সেখানে মনুষ্যত্বটা বড় বেশী করে বেঁচে থাকে যেন। দীন-দরিদ্র ধরম সিং ও তার পরিজন, তাই ভগবান আশ্রয় নিয়েছেন এদের ভিতর।

এখান থেকে বিড়লার ধর্ম্মশালায় ফিরে আসি বেলা এগারটার ভিতর। চলে আসার সময় সে করুণ দৃশ্য ভোলবার নয়।

বিকালবেলা বেরিয়ে পড়ি উজলীর দিকে। ওখানে নাকি সাধু-সন্তদের আস্তানা, খবর দেয় ধরম সিং। বিষ্ণুদত্তকে দেখার পর অবশ্য অন্য মানুষ দেখার প্রয়োজন ছিল না, তবু কেমন যেন ঔৎসুক্য জেগে

ওঠে ; মনে হয় একবার ঘুরেই আসি। ব্যাপারটা একবার নিজের চোখে দেখে আসা দরকার।

উজলী উত্তরকাশীর পৌরশাসনের এলাকার বাইরে, বেশ খানিকটা দূরে। জনপদ সেখানে ফুরিয়ে গেছে, গঙ্গার ধারে নিস্তব্ধ পরিবেশের মধ্যেই উজলীর পরিচয়। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ওখানে পৌঁছে যাই।

এসে দেখি, আস্তানাই বটে—বিস্তীর্ণ এক এলাকা জুড়ে সাধু-সম্প্রদায়ের অতি আধুনিক ঘরবাড়ীর সমন্বয়ে এক বিরাট উপনিবেশ। এধার থেকে ওধার পর্য্যন্ত লম্বা এক পাঁচিল, তার ভিতরে নানা মানুষের সাধনমার্গের দুস্তর এক পরীক্ষা। যত মানুষ তত মত ও পথ। সাধুদের আনাগোনা দেখি—ফিটফাট, পরিষ্কার করে দাড়িগোঁফ কামান ও মুণ্ডিত মস্তক···মনে হয় সবেমাত্র প্রাত্যহিক ক্ষৌরকার্য্যের পালা যেন শেষ হয়েছে এঁদের। গৈরিক বসনকে কেতাদুরস্তভাবে পরা হয়েছে—কোথাও এতটুকু ময়লা বা দাগ নেই—যেন ধোপারবাড়ী থেকে ওগুলো সবেমাত্র এসেছে। ভিতরে ঢোকার আগে এঁদের দেখে আমার মনের ভেতর এক বিজাতীয় মনস্তত্ত্বের উদ্ভব হয়। উজলী আর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না, মনে হয়, না এলেই যেন ভাল হ'ত। ভাবি, গঙ্গার ধারে একটু বসি, তারপর সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলেই উঠে যাব।

"ও মশাই শুনুন।" পাঁচিলের ওদিকটা থেকে কে যেন ডাক দেন। চমকে তাকাতেই দেখি একজন হাত তুলে আমাকে ডাকছেন। পরিষ্কার বাঙালীর কথা, কোন ভুল নেই। এ উপনিবেশের মধ্যে তা হ'লে বাঙালীও আছেন? ভিতরে ঢুকে বিস্ময় সুরু হয়। হালফ্যাসানের ছোট ছোট বাড়ী, প্রত্যেকটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। বাড়ীর রং আগাগোড়া গেরুয়া—বৈরাগ্যের রঙকে ইটকাঠ পাথরের মধ্যেও টেনে আনা হয়েছে। আমার আসা দেখে ঐসব বাড়ীঘরের সাধু-

মালিকরা তটস্থ হয়ে ওঠেন, আমি কখন তাঁদের প্রণাম করব তারই যেন সকরুণ প্রতীক্ষা। যিনি আমাকে ডাকলেন—তাঁর বাড়ীতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠি, সামনে ছোট্ট একটু বাগান—কলাগাছ ও উচ্ছেগাছকে বহু আয়াসে পোঁতা হয়েছে। বুঝলাম, সাধনমার্গে গৃহস্থালীও পাল্লা দিয়েছে ষোল আনা। ঝকঝকে তকতকে কয়েকটি ঘর, একটি লম্বা দালান, দালানের এক কোণে রাশীকৃত বইপত্রের স্তূপ। বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়। আসল কথার আড়ালে সুদূর বাংলাদেশের ফেলে আসা সংসারের খুঁটিনাটি কথাও এসে পড়ে। বলেন—"কিছু কি করবার আছে, এই ত দেখুন না কলকাতা থেকে মেয়ে চিঠি লিখেছে, জামাইয়ের অসুখ, টাকা চাই। সে মনে করে তার বাবার এখানে জমিদারী, তার থেকে টাকা পেয়ে পেয়ে আমার সিন্দুক গেছে ভরে। আর পারি নে মশাই, এদিক সামলাই না ওদিক সামলাই।"

—"কলাগাছ আর উচ্ছেগাছ পুঁতেছে কে? আপনি?"

—"সে আর বলতে। স্রেফ আলু আর আলু, এ ছাড়া কি এদের দেশে আর কিছু আছে? মুখ ত বদলান চাই। ফেরার মুখে আসবেন একবার—উচ্ছে খাওয়াব।"

এই সব কথার মধ্যেই এক ঘণ্টার উপর কেটে যায়—এতে করে তৃপ্তি হয় না। দেখেশুনে মন ঘুলিয়ে ওঠে···একরকম জোর করেই পালিয়ে আসি। উপনিবেশের আর সব বিংশশতাব্দীর সাধুরা চেয়েছিলেন আমি তাঁদের কাছে বসি আর তত্ত্বকথা শুনি। আমার ক্ষমতায় কুলোয় নি তা। মানুষ এখানে বৈরাগ্যের পথ ধরে নি, তাকে শিখণ্ডী করে হয়ত বা এক অন্তহীন প্রবঞ্চনার সাধনা চলেছে···এখানে না এলেই যেন ভাল হ'ত।

আজকের রাত ফুরুলেই উত্তরকাশীতে থাকা শেষ হয়ে যাবে—সুরু

হবে নতুন পথ ও নতুন অভিজ্ঞতা! যেটি আসল, যার জন্যে উত্তরকাশীর সকল মহিমা ও সকল ঐতিহ্য, বিষ্ণুদত্তের যোগমগ্নতা যাঁকে ঘিরে, সেই ভগবানের ভগবান বিশ্বনাথকেই আমার এখনও দেখা হ'ল না। উজলী থেকে ফেরার পথেই সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, ভাবি অন্ধকারের ভিতরই শঙ্করকে দেখে আসি একবার। আলোর ভিতর ভগবানকে দেখি নি, সেই যেন ভাল হয়েছে। আমি আর ধরম সিং পা চালিয়ে দি'—আরতির সময়ও ত হয়ে এল।

বারাণসীর বিশ্বনাথ আর উত্তরকাশীর এই বিশ্বনাথ—তফাত শুধু ব্যাপক নয়, বহুধা। সেখানে বিরাট শহরের স্থানবিশেষের গরিমা—সারবন্দী দোকান আর পুণ্যলোভাতুর মানুষের সংমিশ্রণে পাণ্ডাদের মিছিল। সেখানে দেবাদিদেব যেন হারিয়ে গেছেন ভিড়ের ভিতর, তাঁকে যেন চেনা যায় না···তাঁর স্পর্শ পেতে পেতেই যাত্রী নিঃস্ব হয়ে যায়, দেউলে হয়ে যায়। এখানে মন্দিরের বৃত্তের ভিতর প্রবেশ করেই মনে হ'ল দৈবভাবের ভিতর জীবনের সত্তা যেন গেঁথে যেতে বসেছে।

নিরাভরণ মন্দির। অলঙ্কারের আতিশয্য নেই, ভাস্কর্য্যের অতি সাধারণ বন্ধনের একটি পাষাণপ্রাচীরকে কেন্দ্র করে তিনটি সমসূত্রে গাঁথা মন্দিরের অবস্থিতি, গবাক্ষহীন, একটিমাত্র প্রবেশপথ দিয়েই যাত্রীসাধারণের আসা-যাওয়া। মধ্যে অল্পপরিসর একটি নাট্যমন্দিরের ইঙ্গিত, তার ওদিকে পাষাণবেদীর ওপর স্বয়ম্ভু মহাদেবের উদ্ভব। তার পাশে উত্তরকাশীর ঐতিহাসিক অষ্টধাতুর ত্রিশূল, যার প্রাচীনতা ত্রিকালকেও হার মানিয়েছে।

ভাবে বিভোর হয়ে এখানে যখন এসে যাই তখন আরতি সুরু হয়েছে। পাহাড়ী কিশোরদের হাতে বেজে ওঠে বাজনার অদ্ভুত সম্বর্দ্ধনা। ঠিক সময়েই এসেছি আমি···

পূজারী বৃদ্ধ, হাঁটুর ওপর কাপড়, একটি শুভ্র গরম আলোয়ান হ্যুজ্জ দেহের ওপর জড়ানো—গোটা জীবন এঁর সংযমের মধ্যেই ত কেটেছে। বাঁ-হাতে তাঁর ঘণ্টা, ডান-হাতে কর্পূরের দীপাধার···আরতি সুরু হয় ক্ষেপা মহাদেবের। বিশ্বযোনির প্রকাশকে দেখা যায় না, মাতৃশক্তি এখানে ভূগর্ভে প্রোথিতা।

মন্দিরের আশেপাশে রাত্রির অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না। মন্দিরাভ্যন্তরে সামান্য আলোর যা একটু প্রকাশ—বাদবাকী বিশ্ব-সংসারকে কে যেন অন্ধকারের অবগুণ্ঠন পরিয়ে দিয়েছে।

শিবের পূজো সুরু হয়েছে, তাই প্রকৃতি সুষুপ্তিতে মগ্না, বিশ্ব-চরাচর তাই স্তব্ধপ্রায়। কুমারসম্ভবের ক'টি লাইন আমার মনে পড়ে যায়।

নিষ্কম্প বৃক্ষম্, নিভৃত দ্বিরেভম্
মুকাণ্ডজম শান্তমৃগপ্রচারম্ ;
তচ্ছাশাষণাৎ—কাননমেব সর্ব্বম্
চিত্রার্পিতারম্ভ ইবা বতস্থে।

মুখের উপর আঙ্গুল রেখে নন্দী যেন বলছেন—'মা চপলায়।' যেহেতু উমা শঙ্করের পূজায় বসেছেন, তোমরা চপল হইও না। এখানে উমা নেই, কিন্তু মানুষ আছে, আজকে তার পূজাও কম নয়। কর্পূরের ধোঁয়ায় মন্দিরের আবহাওয়া ভারী হয়ে ওঠে। পূজারীর বহুবিধ মুদ্রার ভিতর দিয়েই এ আরতির প্রকাশ···শিবলিঙ্গের বুকের ওপর দীপাধার যেন জ্বলে জ্বলে ঘুরতে থাকে। উত্তর কাশীতে লিঙ্গ-মূর্ত্তি সোজা হয়ে ওঠেন নি, দেবাদিদেবের পূর্ব্বদিকে বঙ্কিমভাবে অবস্থান।

কর্পূরের আরতির পর পঞ্চপ্রদীপের আরতি···বোধের বুকের ওপরেও যেন আমার আরতি হতে থাকে। এ যে কি তা আমি বুঝাই কি ক'রে! প্রদীপের পর দর্পণ, তার পর চামর, তার পর শঙ্খ··· সর্ব্বশেষে পুষ্পের অঞ্জলিতে বিল্বপত্রের আবাহন।

পূজারী আরতিতে যতক্ষণ বিভোর ততক্ষণ নাটমন্দিরের প্রায়ান্ধকারের ভিতর মাড়বার-দুহিতাদের সমস্বরে গান শোনা যায়, শঙ্করাচার্য্যের সেই প্রসিদ্ধ শিবস্তোত্রম্।

প্রভুমীশ মনীশ অশেষ গুনম্
গুনহীন মহীষ গরলা ভরলম্
রননিজ্জীত দুর্জয় দৈত্য পূরম্
প্রনমামি শিবং শিব কল্পতরুম্ ॥

কতবার এ স্তোত্র শুনেছি, কিন্তু স্থানবিশেষের মহিমায় এ স্তোত্রের অর্থ অমূল্য হয়ে ওঠে। এক দিকে কাঁসরঘণ্টার গুরুগম্ভীর আওয়াজ —এক দিকে আরতির সজ্ঘারাম আর তার সঙ্গে এই স্তোত্রের অপার্থিব আধ্যাত্মিক মূল্যের যোগাযোগ···সবকিছু মিলিয়ে বিশ্বনাথের মন্দির যেন মরকতরাজ্য হয়ে ওঠে। ত্রিনেত্র মহাদেব মানুষকে এখানে ভক্তিমার্গের সোনার কাঠির স্পর্শ বুলিয়ে নরোত্তম করে তুলেছেন···তাঁর সৃস্ট জীব অন্ততঃ এই সময়টুকুতে মহত্তম ও দ্বিজোত্তম।

কেদারের পথে গুপ্তকাশীতেও এই অনুভূতি পেয়েছিলাম— এখানেও সেই অব্যক্ত অনুভূতিতত্ত্বের আর এক অধ্যায়। ওদিকে কাশীর বিশ্বনাথ—এদিকে গাড়োয়ালরাজ্যের পাহাড়-পর্ব্বতের গহ্বরে গুপ্তকাশী আর উত্তরকাশী···কাশী নামেই এক অপূর্ব্ব দৈবভাবের সমন্বয়। এখানে বসে বসে রক্তের ভিতর যে রোমাঞ্চের সাড়া পাই তার তুলনা নেই। এ কেন? কিসের এই সাড়া? ঐ ত একখণ্ড পাথর

—তাকে ঘিরেই মানুষের জীবনের চরম বন্দনা, চরম আরাধনা...কেন এরকম হয়, কেনই বা মনে হয় নিরাভরণ মন্দিরের এই স্বল্পপরিসর স্থানটুকুর ভিতর জীবনের বাকী ক'টা দিন পড়ে থাকি। ভগবানকে যদি না দেখা যায়, তবে কেন এই প্রাণের আকুলি-বিকুলি—কেন এই সর্ব্বাভীতের আবিষ্কারের চোখের জল ?

মাড়বার-দুহিতাদের মনে হয় স্বর্গ থেকেই ওরা নেমেছে, পৃথিবীর মানুষ ওরা নয়। বিরাট একটি প্রদীপ দীর্ঘদণ্ডের ওপর জ্বলছে—তার ঊর্দ্ধমুখী শিখাকে মনে হয় জীবনের সকল বুদ্ধির সকল আত্ম-তত্ত্বেরও শিখা যেন, যা অবিনাশী, যা চিরজ্যোতির্ম্ময়···! কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজ শুনি আর শুনি অপূর্ব্ব স্তোত্রের সুর।

গিরিরাজ-সুতান্বিত-বামতনুম্
তনুনিন্দিত-রাজিত-কোটিবিধুম্।
বিধি-বিষ্ণু-শিবস্তুত পাদযুগম্।
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥

আরতি শেষ হয়ে যায়···উঠে পড়ি ধরম সিংকে নিয়ে, সে-ও ভাবের ঘোরে বিভোর, তার সরল মুখের বড় বড় চোখ দুটিও তৃপ্তিতে বুজে গেছে যেন। মন্দিরের চত্বর ছাড়িয়ে পথের প্রান্তে নেমে আসি, তবু বাতাসে যেন ভাসতে থাকে—

নয়নত্রয়ভূষিত-চারুমুখম্,
মুখপদ্মবিরাজিত-কোটি-বিধুম্
বিধুখণ্ড বিমণ্ডিত ভালতটম্
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্

সকাল হতে না হতেই উঠে পড়ি—সারে চারটের সময় ঘুম ভেঙে যায়। ধরম সিংকে বলাই ছিল, পাঁচটার পরই আমরা বেরিয়ে পড়ি

ধর্ম্মশালা থেকে। বীরবলরা কালকেই রওনা হয়ে গেছে—ওরা কমলীবাবার ধর্ম্মশালাতেই উঠেছিল। গঙ্গোত্তরীতে আবার দেখা হবে এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে ওরা চলে গেছে, না হ'লে আর একটা দিন ওরা আমার অপেক্ষায় থাকত। অনেক বুঝিয়ে ওদের পাঠিয়েছি। যাওয়ার পথে মনে হ'ল বিশ্বনাথকে একবার দেখে যাই।

মন্দিরের সামনে তিনটি ছোট কুটীর—মধ্যের কুটীরের বুক ভেদ করে একটি বিরাট ত্রিশূল ঊর্দ্ধাকাশে উঠে গেছে। এত বিরাট ত্রিশূল কেউ কখন দেখেছে বলে মনে হয় না। মানুষের জন্যে যে এ নয়, এ যে স্বয়ং মহাদেবের, তাই প্রথম দর্শনে মন বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। বদরিকার পথে গোপেশ্বরের মন্দিরে যে ত্রিশূল দেখেছিলাম তার সঙ্গে এই ত্রিশূলের অমিল অনেকটা। তার দণ্ডটি ছোট কিন্তু ফলাটি অতি বৃহৎ, দেখলে সম্ভ্রমে মাথা নত হয়ে আসে। গোপেশ্বরের ত্রিশূলের মালিক পরশুরাম—এ ত্রিশূলের মালিক স্বয়ং শিব, সেইজন্যে আকৃতি ও প্রকৃতির পার্থক্যটা অতি সহজে চোখে পড়ে। বহু প্রাচীন এ ত্রিশূল···কোন্ অনাদিকাল থেকে এ যেন মাটিতে প্রোথিত হয়ে আছে। উত্তরকাশীর বহুদূর থেকে এটি চোখে পড়ে আর মনে হয় শিবের রাজত্বে এসে পড়েছি। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে অষ্টধাতুর এই মহাস্ত্রটির স্পর্শ নিই ও প্রণাম করি। অন্নপূর্ণার মন্দির কাছেই, চিন্ময়ী মায়ের দর্শন নিতে ভুলি না।

উত্তরকাশী শেষ হয়ে গেল। তিনটে দিন মাত্র থাকা—দেখা বা জানার দিক থেকে এ আর কতটুকু! মধ্য-হিমালয়ের এ বৃহৎ জনপদের ইতিহাস এত বিরাট, এত ব্যাপক যে তিনটি দিনের অবস্থিতি এখানে 'তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম'। একমাত্র বিষ্ণু দত্তকে নিয়েই ত জীবন কেটে যাওয়ার কথা, কতটুকুই বা জানলাম তাঁকে, কতটুকু

বা অঞ্জলিভরে নিতে পারলাম ! একটিমাত্র সন্ধ্যার আরতির অর্ঘ্য দেওয়া যা বিশ্বনাথের মন্দিরে, ঐ পূজারীর মত যদি আমার গোটা জীবনটা কেটে যেত পূজার ষোড়শোপচার নৈবেদ্য দিতে দিতে, তা হলে বুঝতে পারতাম, যা হোক কিছু হ'ল, খুদকুঁড়ো যা হোক কিছু পেলাম ! কিন্তু তাও ত হ'ল না : না পেলাম দেখার পূর্ণতম তৃপ্তি, না দিতে পারলাম পূর্ণতম অঞ্জলি । তাই অভিমানই থেকে যায় বুকের ভেতর ।

ছায়ার মত পথ জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে, তাই আমার বসার উপায় নেই···লাঠিটা চেপে ধরে ক্ষুব্ধচিত্তে তাই পথের প্রান্তে নেমে আসি···সোনার উত্তরকাশী তাই শেষ হয়ে যায়···।

॥ আট ॥

উত্তরকাশী শেষও হ'ল, গঙ্গোত্তরী পথের অর্দ্ধেক পথও শেষ হয়ে গেল। ওদিকে যেমন গাংনানী এসে যাওয়ার পর যমুনোত্তরীর হদিস মেলে, এদিকে তেমনি উত্তরকাশী। লক্ষ্যবস্তু যে আর বেশী দূরে নয়, এ জনপদ শেষ হয়ে গেলেই তা বেশ বুঝা যায়। রাত্রিবাস আর তিনটি স্থানে, তার পরেই ভগীরথের সাধনার মর্ম্মস্থলে পৌঁছে যাব।

উত্তরকাশীর আড়াই মাইল দূরে অসিকে পেলাম। এদিকে শহরে ঢোকার আগে আড়াই মাইল দূর দিয়ে ত্রিবেণীতে বরুণা মিশেছেন, তেমনি ঐ একই বৃত্তকে নিয়ে অসির পরিক্রমণ। উত্তরকাশীকে মানুষ পঞ্চকোশী হিসেবে চিনেছে ঐ জ্যামিতিক বিচার দিয়ে। তাই এই গোটা শহরকে নিয়ে উত্তরকাশীর পঞ্চকোশী নাম।

সহজ পথ—সুন্দর পথ। অসিকে পেরিয়ে যাই, আবার মা গঙ্গার স্নেহাঞ্চল এসে পড়ে। একাই চলেছি—মনে নূতন পথের নূতন মাদকতা। ধরম সিং দূরে। চলতে চলতে দূর থেকে দেখি গৈরিক-বসনাবৃত দুটি সাধু চলেছেন আমার আগে আগে। পাহাড়ী রাস্তায় দূর থেকে বৈরাগ্যের ও রংটি বড় ভাল লাগে, পথে আর কোন যাত্রী নেই, পাশাপাশি ওঁরা চলেছেন শুধু। জোরে পা চালিয়ে দি—পরিচয়ের ইচ্ছাটি প্রবল হয়ে ওঠে। দেখলাম চলতে চলতে ওঁরা একটি দোকানে ঢুকে পড়েন, বুঝলাম এটি চায়ের দোকান। আমিও এসে যাই আর বিনা বাক্যব্যয়ে দোকানে ঢুকে পড়ি। উদ্দেশ্য,—আলাপ ও সেই সূত্রে তথ্যসংগ্রহ; অবশ্য তথ্যসংগ্রহটুকু যদি যোগাযোগের খাতায় থাকে।

দুটি মূর্ত্তিই বাঙালী...আবিষ্কারের আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠি। চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিতে দিতে পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হই আমরা। একজন আর একজনের গুরুভাই, দু'জনেই উত্তরকাশীবাসী। সংসার ত্যাগ করেছেন এঁরা, বৈরাগ্যকে জীবনের সারবস্তু বলে গ্রহণ করেছেন। যার জন্যে আমার ঐকান্তিক আগ্রহ সেই অপরিহার্য্য সাধু-প্রসঙ্গ টুক্‌রো কথাবার্ত্তার মধ্যে চলে আসে। বিমলানন্দ যাঁর নাম তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "কারুর সন্ধান পেলেন?"

উত্তর কাশীর বিষ্ণু দত্তের কথা বলি। শুনেই তিনি চমকে ওঠেন; বলেন, "ঠিক মানুষেরই সন্ধান পেয়েছেন আপনি। তাঁর দেখা পেয়ে আশীর্ব্বাদ নিয়ে যখন আসতে পেরেছেন, তখন কোন ভাবনাই ত আপনার নেই। উত্তরকাশীর ঐ একটি সম্পদ, যাঁর তুলনা নেই··· বাদবাকী সব ভুয়ো, মিথ্যে।"

একটু থেমে বিমলানন্দ বলতে থাকেন, "ঐ বিষ্ণুদত্তের সঙ্গে আর একজন মহাসাধক দিগম্বর সাধু থাকতেন উত্তরকাশীতে—গত বৎসর এলেও দেখা পেতেন তাঁকে। এখন তিনি গঙ্গোত্তরীতে থাকেন। যেখানে ভগীরথ-শিলার নির্দ্দেশ, তার অপর পারে জঙ্গলের মধ্যে তিনি থাকেন। যদি সুকৃতির সঞ্চয় থাকে, তা হ'লেই তাঁর দর্শন মিলবে, নচেৎ নয়। নাম রামানন্দ—বিরাট, বিশাল পুরুষ—হাতে থাকে তাঁর দীর্ঘ যষ্টি। সন্ধান নেবেন!"

বলতে বলতে বিমলানন্দের চোখে-মুখে সুদূরের দৃষ্টি ঘনিয়ে আসে—কিছুক্ষণের জন্যে তিনি থেমে যান—তারপর চরম বোঝাপড়ার ভাব নিয়ে, আমার দিকে স্থির দৃষ্টি মেলে আচমকা জিজ্ঞাসা করেন, "পারবেন যেতে?" কিছু না ভেবেই বলি, "কেন পারব না—!"

একটা অটল বিশ্বাসের সুরে বলতে থাকেন উত্তরকাশীবাসী বিমলা-

নন্দ, "রামানন্দ ছাড়া আরও একজন মহাসাধু সিদ্ধপুরুষ ও অঞ্চলে থাকেন। তাঁর নাম, গঙ্গাদাস। গঙ্গোত্তরী মন্দির ছাড়িয়ে গোমুখের পথেই তিনি থাকেন। যদি ও পথে যান তা হ'লে সঙ্গলাভের চেষ্টা করবেন—জীবন ধন্য হয়ে যাবে। যাত্রী-সাধারণের জন্যে গোমুখের যে চিরন্তন পথ তার উল্টো দিকেই তিনি থাকেন। দুরারোহ দুর্গম সে পথ, তিতিক্ষার চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হ'লে তাঁর দেখা পাবেন না। আমাকে তিনি চেনেন, বলবেন আমার নাম, তা হলেই হবে—।"

একটু থেমে যান বিমলানন্দ, তারপর বলেন, "খুব বড় ঘরের ছেলে তিনি, অল্প বয়সেই সংসার ছেড়েছিলেন…। এদিকে বিষ্ণু দত্ত আর ওদিকে রামানন্দ ও গঙ্গাদাস। গঙ্গোত্তরী মার্গে এই তিন জনই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত ফুটে আছেন…এঁদের তুলনা হয় না।"

বিমলানন্দের মুখে এ কথাগুলো শুনে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠি, তবে কি সত্যিই পেলাম ? তবে কি যোগাযোগের সন্ধিক্ষণ এসে গেল ? বদরিকার মন্দির প্রাঙ্গণে যাঁকে দেখেছিলাম, সেই বালক-সাধু, যিনি আমাকে বলেছিলেন একটি মাত্র কথা…'গঙ্গোত্তরী জানেসে মিল যায়গা'—সেই তিনিই কি ঐ গঙ্গাদাস ? একটা অপূর্ব্ব অনুভূতি মনের ভেতর দাগ কেটে যায়। গত বৎসরের তাঁর দেওয়া ঐ ইঙ্গিতটুকুর জন্যেই ত আমার এই তীর্থ পর্য্যটন, আমার এই মাথা খুঁড়ে মরা! সম্বলপুর মহারাজার একমাত্র সন্তান তিনি—ভগবান তাঁকে সব দিয়েও কিছু দেন নি, তাঁর ঘরের বন্ধন গেছে ঘুচে, মাত্র আট বৎসর বয়সেই সংসার ছেড়ে পরম পুরুষের তত্ত্বে বিলীন হয়ে আছেন। সেই বালকটিই কি ঐ গঙ্গাদাস ? বদরিকায় তাঁকে যে অবস্থায় দেখেছি তা সিদ্ধির চরম অবস্থা। এও জানি, যোগের পরিপূর্ণ অবস্থায় শরীর পরিবর্ত্তনের অধিকার আসে—তাঁকে ত যোগের চরম অবস্থাতেই দেখে এসেছিলাম!

কাজেই এই গঙ্গাদাস সেই বালকের আর এক রূপান্তর নয় ত! বিমলানন্দ এ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য ক'রে বলেন—'কি হ'ল আপনার ?'

'কিছু না'...ব'লে উঠে পড়ি। ওঁদের প্রণাম জানিয়ে বলি—'আমার মহা উপকার করলেন। আশা করি, তাঁদের দেখা আমি পাব...।' ধরম সিং কখন এসে পড়েছে জানি না। সেও এ সব কথাবার্ত্তা শুনেছে, সেও বাদ যায় না।

এর পর বিপুল একটা গতিবেগ এসে যায় পায়ে। একটা মহা আবিষ্কারের আশায় তীরের মত ছুটতে থাকি গঙ্গোত্তরীর দিকে। তিপ্পান্ন মাইল আমি তিন দিনে শেষ করি ঐ গঙ্গাদাসের জন্যে। বদরিকার সেই বালক সাধু ঐ গঙ্গাদাসের মূর্ত্তি কি না, তার আলোচনা এখানে তোলা থাক, তবে এখানে প্রসঙ্গের সূত্রের ইঙ্গিতটুকুর জন্যে বলে রাখি যে গঙ্গোত্তরী ছুটেছিলাম আমি উল্কার মত একটা চরম প্রাপ্তির আশায়।

অসির সন্ধান পাওয়া গেল উত্তরকাশী থেকে আড়াই মাইলের মাথায়—এখান থেকে মনৌরী সাত মাইল। অতি সুন্দর ও সহজ পথ...যমুনোত্তরীর দিকে এ রকম পথের ঔদার্য্য মাথা খুঁড়লেও মিলবে না। দেওদার অথবা পাইন গাছ আর চোখে পড়ছে না। ধরম সিং জানায়, এদের নাকি সন্ধান পাওয়া যাবে হরশীলা ছাড়ানোর পর। পথে ক্লান্তি নেই ত বটেই—বরঞ্চ তৃপ্তিতে মন ভরে ওঠে। মা গঙ্গাকে সব সময়েই দেখতে দেখতে চলেছি। মনৌরীতে এসে গেলাম একটার আগে। ধর্ম্মশালায় এসে সাময়িক বিশ্রাম, কিছু খেয়ে নেওয়া—তার পর আবার চলা। এই মনৌরী থেকে আঠার মাইল দূরে ডোরিতাল হ্রদ—অসি যেখান থেকে নেমে এসেছেন। শুনেছিলাম হ্রদের আশে-পাশে দু'একজন সিদ্ধ যোগী তপস্যায় মগ্ন হয়ে আছেন।

যাওয়ার ইচ্ছে ছিল ষোলআনা, কিন্তু যেতে পারি নি নানা কারণে। সাধারণ যাত্রীদের এই মনৌরীতে রাত কাটানোর কথা—কেননা এ সব অঞ্চলে ন' মাইল পথ চলেই ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে তারা বিশ্রাম নেয়। যমুনোত্তরীর পথে গাংনানী ছাড়ানোর পর উপায় নেই ব'লে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে চৌদ্দ-পনেরো মাইল একটানা পথ হেঁটে যেতে হয়েছে। এদিকে মা জাহ্নবী তাঁর প্রবাহের ধারে ধারে মানুষকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ দিয়েছেন, তাই ন'মাইল পথ হেঁটেই মানুষ আর চলতে চায় না। বিমলানন্দের সঙ্গে যদি দেখা না হ'ত, তা হলে আমিও মনৌরীতে থেকে যেতাম। কিন্তু আমার থামার উপায় নেই—অবিশ্রান্ত আমাকে ছুটতে হবে গঙ্গাদাসের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবার জন্যে। এখানে একটা দিনের ক্ষতি মানে একটা বৎসরের ক্ষতি।

তাই মনৌরীতে থামা হয় না আমার—এখানে নামমাত্র বিশ্রামই জোটে শুধু···।

মনৌরীর পর মাল্লা, ভাটোয়ারীর আগে অখ্যাত একটি চটি। স্থানের জৌলুস না থাকলেও এখানকার ঐতিহাসিক মূল্য আছে। গঙ্গা এখান থেকে বিস্তৃত এক স্থান নিয়ে বেষ্টনীর আকারে পূর্ব্ব দিকে বয়ে গেছেন। মাল্লার যে অংশকে নিয়ে প্রবাহের গতিপথ—তার দক্ষিণ কোণ ঘেঁষে একটি পথ সীমন্তিনীর সিঁথিরেখার মত চলে গেছে—এ পথ হ'ল কেদারের পথ, অর্থাৎ এই পথই বিখ্যাত পাওয়ালীর চড়াই পেরিয়ে ত্রিযুগীনারায়ণে গিয়ে মিশেছে : গঙ্গোত্তরী ফেরতা কেদারবদরী যাত্রীরা এই পথ ধরেই চলে যায়—উত্তরকাশীর দিকে তারা আর আসে না। পথটি যেন রহস্যময় হাতছানি দিয়ে পাহাড়-পর্ব্বতে অদৃশ্য হয়ে গেছে···দূর থেকে এ পথকে দেখে আমার গতবছরের বদরিকেদারের জ্বলজ্বলে ছবিটা আবার মনে পড়ে গেল।

ভাটোয়ারীতে এসে যাই বিকেলের আগেই। ধর্ম্মশালা একটি নয়, দুটি—আর দুটিতেই স্থানসঙ্কুলানের যথেষ্ট সুবিধা—একটিকে বেছে নিই। একটি নিভৃত বারান্দা আবিষ্কৃত হয়, যেখানে যাত্রীদের হৈ চৈ নেই। দোতলার ওপর বারান্দা—সামনেই কুড়ি-বাইশ হাত দূরে গঙ্গা, চত্বরের ওপর একটি অশ্বত্থ গাছের মনোরম লতাপাতার সমারোহ —ধরম সিং এখানেই বিছানাটাকে ছড়িয়ে দেয়। অবহেলিত ধর্ম্মশালার এ বারান্দার নিভৃতিটুকু যেন আমার জন্যই তৈরি হয়েছিল...ঘরের সুযোগ সুবিধা এর কাছে নগণ্য হয়ে ওঠে। এখানে শুয়ে শুয়েই প্রবাহিণীকে সমস্ত রাত ধরে দেখা যায়।

আজ ষোল মাইল পথ হেঁটেছি—কি করে যে হেঁটে এলাম তা আমি নিজেই জানি না। বিস্তীর্ণ এক ভূভাগ অতিক্রম হ'য়ে গেছে—মনে হয়েছে এক রাজ্য পেরিয়ে আর এক রাজ্যে ছুটে এলাম। যাত্রিক জীবনে অন্ততঃ এ অঞ্চলে এই ষোল মাইলের হিসাবই দীর্ঘতম—এত পথ যে হাঁটতে হয় জানতাম না। উত্তরকাশীর পথপ্রান্তে বিমলানন্দ কি যে কলকাঠি নেড়ে দিলেন বুঝি না, যার ফলে কেমন যেন রূপান্তরিত হয়ে গেলাম আমি, এই দীর্ঘ পথের হিসেব আমার কাছে তাই হিসেব বলে মনে হয় না : মনে হয় এখানে না থেমে আরো এগিয়ে গেলে ভাল হ'ত।

চুপ করে পড়ে থাকি, আর একমাত্র সম্বল জপের মন্ত্রটিকে মনের ভেতর আঁকড়ে ধরি। ধরম সিংকে বলে দিয়েছি যত তাড়াতাড়ি পারে সে যেন রান্নাবান্নাগুলো সেরে নেয়; আজকে কোথাও আমার যাওয়ার নেই।...কাজের ভেতর শুধু বারান্দাটুকুকে আশ্রয় করে অনড় অচল হয়ে পড়ে থাকা আর গঙ্গার কলগান শোনা! আজকে মা গঙ্গাকে যত কাছে পেয়েছি, অন্য কোনদিন তা পাই নি।

কেমন যেন শীত শীত ভাব—সামনের অশ্বত্থগাছটার স্তূপীকৃত

ডালপালা নড়ছে...ওদিকে ভাগীরথীর বালুচরের আহ্বান...চুপচাপ পড়ে থাকি।

চোখের সামনে আর একটি ধারাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, সেটি গঙ্গার সঙ্গে এসে মিশেছে। ধারাটি বৃহৎ ও উচ্ছলা, আর তারই পাশ দিয়ে সরু একফালি রাস্তা গঙ্গার অপর তীরে বিরাট বিরাট পাহাড়-গুলোতে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ধরম সিং বলে দেয় ঐ একফালি রাস্তাটাই সগরুর রাস্তা, আর ঐ ধারাটি সগরু থেকে নেমে এসেছে। যে পথটিকে দেখা যাচ্ছে তাঁর পরিচয় সামান্য, ঐরাবত পাহাড়গুলোর অর্দ্ধেক অবয়বের ভেতরেই সে পরিচয় গেছে হারিয়ে—সগরুতে পৌঁছতে গেলে বনজঙ্গল ভেঙ্গে পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙোতে হয়। উপরে তুষারভূমি ও গোটা তীর্থের ঐতিহ্য জনমানবতার অন্তহীন নৈঃশব্দ্যের ভেতর গড়ে উঠেছে। ধরম সিং অনেকক্ষণ ধরে সগরুর গল্প করে, কেননা ও তীর্থের সাক্ষী সে নিজেই। নানা কথাবার্ত্তার ভেতর দিয়ে ধরম সিং সেই ইচ্ছারই পুনরাবৃত্তি করে—উত্তরকাশী ফিরে তার গ্রামের সেই সাধুটিকে সঙ্গে করে যেন একবার সগরু যাই—বাহক হিসেবে সেও বাদ যায় না।

কিন্তু···এই কিন্তুটাই বড় হয়ে রয়ে গেছে। আমার যাওয়া হয় নি···। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা বাজতেই ভাটোয়ারীর ধর্ম্মশালা নিথর হয়ে আসে, যাত্রীকোলাহল থেমে যায়, নেমে আসে পাহাড়ী তমিস্রা, যা হাত বাড়ালে ছোঁয়া যায় যেন। ধর্ম্মশালায় কোনরকমে পৌঁছে ডাল ও রুটি পাকিয়ে নেওয়া, তারপর এক লোটা জল গলাধঃকরণ করা...খানিকক্ষণ বাসন মাজার ঘষ্ ঘষ্ আওয়াজ, তারপর একছুটে কম্বলের তলায় আশ্রয় নেওয়া। শুয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ সুখদুঃখের কথাবার্ত্তার মৌতাত, আগামীকালের অনাগত চড়াই-উতরাইয়ের জল্পনাকল্পনা, তারপরই

কম্বলের ভেতর নাসিকাগর্জ্জন...উনত্রিশটা দিন ত এই দেখতে দেখতেই কেটে গেল! মানুষের এ ভগ্নাংশকে এখানে চেনাও যায় না, বোঝাও যায় না—এ যেন অপাংক্তেয় এক গোষ্ঠীসমাজের ছেঁড়া পাতা দমকা হাওয়ায় উড়তে উড়তে চলেছে। যাদের দেখতে দেখতে বড় হয়েছি—এরা যেন তাদের সগোত্র নয়। যন্ত্রের অনিবার্য্য পাকের মত ন' দশ মাইলের একটা পাক—তারপর সে গ্রন্থির ভেতর একটু আলগাভাবের সমন্বয়—তারপরেই প্রবহমাণ ধারার পাকের ভেতর আবার জড়িয়ে পড়া—না আছে বৈচিত্র্য, না আছে জীবনের উত্তাপ! মানুষ এখানেও সবকিছু বাঁচিয়ে চলেছে, তার মুষ্টি থেকে খসে পড়ছে না একটি কণা। যেটুকু আধ্যাত্মিক সঞ্চয়, তার মেয়াদই বা কতটুকু? শুধু স্থানবিশেষের দৌলতে একটু যা শিহরণ, একটু অসীমকে বোঝার তখনই যা একটু প্রয়াস। তারপর আবার সেই পথ, আর সেই ফেলে আসা সংসারের মায়া ও গ্লানির স্তূপে আবদ্ধ হয়ে যাওয়া। এই দেখতে দেখতে চলেছি আজ উনত্রিশটা দিন ও রাত। রাত আটটাও বাজল, ভাটোয়ারীর ধর্ম্মশালাও নিস্তব্ধ নিথর হয়ে এল। কেবল ছল ছল করে জাহ্নবীর জল, সামনেই অশ্বত্থবৃক্ষের সুনিবিড় স্তব্ধতা–ওপারের বালুচরে আদিম পাহাড়গুলোর অতন্দ্র প্রহর গোনা···আমি শুধু জেগে থাকি।

সকাল হয়ে যায়—পথের প্রান্তে আবার নেমে আসি। এবার গাংনানী, একটানা ন' মাইলের মাথায় ও স্থানটির সন্ধান পাওয়া যাবে, তার আগে মাথা খুঁড়লেও জায়গা মিলবে না। এবার সুরু হ'ল বন্ধুর ও অসমান পথ। উত্তরকাশী থেকে ভাটোয়ারী পর্য্যন্ত যে ভাবে চলে এসেছি, এখান থেকে তার বিরতি, আর এ কতকটা চলল গঙ্গোত্তরীর মন্দির পর্য্যন্ত। আমরা যে আর একটি মহাতীর্থের সান্নিধ্যে এসে যাচ্ছি—পথের এ রূপ পরিবর্ত্তন তারই ইঙ্গিত।

॥ নয় ॥

পতিতপাবনী মা গঙ্গা আবার বাঁদিকে এলেন—ডানদিকের গতিপথের হ'ল পরিবর্ত্তন। তপস্বিনী মাকে ভাটোয়ারী পর্য্যন্ত যে ভাবে দেখেছি, তার মধ্যে ক্ষমাই ছিল বেশী, অর্থাৎ প্রবাহের না ছিল বেগ, না ছিল তার উচ্ছ্বাসের আকুলতা। দু'এক মাইল আসার পর দেখা গেল সেই ক্ষমার ভেতর কেমন যেন রুদ্ধ আক্রোশ ফুটে উঠছে, প্রবাহের বেগ যাচ্ছে বেড়ে। বড় বড় পাথরের স্তূপ গঙ্গার বুকের উপর দিয়ে গড়িয়ে যেতে দেখছি—মনে হচ্ছে মা যেন হঠাৎ চণ্ডিকা হয়ে উঠেছেন অকারণে। এই মূর্ত্তির চরম প্রকাশ ক্রমশঃ ক্রমশঃ দেখেছি যত মুল ধারার সন্ধানে পথ চলেছি, যাত্রার লক্ষ্য যত ছোট হয়ে এসেছে। গৈরিক রঙের ভেতর দিয়ে বৈরাগ্যের যে চিরন্তন আহ্বান তার যোল আনা বজায় থাকলেও মা জাহ্নবীর বুকের ভেতর কে যেন ডমরু বাজিয়ে দিয়েছে, তাই এ প্রবাহের দু'কূল ছাপানো ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি।

ধ্যানের ভৈতর দিয়েই পথ চলা যেন : এ ধ্যানের মূলে জপের যে যোগসূত্র তা জোর করে আনা নয়, এ পথের ভেতর এমন দৈবভাব যে সবকিছুই নিঃশব্দে মনের ভেতর বাসা বেঁধে ফেলে। নিস্তব্ধ পথ—বিজন পাহাড়পর্ব্বত—মনে হচ্ছে এ অঞ্চলের এই পথের প্রান্তে যুগ-যুগান্তরের আমিই একমাত্র সাক্ষী হয়ে চলেছি, বিশ্বে আর কেউ নেই—আমিই একা। সৃষ্টির মন্থনভূত চিরন্তন আমি এক তীর্থপথযাত্রী, আর কেউ কোনকালে আসে নি এ পথে।

পথের সম্পদ আর নির্জ্জনতার অর্থ খুঁজতে খুঁজতে ছ'মাইল

পেরিয়ে যাই, এই পথটুকু মোহাবিষ্টের মত চলা, কেমন করে যে এই দীর্ঘ পথ নিঃশেষ হয়ে আসে বুঝি না। যমুনোত্তরী মার্গে এইরকম ভাবে চলেছিলাম—যমুনাচটির পর এ অঞ্চলে এই আচ্ছন্ন ভাবটি সুরু হ'ল ভাটোয়ারীর পর থেকে আর এই ভাবটি সার্থক রূপ নেয় গঙ্গোত্তরী মন্দিরের আবহাওয়ার পরিবেশে ও সেই সার্থকতার চরম অবস্থা গোমুখের পথে। আমরা যে আর একটি সব চাওয়ার মণিকর্ণিকার কাছাকাছি এসে গেছি—এই আচ্ছন্ন ভাবটিই তার প্রমাণ।

গাংনানির আগে দুটি ধারা পেরিয়ে যাই, কোনখান থেকে কি ভাবে নেমে এসেছে, আর কি ওদের নাম জানি না। শুধু বুঝি ওদের শক্তিরূপিণীর মধ্যে আত্মবিসর্জ্জনের ভাব, এ অঞ্চলে সব ধারাই ত গঙ্গাতে মিশেছে। এক মাইল পথ আরো পেরিয়ে যায়—চোখের সামনে ভেসে ওঠে গাংনানীর ঝোলা তারের পুল, দূর থেকে সে দৃশ্যটি নয়নাভিরাম। নীচে গঙ্গার উন্মাদিনীমূর্ত্তি—তার ওপর এই পুল—এক পা এক পা করে সকলকে এগিয়ে যেতে হয়। শঙ্কা জাগে এই ভেবে যে, সামান্য একটু ভুলের জন্যে জীবনের একটা 'এদিক ওদিক' না হয়। সাবধানতার সঙ্গে পুল পেরিয়ে যাই—এসে যাই গাংনানীতে। জনপদের আগেই বিখ্যাত ঋষিকুণ্ড, গরমজলের নর্ত্তন চলেছে একটি গহ্বরকে কেন্দ্র করে। এখানে ঝোলাঝুলি নামিয়ে স্নান সেরে নি। হিমবাহ থেকে নেমে আসা গঙ্গার হিমশীতল প্রবাহের পাশেই এই তপ্তকুণ্ডের সৃষ্টি। মনে হ'ল পথক্লান্ত মুমূর্ষুপ্রায় যাত্রীদের সাময়িক তৃপ্তিদানের জন্যেই ভগবান এ বিস্ময়কর বস্তুটি এখানে সৃষ্টি করে রেখেছেন।

যমুনোত্তরীর পথেও গাংনানী, আবার এদিকেও সেই নামের আর একটি জনপদ। এও ন'মাইলের মাথায়, তাই বিশ্রাম আর রাত্রি-

যাপনের সমুদয় বন্দোবস্ত আছে এখানে। ধর্ম্মশালা আছে, দোকান-পাটও কম নয়, লোকের বাসও প্রচুর। একটি চায়ের দোকানের সামনে খানিক বিশ্রামের অবসর জোটে আমার আর ধরম সিঙের—তারপর আবার এগিয়ে যাই। শক্তি ও সামর্থ্যের যতটুকু সঞ্চয় তার সবকিছু ব্যয় করে চলতে হবে, কেননা যে বেগ রয়েছে মনের ভেতর তার সমাপ্তি হবে গঙ্গোত্তরীতে, এখানে থামা মানেই অমূল্য একটি দিনকে ক্ষয় করে ফেলা। রামানন্দ ও গঙ্গাদাস আমাকে টানছেন—আমার যে থামার উপায় নেই। চার মাইলের মাথায় লোহারীবাগ—মধ্য-হিমালয়ের তথাকথিত নগণ্য ও অনামী চটিবিশেষ, না আছে ঔজ্জ্বল্য, না আছে গাম্ভীর্য্য: দু-চারখানা ঘরবাড়ী, দু'একটি দোকান আর কতকগুলো মান্ধাতার আমলের পাহাড়। তবে নামটি বেশ—লোহারীবাগ। চলার পথেই স্থানটি পেরিয়ে যাই।

এবার সুক্কী—টানা পাঁচ মাইল। পথ সুন্দর, মধ্যে মধ্যে দেওদার বন সুরু হয়েছে, তের মাইল পার হয়ে এলাম, ক্লান্তি থাকলেও পথের ঐন্দ্রজালিক মাদকতা সব মুছে নিচ্ছে, বুঝতেই পারছি না যে এতদূর হেঁটে এলাম। ধরম সিঙেরও ক্লান্তি নেই, সেও চলেছে সমানে: মুখে সেই সরল হাসি। সরু পথের দু'পাশে শুধু পাহাড় আর পাহাড়—চড়াইও নেই বা উতরাইয়ের পরিচয় নেই। মা জাহ্নবী সমানে চলেছেন পাশে পাশে রাজরাজেশ্বরীর মত, তাঁর ডানহাতের উদার আশীর্ব্বাদ আমরা পেয়ে চলেছি সমানে।

বেশ আসছিলাম, কিন্তু সুক্কীর কাছাকাছি এসে বোকার মত দাঁড়িয়ে গেলাম। চলে এসেছি সোজা পথে, মনে করেছিলাম এই ভাবেই চলব, কিন্তু হ'ল না···সামনেই একটি বৃহৎ পাহাড়, এটি টপকাতে হবে, না হ'লে সুক্কী পৌঁছানো যাবে না। পাহাড়ের তলাতেই একটি চায়ের

দোকান, যার পাশ দিয়ে দুটি পথ ওপরে উঠে গেছে—একটি পাকদণ্ডী আর একটা পাহাড়ী চড়াইয়ের পথ। চায়ের দোকানদার বুঝিয়ে দেয় পাকদণ্ডীর পথে নেমে এলে সুবিধে হবে, যাওয়ার সময় তথাকথিত পাহাড়ী চড়াইয়ের পথটি ধরাই বুদ্ধিমানের কাজ। তথাস্তু! আধ ঘণ্টার ওপর দোকানটিতে বসে বসে চা খাই আর বিশ্রাম করি। তারপর সামনের ঐ পাহাড়টিতে হারিয়ে যাই। শোনা গেল তিন মাইলের এই চড়াই।

এ চড়াইটাও বড় কম নয়—অনেক সময়ে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসকে সহজ ও সরল করে নেবার জন্যে পাহাড়ী দেওদারের গায়ে পিঠ দিয়ে বসে পড়তে হয়, এবড়োখেবড়ো পথ। কর্কশ পাহাড়গুলোর বুকে দেওদার ছাড়াও বড় বড় গাছ দেখতে পাই, এগুলো বুনো আখ্‌রোটের গাছ। ঝরনার আভাসমাত্র নেই, সারা পথটুকুতেই নিদারুণ জলকষ্ট। দু'ঘণ্টার ওপর লাগে এই তিন মাইল পথ পার হতে। পাহাড়টার ওপরেই সুক্কী গ্রাম—ধর্ম্মশালা আর বাড়ী ঘরদোর।

এখানেই আজ থাকার কথা, জানতামও তাই, কিন্তু হ'ল না। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে যখন পৌঁছলাম তখন দেখা গেল একমেবাদ্বিতীয়ম এই ধর্ম্মশালাটি সমাগত যাত্রীদের স্থানসঙ্কুলানের পক্ষে নিতান্তই অপরিসর। ছোট ছোট মাত্র চারখানি ঘর—একফালি বারান্দা, লোক গিজগিজ করছে। চেষ্টাচরিত্র করলে থাকলেও থাকা যায়, তবে সে বাসনা পরিত্যাগ করলাম এই ভেবে যে আজকের বিশ্রামটুকু পুরোপুরি হওয়া চাই, অন্যথায় সতের মাইলের পথ চলাটা বিরাট বোঝার মত চেপে শরীরের সামর্থ্যকে নিঃশেষ করে ফেলবে। খবর সংগ্রহ করল ধরম সিং যে দু' মাইলের মাথায় ঝালা, ওখানে ভিড় নেই, আরামে থাকা যাবে। সেই ভাল—ত্বরিতপদে নেমে এলাম এখানে। গঙ্গা-

বিধৌত ঝালা, অদ্ভুত নির্জ্জনতা, একটি নগণ্য জনপদ, আশ্রয় মিলে যায় এখানে।

সকাল থেকে হাঁটা সুরু করে বিকেল নাগাদ ঝালায় এসে যাই, গাংনানীতে রাত্রে থাকার কথা, থাকি নি – মনের বেগই বড় হয়ে গেছে। যা ভাবা যায় না, তাই হয়ে গেল। কোথা থেকে যে শক্তি এল, কে শক্তি যোগাল, তার চুলচেরা হিসেব এখানে বৃথা। বুঝলাম, বেগই বড় আর সে বেগের ভেতর যদি যোগাযোগের ইঙ্গিত থাকে। অনুভূতির ভেতর এই উপলব্ধিটি থেকে যাচ্ছে যে গঙ্গোত্তরীর রহস্যময় অঞ্চল থেকে কে যেন জাল ফেলে দিয়েছে, আমি তাতে অসহায়ের মত আটকা পড়েছি। কাছিতে পড়েছে টান—তাই এই বেগ, তাই এ ছোটা!

ঝালার ধর্ম্মশালায় একজনের সঙ্গে আলাপ হয়, ইনি একজন ডাক্তার। মন্দির খোলার আগে এসেছেন আর থাকবেন যতদিন না তার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাত্রীদের পুণ্য অর্জ্জনে ভাটা পড়ে। সামনেই প্রাকৃতিক এক বিরাট বাধা, এই বাধা অতিক্রমের চেষ্টায় যাত্রীদের বিপদ আছে, ভয় আছে—তাই এখানে এই ডাক্তারটির অবস্থিতি। হাত-পা ভেঙে বা মাথা ফেটে যাতে একটা বিভ্রাট না বাধে তার জন্যেই সরকার এঁকে এখানে মোতায়েন রেখেছেন। বেশ মানুষটি, বয়সে তরুণ—আলাপ হয়।

বাধার মত বাধা। গঙ্গার বিস্তীর্ণ বালুশয্যা ধু ধু করছে, মূল ধারাকে দেখা যায় না, শুধু বালি আর বালি। ঝালা ধর্ম্মশালার পেছনের স্তূপীকৃত পাহাড়গুলো থেকে নেমে এসেছে একটি বৃহৎ ধারা, কি নাম কে জানে। নদী আখ্যা তাকে না দেওয়া গেলেও ধারাটি প্রচণ্ড বেগবতী আর তার বৈশিষ্ট্যও বড় কম নয়। চোখের সামনেই যে বিস্তীর্ণ বালুশয্যা তাতে ঐ ধারাটি মিশেছে বিরাট বাধার

সৃষ্টি করে, তাকে অতিক্রম করে ওপারে গিয়ে ওঠাটা যাত্রীর কাছে একটি মরণ-বাঁচনের প্রশ্ন। ধারাটি আবার স্থানবিশেষে একটি প্রবাহ নিয়ে গঙ্গায় মেশে নি—বহুধাবিভক্ত হয়েই তার অবলুপ্তি। কি প্রচণ্ড বেগ এই প্রবাহসমূহের। গভীরতা বেশী নেই, হেঁটেই পার হতে হয় —পুল তৈরীর কথা কল্পনাও করা যায় না এখানে।

ঝালায় রাত কাটল, সকাল হ'ল আর যাত্রাও সুরু হ'ল আবার। গোটা বিকেল আর সন্ধ্যার আগে পর্য্যন্ত ধর্ম্মশালায় বসে বসে ভেবেছি কালকের এই পার হওয়ার ব্যাপারটি ভালোয় ভালোয় কেটে গেলে হয়। ডাক্তারটির কাছে খবর পাওয়া গেল আগের দিনে একটি বৃদ্ধা ভেসে গিয়েছেন খরস্রোতের আবর্ত্তে পড়ে, তাঁর দেহ কোথায় যে চলে গেছে কেউ জানে না। সকালের দিকে কাঠ পেতে যাতায়াতের বিপদকে কমানোর চেষ্টা করলেও বিকেলে তা কোথায় যে হারিয়ে যায় তা বোঝার উপায় নেই। গঙ্গার জোয়ার ভাটার সঙ্গে এই প্রবাহের হ্রাসবৃদ্ধির সম্পর্ক আছে, তাই মানুষের চেষ্টা বৃথা।

আর বৃথা বলেই ভগবানকে স্মরণ করে আমি আর ধরম সিং এই বালুচরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। বেরুতে বেলা হয়ে গেছে আমাদের, সূর্য্যদেব আকাশের ওপর অনেকটা উঠে পড়েছেন যেন। জুতো খুলে নিই, এটি এখান থেকেই পরিত্যাজ্য।

ঠিক এ ধরনের পরীক্ষা গঙ্গোত্তরীর পথে অন্য কোথাও নেই—চড়াই-উতরাই বা পাহাড়ের ভ্রূকুটি, এ সবের অর্থ বুঝতে পারা যায়—মানুষ একরকম তাদের মেনে নিতে পেরেছে কিন্তু এবারে যে বাধাটির সম্মুখীন হওয়া গেল তার দম্ভ এত বেশী যে, ভয় হয় ওপারে আস্ত শরীরটা নিয়ে ওঠা যাবে কিনা। এপার থেকেই দেখা গেল যে সব যাত্রী ইতিমধ্যেই এই কয়েকটি ধারা পেরিয়ে ওপারে গিয়ে উঠেছে,

তারা আনন্দের বা বিপদ কেটে যাওয়ার উচ্ছ্বাসকে কাটাতে পারে নি —দেখলাম বালির ওপর হাঁড়িকুঁড়ি বসিয়ে রান্নাবান্না চাপিয়ে দিয়েছে তারা। আনন্দ প্রকাশের এ এক অভিনব দৃশ্য।

কি অসম্ভব কনকনে ঠাণ্ডা জল—পা দিতেই মনে হ'ল পা দুটোকে কে যেন কেটে নিল। হাঁটুর ওপর জলের ঊর্দ্ধগতি, কিন্তু তা হলে কি হয়, দুর্ব্বার গতিতে সে বয়ে চলেছে···পা দুটোকে ঠিক রাখা মুস্কিল। জলের প্রচণ্ড গতির মধ্যে বড় বড় পাথর, ন্যূনতম এই বাধাতেই জলের সে কি উচ্ছ্বাস! কোনরকমে পেরিয়ে যাই শরীরের সমস্ত শক্তিকে সংহত করে—ভগবানের দয়ায় বেঁচে যাই, বিপদ ঘটে না। এক একটি ধারা আর খানিকটা বালির 'বেড়', তারপর আর একটি ধারা ও বালির প্রান্তর। শেষ ধারাটি উত্তীর্ণ হওয়ার সময় আচমকা একটা হৈ হৈ ওঠে, দাঁড়িয়ে যাই। দেখি হড়হড় গড়গড় করে একটা বিরাট পাথরের স্তূপ জলের স্রোতের ভেতর আছাড় খেতে খেতে বেরিয়ে গেল। কোথা থেকে পাহাড় ধ্বসেছে কে জানে—চোখের সামনে দিয়ে সেটা নিচুর দিকে চলে গেল। ওপারে গিয়ে যখন উঠি—তখন মনে হ'ল পা দুটোর আর অস্তিত্ব নেই, সম্পূর্ণ অবশ হয়ে গেছে। ডবল গরম মোজা আর জুতোর মাধ্যমে পায়ের রক্তচলাচলকে ফিরিয়ে আনতে হয়।

বিপদের শেষে সেই পরম সান্ত্বনা···অর্থাৎ চায়ের দোকান একটি —পরপর দু' কাপ চা খেয়ে তবে ধাতস্থ হই। ধরম সিং এসে যায় মাথায় মোট নিয়ে—এই বোঝা নিয়ে সে কি করে এল সেই জানে।

বিস্তীর্ণ এই বালুচরের এক প্রহেলিকা, এরই পর একটি রাস্তা পাহাড়ের বুকের ওপর উঠে গেছে—এটি পেরিয়ে গেলেই হরশিলা।

স্থান হিসেবে হরশিলার মাহাত্ম্য আছে—গ্রামে প্রবেশের সঙ্গে

সঙ্গেই এ মাহাত্ম্যটুকু মনের ভেতর ধরা পড়ে। এদিকে-ওদিকে ঘর-বাড়ী, লোকজন আর এখানকার লক্ষ্মীনারায়ণের প্রাচীন মন্দির। নারায়ণই হরি—তাই হরশিলা। গ্রামের ভেতর স্থানীয় লোকজন ছাড়াও তিব্বতীদের ছোটবড় দল চোখে পড়ে। এরা ব্যবসায়ী—কম্বল আর পশুর লোম নিয়ে এসেছে নেলাং পাশ হয়ে এদিকে। যাত্রীদের কাছে কিছু কিছু মালপত্র বিক্রী করে তার থেকে যা পায় তাই এদের কাছে যথেষ্ট। চলতে চলতে দেখি আর এদের অপরিচ্ছন্নতা দেখে শিউরে উঠি। ঐ ত পথ আর পথের এদিকে-ওদিকে যা কিছু ঘরবাড়ী; কিন্তু সবকিছুই আকীর্ণ হয়ে গেছে এদের নিক্ষিপ্ত আবর্জ্জনায়। এত সুন্দর গ্রাম অথচ মালিন্যে ভরা। যাযাবরের পর্য্যায়ভুক্ত এরা—আজ এখানে কাল ওখানে, তাই স্থানীয় অধিবাসীদের একমাত্র সান্ত্বনা যে এরা এক দিন চলে যাবে, এদের গায়ের বোটকা গন্ধটা স্থায়ী নয়। তবে যাত্রীদের যাতায়াত যতদিন চলতে থাকে, ততদিন নাকি এরা এখান থেকে নড়তে চায় না।

দু'মাইল—তারপর ধরালী। অপূর্ব্ব স্থান—বিস্তীর্ণ সেই গঙ্গার বালুচরের রহস্যময় হাতছানি—তার ওপারেই কমলীবাবার ধর্ম্মশালা। তার সামনেই গঙ্গার প্রবাহ—অপর পারে মুখবা গ্রাম...গঙ্গোত্তরী মন্দিরের পাণ্ডাদের গ্রাম এটি। মন্দিরের সবকিছু যখন তুষারে ঢেকে যায় তখন এই মুখবা গ্রামে মন্দিরের যাবতীয় জিনিষপত্রের সংস্থান। ধর্ম্মশালাটি বড় ভাল লাগে—এ রকমটি ঠিক এই রহস্যময় বালুচরের ভেতর অন্য কোথাও পাই নি। এখানেই মধ্যাহ্নের আহার সমাপন—একটু উপরে দুটি ছোট ছোট শিব-মন্দির, দর্শন করতে ভুলি না।

গঙ্গার যে বালিয়াড়ী ঝালা থেকে সুরু, তার পরিসমাপ্তি ধরালীতে। মূল ধারা ছাড়া আরও অগণিত ধারা এসে মিশেছে গঙ্গায়...তিনিই

আদি, তাই কারুর সম্পূর্ণ প্রবাহিণীর রূপ এখানে নেই···ছোট বড় সকলকেই তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। ধরালীর পর থেকে গঙ্গা কেন্দ্রীভূত হয়ে এসেছেন—বালুচরের এই উদার আহ্বান আর নেই। এরপর থেকে জাহ্নবীর যে রূপ তাকেই মাতৃস্বরূপিনীর প্রকৃত রূপ বলা চলে। গঙ্গোত্তরীর আর দেরী নেই, গোমুখও অদূরবর্ত্তী। ধরালী থেকে গঙ্গোত্তরী আর সেখান থেকে গোমুখ—এই কয়েক মাইলের ব্যবধানের মধ্যে তপস্বিনী মা বয়ে এসেছেন সম্পূর্ণতার সজ্জা নিয়ে। মা এই ধরালীর পর থেকে মহীয়সীর রূপ নিয়ে উপর থেকে নেমে এসেছেন।

আজকেই গঙ্গোত্তরী পৌঁছব—আজকেই আর একটি মহাতীর্থের আশ্রয়ে জীবন সার্থক করা। যমুনোত্তরী শেষ হয়ে গেছে—গঙ্গোত্তরীও সমাপ্তির পথে। ধরালীর পর জঙ্গলা—তারপর ভৈরবঘাটির বিখ্যাত চড়াই—তারপর ছ' মাইলের পথ, তারপরেই ভগীরথের গঙ্গোত্তরী—পুরাকালের আর একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের উদ্‌ঘাটন। স্বপ্নের ভেতর ছিল যমুনোত্তরী ও গঙ্গোত্তরী, একটিকে দেখে জীবনের সাধ ও আকাঙ্ক্ষার অঞ্জলি গেছে ভরে—আর একটিও এল···আর দেরী নেই। কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি কানে···মায়ের আরতি দেখার আর দেরী নেই···।

॥ দশ ॥

ধরালীও ছাড়াল আর দেওদারও সুরু হ'ল···ঘন ঘাসে ছাওয়া পথের উপর পাতার ছায়া পড়েছে···মধ্যাহ্নের আলোতেও কেমন যেন আলো-আঁধারির সংমিশ্রণ। এই দেওদারের নিরবিচ্ছিন্ন সমারোহ গঙ্গোত্তরী পথের এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি···এ পথ দিয়ে যাঁরা হেঁটে যাবেন তাঁদের উপলব্ধিতে এই সত্যটাই ধরা পড়বে যে এই দেওদারশ্রেণীরও আধ্যাত্মিক সঞ্চয়ের দান বড় কম নয়···মনে হয় মূক এরা নয় কোন-কালেই, পুণ্যকামী যাত্রীদের এরা পাতার আস্তরণ দিয়ে নিঃশব্দ আশীর্ব্বাদের ছায়া দিয়ে চলেছে। মহীরুহেরও যে ভাষা আছে, তার বিশেষণ ও রূপ আছে তা বোঝা যায় এই ধরালীর পর। যমুনোত্তরীর পথে পাইনের সমারোহ—এখানে দেওদার, আর এ চলল গোমুখের আগে ভুজবাসা পর্য্যন্ত। তিন মাইলের মাথায় জঙ্গলায় এসে গেলাম ছায়াচ্ছন্ন পথ দিয়ে, নেশায় বিভোর হয়ে। এ পথটুকু ভোলার নয়, এর স্মৃতি মনের ভেতর ছাপ রাখে। পাখী ডাকছে দেওদারের মাথায়—নির্জ্জনতার মধ্যে ওরাই যা বাস্তবের রূপ, এ ছাড়া পৃথিবী স্তব্ধ হয়ে গেছে। পায়ের তলায় নরম পাতার আস্তরণ—সোজা পথটুকু—কতকটা আচ্ছন্ন অবস্থায় এসে গেলাম জঙ্গলায়···গঙ্গোত্তরী পথের এক অনামী চটি এটি। সামনেই গঙ্গার অনন্ত প্রবাহ ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে অসংখ্য পাথরের গায়ে উচ্ছ্বাস জাগিয়ে ধরাতলে ছুটে চলেছেন। প্রবাহের সামনেই ছোট্ট একটি দোকান আর এই দোকান মানেই চটি। এখানে দেওদারের ছায়ায় বসে চা খাওয়ার যে তৃপ্তি তা ভুলব না কোনদিন।

ভৈরবঘাটি এখানেও—যমুনোত্তরীর আগে ভৈরবঘাটির চড়াই এখনও মনে আছে। সে চড়াইটা ভয়ঙ্কর—এ চড়াইটারও কথা ঝালার পর থেকে হরদম শুনে আসছি। প্রকৃতপক্ষে জঙ্গলায় ভাগীরথী অতিক্রমের পর ভৈরবঘাটির চড়াই সুরু হয়ে গেল। মাত্র দু' মাইল চড়াইয়ের সামান্য ইতরবিশেষ—অর্থাৎ, এই দু'মাইলই মানুষকে সান্ত্বনার আভাস দেয়—এর পর যে চড়াই তাতে সান্ত্বনার লেশমাত্র নেই।

চলার পথে জাঠ গঙ্গা এসে মিশেছেন জাহ্নবীতে। নেলাং পাশের দূরদূরান্তে জাঠ গঙ্গার জন্ম তিব্বতের হিমবাহ থেকে, তার সঙ্গম এই ভাগীরথীতে—এখানে দুটি ধারার সংঘাতের উন্মত্ততার যে ভয়ঙ্কর রূপ তাও ভুলবার নয়। লড়াই বেধেছে যেন। এই সংঘর্ষে যে প্রচণ্ড ধ্বনির উৎপত্তি—পাহাড়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার প্রতিধ্বনির এক নাটকীয় পরিস্থিতির রূপটি বুঝা যায়। এই সঙ্গমের উপর একটি লোহার পুল, সেটি পেরুলেই ভৈরবঘাটির দণ্ডবৎ চড়াই-এর সুরু।

পুলটি পেরিয়ে যেতে যেতে উর্দ্ধাকাশে চোখে পড়ল একটি পাহাড়ের শীর্ষদেশ থেকে দুটি বৃহদাকার দড়ির পুলের ভগ্নাংশ জাঠ গঙ্গার অপর পাড়ে আর একটি পাহাড়ের চূড়ায় ঝোলা অবস্থায় শূন্যে দোদুল্যমান···শোনা গেল বহু বৎসর আগে ঐ পুলের উপর দিয়েই যাত্রীসাধারণের যাতায়াতের পথ ছিল। জঙ্গলার পাশ দিয়ে সরু একটি পাকদণ্ডী পথ···এখন সে পথও নেই, সে পুলও নেই, কেবলমাত্র ইতিহাসের অমোঘ স্বাক্ষরের মত ও দুটি দড়া শূন্যে ঝুলে আছে। আজকের পথের বহু উর্দ্ধে ও পুলটির অস্তিত্ব—সঙ্গমের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে কি রকম যেন মনে হয় উপর দিকে তাকাতে। ঐ খাড়াই পাহাড়, তার উপর প্রাচীন যাত্রাপথের এক ছেঁড়া পাতা যেন হাওয়ায় দুলছে।

যমুনোত্তরীর পথে জানকীমাঈ চটি ছাড়বার পর ভৈরবঘাটির চড়াইটা যেমন আচমকা সামনে এসে দাঁড়ায়—গঙ্গোত্তরীর পথে এ ভৈরবঘাটির চড়াইটা ঠিক সে রকম নয়। সঙ্গম পেরিয়ে যাই—ভাগীরথী বামে এসে পড়েন। সঙ্গমের পর কিছু দূরে একটি বার্ত্তা-ফলক, তাতে লেখা আছে 'রোড টু নেলাং'—হরশিলায় যে তিব্বতীদের দেখে এসেছি তাদের আসা এই পথ দিয়ে। একটি সরু সীমন্ত-রেখার মত রাস্তা জাটগঙ্গার ধার বরাবর লামাদের দেশে চলে গেছে, দূর থেকে সেই পথের হাতছানি ক্ষণিকের জন্যে মনকে উন্মনা করে তোলে। এই বার্ত্তাফলকও পেরিয়ে এসে পড়লাম আসল ভৈরবঘাটির চড়াইয়ের মুখে।

এই চড়াই প্রসিদ্ধ চড়াই—দেয়ালের গায়ে লাঠিকে দাঁড় করিয়ে তা দিয়ে সরাসরি উঠে যাওয়াও যা, আমাদের সামনে ভৈরবঘাটির উপরে উঠে যাওয়াও তাই!

তবে ভগবানের রূপ যেমন দুর্য্যোগের ঘনঘটার মধ্যে তেমনি তাঁর রূপে ত বরাভয়ও আছে—সেই ত সান্ত্বনা, সেই ত মানুষের সকল দুর্গতিকে এড়িয়ে যাওয়ার একমাত্র সম্বল। মানুষকে যেমন জাল ফেলে জড়িয়েছেন তেমনি তার থেকে মুক্তির পথও খোলা রেখেছেন তিনি। তা না হলে এ সব চড়াই, এ সব বাধা আমরা পেরিয়ে যেতাম কি করে? দুর্ঘটনার সম্ভাবনা যেখানে প্রতি পদে পদে, বুকের রক্ত জল হওয়ার আশঙ্কা যেখানে ব্যাপক, সেখানে কৈ দুর্ঘটনা ত ঘটে না! চড়াইয়ের বাধাও ত পেরিয়ে যাই। যাত্রীদের ভেতর প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর স্পর্দ্ধা এবং দুঃসাহস কোথা থেকে যে এসে যায়, বোঝা যায় না, অনুভূতির সবটুকু দিয়ে বোঝা যায় যে বিধাতাপুরুষ বিপদের পর স্বর্গ, যুদ্ধের পর জয়মাল্যের পুষ্পসম্ভারের সন্ধান দিয়েছেন তীর্থকামী পুণ্য লোভাতুর মানুষদের।

তাই যেমন করে বুকে হেঁটে যমুনোত্তরীর ভৈরবঘাটি পেরিয়েছিলাম তেমনি কখনও বসে, কখনও হামাগুড়ি দিয়ে, ভৈরবঘাটি পাহাড়ের উপরে গিয়ে উঠি। তিন মাইলের এই ভয়াবহ চড়াই অতিক্রম করতে আর এক দফা চরম পরীক্ষা দিতে হয়। মা গঙ্গার আশীর্ব্বাদে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই···শেষ হয়ে যায় চড়াই। আমাদের আশা সফল হয়। তীর্থযাত্রাকে উপলক্ষ্য করে পুণ্যসঞ্চয়ের ঝাঁপিতে সঞ্চয় স্তূপীকৃত হয়ে ওঠে।

চড়াই ভেঙে এই প্রসিদ্ধ পাহাড়টির উপর যখন উঠলাম তখন মনে হ'ল, যাক্—এসে গেছি—ভয় নেই আর! ঝালা থেকে যখন রওনা হই তখন মনে সঙ্কল্প ছিল, একটানা হেঁটে ভৈরবঘাটিতে গিয়ে উঠব, আর সেখানেই রাত্রিটা কাটাব। ভৈরবঘাটির অদ্ভুত নির্জ্জনতার কথা যেন কোন বইয়ে পড়েছিলাম, তাই ইচ্ছে ছিল যদি স্থান সঙ্কুলান হয়, তা হলে সেই নির্জ্জনতার ছবিকে আমিও গ্রহণ করব সমস্ত অন্তর দিয়ে, তাই ভৈরবঘাটির আকর্ষণ বড় কম ছিল না। কিন্তু উপরে উঠে এসে দেখি রাত্রিবাসের কোন ন্যূনতম আয়োজনও নেই। চটি নেই—অর্থাৎ যা আছে তাকে বলা চলে চটির ছায়ামাত্র। এক ফালি টিনের তলায় সঙ্কীর্ণ আশ্রয়টুকুতে মাথা গুঁজে থাকার কল্পনা বৃথা।., এটি ছাড়া টিমটিমে চায়ের দোকান একটি চোখে পড়ে...চা ছাড়া গরম দুধও এখানে মেলে। আধ ঘণ্টা এখানে বসি।

এখান থেকে গঙ্গোত্তরীর মন্দির ছ'মাইল। একটানা রাস্তা—চলার ভেতর না আছে ক্লান্তি, না আছে অবসাদ...শুধু লম্বা লম্বা পা ফেলে হেঁটে গেলেই হ'ল। সেই দেওদার আর তার পত্রগুচ্ছের স্নিগ্ধ ছায়া...এটুকু পথ যেন উড়তে উড়তে যাওয়া। যমুনোত্তরীর শেষ পথটুকু যেমন গহ্বরের ভেতর ঢুকে গেছে—গঙ্গোত্তরীর আগে এই ছ'

মাইলের ভেতর সে রকম বন্ধুরতার নাম-গন্ধও নেই। চার মাইলের মাথায় পাহাড়ের এক অদ্ভুত রূপ চোখে পড়ে—এ রূপটি প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মা-গঙ্গা দুটি পাহাড়ের পাশ দিয়ে এমন ভাবে বেঁকে চলে গেছেন যে মধ্যেকার বিস্তীর্ণ এক ভূখণ্ড জঙ্ঘার আকার ধারণ করেছে। দূর থেকে দেখলে মানুষের জঙ্ঘাই মনে হবে, অন্য কিছু নয়। গঙ্গার অপর নাম জাহ্নবী...জহ্নু মুনির জঙ্ঘা থেকেই তিনি প্রবহমানা, তাই ঐ নাম। বেশ বোঝা যায়, গঙ্গার মূল প্রবাহ এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে পুরাকালে বয়ে গিয়েছিল—এখন যে ভূখণ্ড পড়ে রয়েছে তাকে অতীত ঐতিহ্যের ছায়া বলা যায়...প্রবাহ অনেক দূর দিয়ে চলে গেলেও জঙ্ঘার পরিচিত আকৃতিটি রেখে গেছে। এখানে অনেকক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যুগযুগান্তের গঙ্গার উৎপত্তির ইতিহাসটি যেন মনের ভেতর ছবির মত ফুটে ওঠে। এ অঞ্চলে প্রত্যেকটি জিনিষের পৃথক সত্তা এই ভূখণ্ডের আশ্চর্য্য রূপটিতে তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পরিস্ফুট। সাদা সাদা পাথরে আকীর্ণ সমগ্র অঞ্চল...এরকম পাথরও কখনও চোখে পড়ে নি আমার।

ছ'মাইলের এই পথও শেষ হয়ে যায়...এসে যাই গঙ্গোত্তরীর তীর্থভূমিতে।

এখানে মানুষের ভিড় অল্প নয়, গঙ্গোত্তরীতে কতকটা শহরের আবহাওয়া—বস্তুতান্ত্রিকতার ছাপ পড়েছে যেন। যমুনোত্তরীতে যে নিরাভরণতা, এখানে তা নেই। তার কারণ সহজবোধ্য—অর্থাৎ, দুর্গম ও দুরূহ পথের প্রকট রূপ যমুনোত্তরীতে যতটা, গঙ্গোত্তরীর পথে তেমনটি নয়। এখানে সেই রূপে কিছুটা প্রকৃতির প্রসন্নতা এসেছে। মানুষ এখানে অকৃপণভাবে এসে জড়ো হয়েছে, পাণ্ডারা ভিড় জমি-

য়েছে...ঘরবাড়ী গড়ে উঠেছে সেই ভাবে। অবশ্য বদরিকার তীর্থ-প্রান্তরে মানুষ ও বস্তুর যে ভিড়, এখানে সেই তুলনায় কিছুই নয়, কিন্তু মনে হয়—এক দিন এ স্থান শ্রীক্ষেত্রের রূপ নেবে। ধর্ম্মশালা একটা নয়, স্থানসঙ্কুলানের প্রশ্নই উঠে না—একটিকে বেছে নিলেই হ'ল। কমলীবাবাই আমাকে স্থান দিয়েছেন সর্ব্বত্র—এখানেও সেই দাতাকর্ণকেই বেছে নিই। গঙ্গোত্তরীতে ঢোকার আগে ধর্ম্মশালা, দোকানপাট ইত্যাদি···তার পর ভাগীরথী-চুম্বিত মন্দির—মানুষের কোলাহল থেকে একটু দূরে।

অবশেষে এসে গেলাম ভগীরথের স্মৃতিপূত গঙ্গোত্তরীতে...লাঠির ওপর ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে। স্বপ্ন হ'ল সার্থক, ইচ্ছা হ'ল পূর্ণ। কোন দিন কি ভেবেছিলাম যে, এক দিন এক দিকে যমুনোত্তরী ও এক দিকে গঙ্গোত্তরীতে আমার পায়ের চিহ্ন পড়বে? কখনও কি ভেবেছিলাম যে জীবনের এই মহান ব্রত উদ্‌যাপনের সুযোগ পাব?

অসম্ভব সম্ভব হ'ল—অসীমকে সীমার মধ্যে পেলাম। অন্য কিছু নয়, সেই একটিমাত্র কথা—যার নাম যোগাযোগ। এটি না এলে জীবনে কোনকিছুই সম্ভব নয়—এর আসা বাঁধভাঙা বন্যার জলের মত···এ অমোঘ, এ অনিবার্য্য। যখন এই যোগাযোগ উপস্থিত হয় না, তখন বুঝতে হবে মাথা খুঁড়ে মরে গেলেও কিছু মিলবে না, মিলবে না কোন দুর্লভ সম্পদ—কূপমণ্ডুকের মত গতানুগতিকতার সাক্ষর দিয়ে চলতে হবে চিরকাল। কিন্তু মানুষ জানে না—মহাব্যোমের মহারহস্যের ভেতর বসে বসে কল-কাঠি নাড়েন এক জন—মানুষ চলে সেই ভাবে। বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে মানুষ বলবে কলকাঠি নাড়ার মালিককে যখন চোখ দিয়ে দেখা যায় না তখন মানার প্রশ্নও ওঠে না···।

কি করে বোঝাই, কি করেই বা এর বিশ্লেষণ করি! যোগাযোগ যে কি—ব্যক্তিবিশেষের জীবনে তার প্রভাব কতখানি তার চুলচেরা হিসেব করি কি করে? কি করে জানাই যে মানুষের জীবনের মালিক মানুষই নয়।

কত চেষ্টা, কত ইচ্ছা করেও আসা হয় নি—গোটা ভারতবর্ষ ঘুরেছি, তার বেলায় কোন বাধা আসে নি, এসেছে মহাতীর্থ পরিক্রমণের ভূমিকায়। বাধার পর বাধা—বন্ধনের পর বন্ধন···কিছুতেই কিছু হয় নি, আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণই থেকে গেছে। শুধু মাথা খুঁড়েছি—পাষাণ-বিগ্রহ পাষাণই থেকে গেছে।

তার পর কোথাও কিছু নয়, ডাক এল। কেদার ডাক দিলেন, সেই সঙ্গে বদরীবিশাল। যে বন্ধনের জন্যে জীবন-ইতিহাসের পাতার পর পাতা শূন্যে অলিখিত হয়ে উড়ে গেছে, তা আচমকা জোড়া লেগে যায়। ভূমিকম্পের কম্পনের মত কি যেন ঘটে গেল। ছুটে গেলাম কেদারনাথের ক্ষেপা ভোলানাথের কাছে, গেলাম বদরিকার সোনার নারায়ণের কাছে। যোগাযোগের সে স্মৃতি আমার আমরণ—বুকের ভেতর তা অশেষ কল্যাণের অধ্যায় হয়ে আছে···।

সেখানে এক মহাইঙ্গিতের স্পর্শলাভ—সে লাভ এমনি যে কাঁধের ওপর বৈরাগ্যের ঝুলি উঠে যায়, সংসার থেকেও থাকে না। সে তীর্থ প্রান্তরে আমার সঞ্চয়ের পুনরাবৃত্তির চেষ্টা এখানে বৃথা।

তারপর একটি বৎসর···। আবার সেই কম্পনের অনুভূতি··· আবার সেই বুক জোড়া তৃষ্ণা···।

ডাক এল আবার নব ইতিহাসের বার্ত্তা নিয়ে। মাঝরাতের উল্কা খসার মত ছুটে এল মহাতীর্থ যমুনোত্তরী ও গঙ্গোত্তরী—জীবনের তীর্থ পরিক্রমা আবার সুরু হয়ে যায় আমার......।

তাই কি করে বোঝাই এ অসম্ভব সম্ভব হওয়ার তত্ত্বকে, কি করেই বা জানাই ডাক না এলে কোনকিছু মানুষের জীবনে সম্ভব নয়।

ধর্ম্মশালায় সুন্দর একটি ঘর মিলল। কাঠের বাড়ী, দোতলার উপর ঘর, সামনে একফালি বারান্দা। বিশ্রামের আশায় চুপচাপ শুয়ে ছিলাম, সামনে দরজাটা খোলা—ধরম সিং অভ্যাসমত চা আনতে গেছে। ভাবছিলাম অনেক কিছু আর সামনের গঙ্গার দিকে চেয়েছিলাম—সামনেই কাঠের ব্রীজ ওপারের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করে রেখেছে, ব্রীজের পরই বালিয়াড়ি ক্রমোচ্চভাবে উঠে গেছে—একটি ছোট্ট কুটির দেখতে পাচ্ছি। হঠাৎ নজরে পড়ল একটি গৈরিকবসনা নারীমূর্ত্তি ঐ কুটীর থেকে বেরিয়ে এসে কাদের সঙ্গে যেন কথাবার্ত্তা বললেন, মনে হ'ল তারা আমারই মত যাত্রী বিশেষ। শুয়ে শুয়ে এপার থেকে পরিষ্কার ভাবেই দেখা যাচ্ছিল সব কিছু। কুটীরটির রং গৈরিক, পটের ওপর ছবির মত আঁকা। কে ঐ নারী? কেনই বা ওরকমভাবে বেরিয়ে এলেন? এলোমেলো চিন্তাগুলোর মধ্যে কিসের একটা তাগিদ এল যেন। বেলা ত এখন চারটে—গঙ্গার ওপারটা একটু ঘুরে এলে মন্দ হয় না, মন্দির দর্শন এখন থাক। চা নিয়ে ঢুকল ধরম সিং। বললাম, "চল, ওপারটা একবার দেখে আসি।"

এর পরে নূতন কাহিনীর সূত্রপাত—এখান থেকেই গঙ্গোত্তরীর সাধুপ্রসঙ্গের সূচনা বলা চলে। ভেবেছিলাম গঙ্গোত্তরী মন্দিরের ও গোমুখের কিছু কিছু বর্ণনা দিয়েই আমার ভ্রমণকাহিনীর উপর যবনিকা টেনে দেব, কিন্তু আদেশ অমোঘ, এ আদেশ লঙ্ঘন করার ক্ষমতা আমার নেই। কার কাছ থেকে এ আদেশ এসেছে, সেকথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। আমি শুধু এই কথাই বলি যে, জানাতে আমাকে হবেঃ মস্তিষ্ককে বিচ্ছিন্ন করে অবয়বের গঠন যেমন চলে না, তেমনি

চলে না এ মহান্ তীর্থের সাধুপ্রসঙ্গকে বাদ দিয়া কেবলমাত্র গঙ্গোত্তরীর ছবি আঁকা। একটির সঙ্গে আর একটি অবিচ্ছেদ্য।

কিন্তু মুশকিল আছে—আর সেই সঙ্গে চিন্তা। এ চিন্তা হ'ল আমার কলম ঠিক উপযুক্ত কিনা—বিশ্লেষণ ও বর্ণনার মর্ম্মস্থলে ঠিক-ভাবে পৌছানো যাবে কিনা। কেননা যাঁদের দেখেছি তাঁরা মহত্তম ও পূর্ণতম—তাঁদের ব্যাখ্যা শুধু কলম ও কালি দিয়ে সম্ভব হবে কিনা তাও চিন্ত্যনীয়। সবকিছুই কি লেখা যায়? সব কিছু কি বোঝান যায়? বোধ হয় যায় না; আর যায় না বলেই 'গুহ্য' বলে কথাটির সৃষ্টি ব্রহ্মতালের পথপ্রান্তে কিংবা খরসালীর সন্নিকটে সেই ফিকে সবুজ সাড়ী-পরা মায়াময়ীর বর্ণনার মত, গঙ্গোত্তরী বা গোমুখের পথের উপর কুড়ানো সম্পদের বর্ণনাও সম্পূর্ণ নয়—আংশিকমাত্র।

ধরম সিং নিল লণ্ঠন, আমি নিলাম টর্চ্চ—উদ্দেশ্য, মন্দিরের আরতি দেখে ধর্ম্মশালায় ফিরব। শীতবস্ত্রগুলোকে গায়ে জড়িয়ে নিই, কেননা শীত এখানে প্রচণ্ড। ধর্ম্মশালা ছাড়িয়ে একটা চায়ের দোকান চোখে পড়ে—এখানে একটু বসি দ্বিতীয় বার চায়ের আশায়। এখানে এক জন দণ্ডীস্বামীর সঙ্গে আলাপ হয়, সবেমাত্র গোমুখ দর্শন করে তিনি ফিরেছেন। এঁর কাছ থেকেই জেনে নিই পথঘাটের খবর, তুষারক্ষেত্রের রূপ, গঙ্গার ঐতিহাসিক প্রবাহের ইতরবিশেষের কথা। ইনি একাই গিয়েছিলেন—সঙ্গে ছিল একমাত্র গাইড, যা এখানে অনায়াসলভ্য। এঁর কথা শুনে গাইড সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। দণ্ডীস্বামী রাজপুতানার সন্ন্যাসী। কথাবার্ত্তার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলেন, বারাণসীতে বিশ্বনাথকে দর্শন না করলে যেমন বারাণসী দর্শন ব্যর্থ, তেমনি গোমুখকে বাদ দিয়ে গঙ্গোত্তরীর মর্ম্মস্থলের রহস্যোদ্ঘাটনও সম্ভব নয়। বললেন, যে সব যাত্রী কেবলমাত্র দুর্গমতার ভয়ে গোমুখ দর্শন না করে পেছন ফেরে,

তাদের পুণ্যসঞ্চয় ষোল আনার আট আনা হয়েছে মাত্র। মানুষটিকে ভাল লাগে, কথাবলে তৃপ্তি পাই। এখান থেকে উঠে নেমে এলাম গঙ্গার ধার বরাবর—সামনেই কাঠের পুল, পেরিয়ে ওপারে এলাম।

এপারে এসে দাঁড়াতেই সমস্ত দিনের পথচলার অবসাদ যেন দূর হয়ে গেল। মনে হ'ল আবহমানকাল ধরে এই গঙ্গোত্তরীতেই আমি মানুষ হয়েছি এখানেই আমার সব কিছু। খানিকটা পথ উপরে উঠে গেছে, বিচ্ছিন্ন দেওদারের ছায়া গোটা বালিয়াড়ির বুকের উপর··· খানিক দূর চলার পর সেই গৈরিক কুটিরের সন্ধান মিলল, যাকে ধর্ম্মশালা থেকে দেখে আমার মনে আলোড়নের সৃষ্টি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কুটিরটি—অঙ্গনের ভেতর ঢুকতেই মাতাজীর দর্শন পাওয়া গেল। এঁরও গৈরিক বেশ—মধ্যবয়সী, মুখেচোখে দীর্ঘদিনের সাধনা-লব্ধ প্রশান্তি ও তিতিক্ষার ছায়া। প্রণাম করলাম আমি আর ধরম সিং। মৃদু হেঁসে আমাদের বসতে বললেন। কথাবার্ত্তার সুরুতেই জিজ্ঞাসা করি ওঁর পরিচয় ও সামনের ঐ কুটিরের কথা। তিনি শান্ত সুরে বলতে থাকেন, "কুটিয়া কে অন্দর যো মহাত্মাজী তপস্যা মে লগে হুয়ে হৈঁ—উনকা নাম হ্যায় কৃষ্ণস্বামী। তীশ সাল সে ইসী গঙ্গোত্তরী কো কেন্দ্র বনা ও ওহ য়হাঁ হৈঁ, ঔর ইস তীশ সালকে অন্দর করীব পচ্চিশ সাল ওয়ে অপনী সাধনা মে লগে হুয়ে হ্যাঁয়—।"

মাতাজী নিজের নাম বলেন ভগবৎপ্রসাদ। চমকে উঠি নামের বৈচিত্র্যে, কিন্তু কিছু না বলে জানতে চাই সাধুটির সাধনমার্গে আসার আগেকার কথা, তাঁর নামগোত্র ও পরিচয়। এড়িয়ে যান মৃদু হেসে, আমাদের আকাঙ্খার পথ করে দেন—সাধুদর্শনের ইচ্ছা এঁরই সাহায্যে পূর্ণ হয়ে ওঠে। রুদ্ধ দ্বার মাতাজীই খুলে দেন, ভেতরে যেন আলো-আঁধারির সংমিশ্রণ। কেমন যেন রোমাঞ্চিত হ'য়ে

উঠি, ভেতরে প্রবেশ করি যন্ত্রচালিতের মত! দু'এক পা এগোতেই পিঠের ওপর কার যেন হাতের মৃদু চাপ পড়ে—বুঝি, মাতাজীর ডান হাত কাঁধের উপর, বসবার ইঙ্গিত করছেন। আবিষ্টের মত বসে পড়ি, পায়ের তলায় মসমস করে ওঠে কি সব, বুঝি এগুলো ভূর্জপত্র—সারা মেঝের উপর আস্তরণের মত ছড়ানো। প্রণাম করি ভূমিষ্ঠ হয়ে—কপালে দু-একটা পাতা লেগে যায় আমার।

ক্যামেরার লেন্সের মত আমার চোখ দুটো সামনে উপবিষ্ট মূর্ত্তির উপর নিশ্চল হতে থাকে। সংখ্যাতীত ভূর্জপত্রের উপর সোজা হয়ে বসে আছেন কৃষ্ণস্বামী, পত্রগুচ্ছই এঁর আসন, বাঘ-ছালের বালাই নেই। জটার স্তূপের তলায় প্রশস্ত ললাট, সরু বাঁশীর মত নাক, চিবুকের তলা থেকে মুখের জ্যোতির্ম্ময় প্রসন্নতা অনির্ব্বচনীয়। কেমন যেন মনে হয়—মনে হয় এ মুখে বাংলাদেশের ছাপ, কিন্তু অনুসন্ধানের সূত্র মেলে নি। চক্ষুদ্বয় অর্দ্ধনিমীলিত—মণি দুটি নিশ্চল ও নিথর, অতল রহস্যে তা লীন হয়ে আছে। সম্পূর্ণ নিরাভরণ প্রশান্ত স্থির মূর্ত্তি, হাত দুটি আলগাভাবে কোলের উপর ন্যস্ত। যোগমগ্ন কৃষ্ণস্বামী, প্রপঞ্চ আত্মা যেন ব্রহ্মে স্তব্ধ হয়ে আছে। অনেকক্ষণ বিভোর হয়ে চেয়ে থাকি শুধু, অধীর হয়ে পড়ি এই ভেবে যে কি এক মহাশক্তির আকর্ষণে জীবনের দীর্ঘ ত্রিশটি বৎসর নিরুপদ্রবে কেটেছে এঁর—কেন কাটে, আর এই সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পটভূমিকায় কি বা আছে? দিন নেই, রাত নেই…সমগ্র চরাচর আত্মার ভেতর দিয়ে সমাধিতে এসে একটি বিন্দুতে স্থির হয়ে গেছে কৃষ্ণস্বামীর। এ মূর্ত্তির কাছ থেকে কথা? তার থেকে পাথরের উপর মাথা খোঁড়া ভাল। নিঃশব্দে বেরিয়ে আসি প্রণামের পূর্ণ একটি অঞ্জলি রেখে।

কুটিরটির বাইরে এসে কোনও ভূমিকা না করে মাতাজীকে

গঙ্গাদাসের কথা জিজ্ঞাসা করি। নামটি শুনেই তিনি চমকে উঠেন; বলেন, "আপকো ইনকী খবর কিসনে দিয়া।" আমি উত্তরকাশীর উপকণ্ঠের বিমলানন্দের কথা বলি, জানিয়ে দি, তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়াটাও একটা বিশেষ যোগাযোগের ফল, আর তিনিই গঙ্গাদাসের সন্ধান দিয়েছেন। তিনি এইটুকু জানিয়েছেন যে, গোমুখের পথেই তিনি থাকেন—পথ বন্ধুর সঙ্কুল, তবে সত্যানুসন্ধানের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ থাকলে তাঁর দেখা পাওয়া সম্ভব। মাতাজী কি যেন ভাবেন; তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে আমার আপাদমস্তক একবার দেখে নেন, মুখে চোখে কিসের একটা জ্যোতি ফুটে উঠে—তার পর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেন, "তুম সকোগে?" বলি, "অগর গুরুজী কা আশীর্ব্বাদ রহে তো কেঁও ন সকুঙ্গা।" কয়েকটি মুহূর্ত্তের নৈঃশব্দ্য, মাতাজী বলতে থাকেন, "গঙ্গোত্তরী মন্দির কো পিছে রখ দক্ষিণ-পূব কী ওর যো রাস্তা গোমুখ কে লিয়ে নিকল গয়া হৈঁ উসকে দুসরী তরফ হী ওয়ে রহতে হৈঁ। ওয়ে বড়ে সাধু হৈঁ, উনকে দর্শন সে আপকা জীবন সার্থক হোগা। রাস্তা বহুত খারাপ হৈঁ কই এক জগহ তো রাস্তা, হী নহী হৈঁ—পথ বনা কর আগে বঢ়না পড়ে গা। বরষো আগে য়হী রাস্তা থা গোমুখ যানে কে লিয়ে, পর গঙ্গাজীকী ধারা ধীরে ধীরে বদলতী গই, ঔর ওহ সড়ক ভী টুটতী গই। উনকী কুঠিয়া গঙ্গাজীকে কিনারে পর হী হৈ—।"

মাতাজী চুপ করে যান। এইটুকুই ত যথেষ্ট—ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে এই পথনির্দ্দেশই জীবনে দুর্লভ বস্তুর সন্ধান এনে দেবে। প্রণাম করে আমরা উঠে পড়ি।

এই কুটিরটির পাশ দিয়ে আর একটি সরু পথ গঙ্গার ধার বরাবর উত্তর দিকে চলে গেছে। এ পথ আলাদা পথ, কেমন যেন মিল নেই অন্য রাস্তাগুলোর সঙ্গে। দৃষ্টির সামনে দেওদারের যে ঘন জঙ্গল,

দেখতে পাচ্ছি, একটা অস্পষ্ট হাতছানি দিয়ে এ পথটা ঐ জঙ্গলের মধ্যে যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিসের একটা সাড়া পাই রক্তের ভেতর। বিমলানন্দ বলেছিলেন, গঙ্গার অপর পারে দেওদারের যে জঙ্গল তার মধ্যেই আত্মগোপন করে থাকেন রামানন্দ, হয়ত বা এই সরু পথ ধরে গেলেই মিলবে সেই মহাসাধকের অস্তিত্ব। পা চালিয়ে দিই, ধরম সিংকে বলি, "উধার চলিয়ে।"

গঙ্গার তীরভূমির দু'পাশে আকীর্ণ যে সব পাথরের রূপ দেখতে দেখতে আসছি, তার ভেতর কালো পাথরের ভগ্নাংশই বেশী। কৃষ্ণ-স্বামীর কুটির অদৃশ্য হওয়ার পর এই বেখাপ্পা পথটি সুরু হ'ল গঙ্গাকে পাশে রেখে, খানিকটা আসার পর আচমকা পট-পরিবর্ত্তনের মত কালো রঙের প্রস্তর-সমাকীর্ণতা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, জাহ্নবীর গৈরিক-প্রবাহের দু'পাশে দেখা দিল অতি শুভ্র পাথরের স্তূপ, স্মৃতির ভাণ্ডারে যা এক অক্ষয় সঞ্চয়। যত দূর দৃষ্টি চলে শুধু সাদা আর সাদা, যেন শুভ্র রঙেরই মেলা বসে গেছে। ছোট-বড় সাদা পাথরের বালিয়াড়ি ···তার মধ্যে দিয়ে ভাগীরথী বয়ে চলেছেন মূর্ত্তিমতী তপস্বিনীর মত ···এ যে কি দৃশ্য তা বোঝাই কি করে? গঙ্গোত্তরীমার্গের এই নয়নাভি-রাম রূপ, এ রূপ সার্থক রূপ, মহত্তম রূপ—এ রূপের তুলনা নেই। জাহ্নবীগর্ভে বড় বড় পাথর যেন দ্বীপরচনা করে রেখেছে, আর সেগুলোতে প্রতিহত হয়ে প্রবাহের যে কলোচ্ছ্বাসের মূর্চ্ছনা, তা শুনতে শুনতে ঘুম এসে যায়···মনে হয় ফিরব না, সংসার অবলুপ্ত হয়ে থাক, জীবনের বাদবাকী ক'টা দিন মায়ের এই স্নেহাঞ্চলের আশ্রয়েই কাটিয়ে দেব। কিছুক্ষণ এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখতে দেখতে চলার পর এক অপরূপ দৃশ্য চোখে পড়ে, এমনটি যে দেখব তা অপ্রত্যাশিত ছিল। সামনে দেখি প্রবাহের রূপ, প্রপাতের রূপ—গতিশীল ধারা এক আকুল

উচ্ছ্বাসের আনন্দে একটি বিরাট সাদা পাথরের উপর যেন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে—দূর থেকে দেখলে মনে হয় এ যেন বিশাল শুভ্র কোন এক মহাশক্তির বুকের উপর যজ্ঞোপবীতের বন্ধনী। কল্পনা করা চলে এ মহাশক্তি—স্বয়ং মহাদেব, যিনি গোমুখের কাছে গঙ্গার বেগকে জটাজালের ভেতর ধারণ করেছেন। গঙ্গার প্রবাহের এ শাশ্বত মূর্ত্তি আর কোথাও দেখি নি—এখানে মানসপটে যে ছবিটি ধরা পড়ে সেটি হচ্ছে এই যে, জটাজুটসমাচ্ছন্ন মহেশ দণ্ডায়মান, এক হাতে তাঁর ডমরু আর এক হাতে ত্রিশূল…ভগীরথ যুগযুগান্তের তপস্যায় সমাধিস্থ…আকাশের দূর নীলিমার মহাব্যোমের ভেতর থেকে মা গঙ্গা নেমে আসছেন পৃথিবীতে, প্রবাহের সে দুর্নিবার বেগ ধারণ করবার জন্যেই ত শিব। গোমুখে মহেশের ঊর্দ্ধভাগ—এখানে তাঁর বক্ষদেশ।

শুধু তাই নয়, আর একটি কল্পনাও মনে আসে। সেটা আর কিছু নয় জহ্নুমুনিকে কেন্দ্র করে কল্পনার রূপটি। ভৈরবঘাটির চড়াইয়ের শেষে গঙ্গোত্তরী মন্দিরের পথে, এক মাইল আগে, দূর থেকে গঙ্গার অপর পারে পাহাড়ের যে আকৃতির সঙ্গে ভাগীরথীর অদ্ভুত রূপ দেখেছি, এখানে সেই দেখার চরম সার্থকতা। যে অতি বৃহৎ শুভ্র প্রস্তরখণ্ডের বুকের উপর দিয়ে প্রবাহিণীর নেমে আসা—তার সঙ্গে মানুষের জঙ্ঘার সাদৃশ্য বর্ত্তমান। মনে হয় ঠিক এই অঞ্চলকে ঘিরেই মহামুনি জহ্নুর আশ্রম ছিল, আর ঠিক এইখানে বসেই তিনি একটিমাত্র অঞ্জলিতে গঙ্গাকে পান করেছিলেন। সগররাজার যে আরাধনা, শাপ-মুক্ত হওয়ার যে তপস্যা আর সেই তপস্যার ফলে ভাগীরথীর সেই মুক্তি-পর্ব্ব—সবই যেন ঘটেছিল এখানে। পাথরটিকে সারা জীবন মনে থাকার কথা, আর থাকবেও। মনে হয় গোটা মহাভারতের ভগীরথ-

আখ্যানের পাতাগুলো এখানে এলোমেলো ভাবে যেন পড়ে আছে। এই পাথরটির ছ'পাশে ছুটি সাদা পাখী চোখে পড়ে, মুখোমুখি হয়ে বসে আছে। ছুটির পাশ দিয়ে চলে যাই—ওরা নড়ে না। ওরা কারা কে জানে? অনামী ছুটি পাখী, অজানা ওদের ইতিহাস......।

কিছু পরেই সেই দেওদার জঙ্গলের সুরু। বিশাল বিশাল সংখ্যাতীত মহীরুহ উঠে গেছে উর্দ্ধাকাশে। অপূর্ব্ব নির্জ্জন পরিবেশ, গঙ্গার কলধ্বনিও এখানে নীরব। রামানন্দকেই ভাবতে ভাবতে চলেছি, সন্ধ্যার আর বেশী দেরি নেই, মনের ভেতর সেই একটি মাত্র প্রশ্ন—দর্শন কি মিলবে না! উত্তরকাশীর বিমলানন্দ ত এই জঙ্গলেরই বর্ণনা করেছিলেন, এইখানেই ত তাঁর থাকার কথা। ধরম সিং পেছনে পেছনে আসছে, তারও মুখে কথা নেই, সেও একটা কিছু ঘটবার সম্ভাবনায় মূক হয়ে গেছে। কোথাও কিছু নেই, একটি বিরাট দেওদারের মূলকাণ্ডের আড়াল থেকে হঠাৎ দৈত্যের মত একটি বিরাট মানুষ বেরিয়ে এল। আমাদের সামনে দেখতে পেয়েই অদ্ভুত ভঙ্গীতে কটমট করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর মানুষটি পেছন ফিরে হনহনিয়ে হাঁটতে সুরু করলে। দেখতে সাত ফুট লম্বা বিশাল লোমশ পুরুষ—দিগম্বর—হাতে একটা বিরাট লাঠি। ছুটি পায়ের পাতা অস্বাভাবিক স্থূল ও বৃহদাকার। বিমলানন্দের বর্ণনার সঙ্গে সবটাই ছুয়ে ছুয়ে চারের মত মিলে যায়···কোন ভুল নেই ···ইনিই রামানন্দ, ইনিই যোগসিদ্ধ মহাসাধু···গাছের পাশ থেকে এঁর আচমকা বেরিয়ে আসা আর তাকানোর ভঙ্গী, তারপর প্রস্থানের ব্যাপারটি—সবকিছুই অদ্ভুত। অবশেষে রামানন্দের সাক্ষাৎ মিলল, ওঁর পিছু পিছু আমি আর ধরম সিং এগিয়ে চলি। আমরা পিছু নিয়েছি কি না সেটা একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিলেন রামানন্দ, তারপর যখন দেখলেন আমরাও মন্ত্রমুগ্ধের মত এগোচ্ছি তখন ধপ করে একটা পাথরের

উপর বসে পড়লেন তিনি ; ভাবখানা এই—এরা যখন ছাড়বে না তখন থামা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

পায়ের ওপর মাথা রেখে দীর্ঘ একটি প্রণাম জানাই—উত্তরকাশীর সেই বিষ্ণুদত্তের মতই একবার ডান হাতটি আশীর্ব্বাদের ভঙ্গীতে তুলে ধরেন তিনি—শুধু এইটুকু যা—কোন কথা নয়, কোন আদর আপ্যায়নের সুর রামানন্দের কণ্ঠে বেজে ওঠে না। প্রকাণ্ড মুখ, মাথা জটা-বিহীন, বিষ্ণুদত্তেরই মত কাঁচাপাকা চুলে ভর্ত্তি। মাংসল স্থূল গ্রীবা, বক্ষস্থল সুবিশাল—এমনটি সচরাচর দেখা যায় না। যোগাসনে বসার মতই তিনি বসে ছিলেন পাথরের উপর। চোখদুটো খোলাই রেখেছিলেন—তবে এ দৃষ্টিতে আগেকার সে ক্রোধবহ্নি নেই, আছে সেই ছল ছল ভাব। কথা বলার চেষ্টা করি, বলি-ও কিছুটা, কিন্তু নির্ব্বাক নিথর রামানন্দ একটি উত্তরও দেন না। নিস্পন্দ মুর্ত্তিতে একটি কঠিন অপরিবর্ত্তনীয় সীমারেখা টানা যেন—কথার মাধ্যম এখানে মুল্যহীন : তাই চুপ করে যাই। মনের তৃপ্তিটুকু শুধু প্রাণ ভরে দেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গোত্তরী তীর্থভূমির শীতের প্রকোপে আমরা কাতর হয়ে পড়ি, আমাদের সারা অঙ্গে শীতবস্ত্রের আচ্ছাদন—কিন্তু এ মূর্ত্তি যে একেবারে নিরাভরণ। ভোলানাথের আরাধনায় মানুষটাই ত ব্যোমভোলা হয়ে গেছে। বুঝতে পারি আধ্যাত্মিক মার্গে রামানন্দের প্রভাব কতখানি! বুকের ভেতর উপদেশ তথা ইঙ্গিতপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষার যেন ঝড় বইতে থাকে—কিন্তু কণ্ঠে সুর আসে না, কণ্ঠ রোধ হয়ে যায় আমার।

আধ ঘণ্টা···একটা শতাব্দী যেন। সমুদ্রের ঢেউয়ের মত অনুভূতির পর অনুভূতির প্লাবন হতে থাকে···সেই মূকই হয়ে থাকি। তিনটি মানুষের মধ্যে কারুরই মুখে কথা নেই, সংখ্যাতীত দেওদারের

শাখা-প্রশাখার মধ্য দিয়ে বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ হতে থাকে শুধু।

স্বপ্ন টুটে যায়, উঠে পড়ি আমি আর ধরম সিং। বৃহৎ পা দুটি থেকে অঞ্জলির মত তুলে নিই কিছু পদরেণু, তা ছোঁয়াই বুকে, কপালে ও মাথায়···ডান হাতটি আবার আশীর্ব্বাদের ভঙ্গিতে ওঠান খানিকটা, তার পর রামানন্দ উঠে পড়েন। পশ্চিমাংশে দেওদারের জঙ্গলের নিবিড়তার মধ্যে রামানন্দের সুবিশাল দেহটি অদৃশ্য হয়ে যায়। এবার দক্ষিণের পথ। যে পথ দিয়ে রামানন্দের সন্ধানে আসা, সে পথে প্রত্যাবর্ত্তনে বেশী সময় লাগবে—সন্ধ্যারও আর দেরি নেই, কাজেই ও পথ ছেড়ে দিই। গঙ্গা থেকে অনেকটা দূরেই চলে এসেছি। এবার সমতল ভূমির সুরু, দেওদারের ঘন সন্নিবেশ শেষ হয়ে এল। খানিকটা পথ আসার পর বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত আর একটি কুটিরের সন্ধান পাওয়া গেল। সামনে একটিমাত্র খোলা দরজা, আশেপাশে জনমানবের চিহ্ন নেই। ধরম সিংকে নিয়ে সরাসরি ভেতরে প্রবেশের ফলে কুটিরা-ভ্যন্তরের নৈঃশব্দ্য কতকটা ভগ্ন হয়। তৈজসপত্রের টুংটাং আওয়াজ হয়, বুঝি কুটিরটিতে যাঁর অধিষ্ঠান, জাগতিক ধর্ম্মের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায় নি। এখানেও মেঝের ওপর ভূর্জপত্রের আস্তরণ, যা প্রথমোক্ত কুটিরে দেখে এসেছি। বুঝতে পারি এ অঞ্চলে তপস্যালব্ধ জীবনের সঙ্গে ভূর্জপত্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। নিশ্চিত বুঝতে পারি এই অন্ধকারের মধ্যে মানুষ আছে। যন্ত্র-চালিতের মতই পত্রগুচ্ছের উপর বসে পড়ে তাঁর উদ্দেশে প্রণাম জানাই। কোন সাড়া পাই না—না মানুষের, না অন্যকিছুর।

নিশ্চল হয়ে বসে আমি আর ধরম সিং অন্ধকারের নিবিড়তার মধ্যে মূর্ত্তি ও আসনের সন্ধান নিতে থাকি। কিছুক্ষণ এই ভাবে বসে

থাকার পর কিসের একটা খসখস আওয়াজ হয়, মনে হ'ল, সম্মুখের দশ-বার হাত দূরে অধিষ্ঠিত মূর্ত্তিটি যেন একটু নড়ে উঠল। এক মিনিট, কি হু'মিনিট—চোখের সামনে অন্ধকারের পটভূমিকায় একগুচ্ছ দীর্ঘ দাড়ি ভেসে ওঠে। মুখ দেখতে পাই না, শরীরের অন্যকিছুও চোখে পড়ে না, কেবলমাত্র অবাস্তব জিনিষের মত ঐ অদ্ভুত দাড়িই দৃষ্টির সম্মুখে দেখা দেয়। কিছুক্ষণের জন্যে একটা নিস্তব্ধতা, তারপরেই গম্ভীর গলার আওয়াজ—"তুম ক্যা মাঙ্গতে হো? কহাঁ ঘর হৈ তুমহারা?"

—"সাধু ঔর মহাত্মা কা দর্শন কে লিয়ে হী মেরা আনা হৈ। বঙ্গালমে মেরা ঘর হৈ—ম্যায় বাঙ্গালী হুঁ।"

"দরশান সে কুছ নহী হোতা হৈ বেটা—করম চাহিয়ে। জপ ঔর ধ্যান কর—য়হী সব, মুক্তি কা রাস্তা হৈ বেটা। দিন রাত লাগাতার ধ্যান লগা, নহী তো গুরু কে গুরু কৈসে মিলেঙ্গে? তেরা জপ ধ্যান যব নীদ মে ভী চালু রহে, তব সমঝকি ওয়ে মিলেঙ্গে।"

জিজ্ঞাসা করি—"ইস সংসার কে মনুষ্য কে লিয়ে কৌন সা পথ হৈ বাবা? আগে বঢ়নে কা উপায় ক্যা জপ ঔর ধ্যান?"

—"ওহী একহী রাস্তা হৈ। জীবনকে পল্ পল্ মে উনকী সুখ মে হী উনকো পানা হৈ বেটা। একদিন মে সব নহী হোতা হৈ। আপনা পহলেজনম কা সুকৃত কা অভাব ন হোনে পর ইসী জনম মে সব সম্ভব হৈ। করম কিয়ে যা বেটা, সচ্চে পথ পর রহ। ঔর ধ্যান কো আগে বঢ়া।"

মূল গঙ্গোত্তরীর এই তিনজন সাধুর কথা আমার স্মৃতির পটে চিরকাল আঁকা থাকবে। গঙ্গাদাসের কথা স্বতন্ত্র, কেননা তিনি থাকেন গোমুখের পথে। কিন্তু মন্দিরকে কেন্দ্র করে যে পৌরাণিক তীর্থভূমি, তার মধ্যে ঐ তিন জনই স্নিগ্ধ জ্যোতি বিকীর্ণ করছেন।

রামানন্দের সন্ধান পেয়েছিলাম সুকৃতির ফলে। রামানন্দ ছাড়া অপর দুটি সাধুও কল্যাণকৃৎ, এদের দেওয়া আশীর্ব্বাদও যে-কোন মানুষের পক্ষে দুর্লভ। তৃতীয় সাধুটির নাম আমি জানতে পারি নি, অনেক চেষ্টা করেও নয়। সত্যি বলতে কি, গঙ্গোত্তরীর গঙ্গার অপর তীরভূমিতে সাধুর সংখ্যা বড় কম নয়…এঁদেরও আমি দেখার চেষ্টা করেছি, বোঝার চেষ্টা করেছি, কিন্তু স্থানকালপাত্রভেদে তাঁদের সাধনার তত্ত্ব আমার কাছে অনধিগম্য থেকে গেছে। তাঁরা পাকা-পোক্ত ঘরবাড়ী তুলে বাইরে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে ভগবানকে পাওয়ার চেষ্টা করছেন—তাঁদের সঙ্গে দেখা হলে তাঁরাই ডাকেন, যাত্রীদের ডাকতে হয় না। তাঁরা সহজলভ্য, তাই ভিড় সেখানে …সহজেই সেখানে আসন মেলে। উত্তরকাশীর উজলীর সঙ্গে মিল অনেকটা। থাক এঁদের কথা—তবে পূর্ব্বোক্ত তিন জনকে যে গঙ্গোত্তরীমার্গের সাধনার ইতিহাসে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বলা চলে তাতে সন্দেহ নেই। শীতের সময় এ অঞ্চল যখন তুষারে ঢাকা পড়তে থাকে তখনও ঐ ত্রিমূর্ত্তি সাধনার দীপশিখা জ্বালিয়ে রাখেন, তখনও দেওদারের জঙ্গলে দিগম্বর রামানন্দের বিশাল শরীরটি চোখে পড়ে।

উজলী থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে উত্তরকাশীর বিশ্বনাথের মন্দিরে যেমন কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজ শুনেছিলাম, এখানেও তার ব্যতিক্রম হয় না। সাধুদর্শনের পালা শেষ করে যখন মন্দিরে এসে যাই তখন ঢাকের শব্দ সুরু হয়েছে, সেই সঙ্গে আরতিও। ঢুকতেই প্রশস্ত নাট-মন্দির…এখানে ঢাকের বাজনা চলেছে, গুম, গুম, গুম। নিস্তব্ধতার রাজত্বে শুধু এই আওয়াজ পরিবেশকে করে তুলেছে রহস্যময়। বড় বড় ঢাক শুধু, কাঁসরের আওয়াজ নেই, ঘণ্টারও নয়। এই নাট-মন্দিরের সামনে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলে গর্ভগৃহ। স্বর্ণময় বেদী, আর

ঐ বেদীর উপর নানা অলঙ্কারভূষিতা গঙ্গামূর্ত্তি, অন্য কোন মূর্ত্তি চোখে পড়ে না। একজন দীর্ঘকায় পুরোহিত কেবলমাত্র কর্পূরের দীপাধারের সাহায্যে নৃত্যের ভঙ্গীতে মায়ের আরতি করছেন—তন্ময়তার প্রতিচ্ছবি যেন! শীতে জড়সড় হয়ে, গরম জামা-কাপড়ের স্তূপ হয়ে স্বর্গরাজ্যে মায়ের পূজো দেখি। বড় ভাল লাগে ঢাকের আওয়াজের সঙ্গে এ আরতি।

প্রধান মূর্ত্তির আরতি ও পূজা শেষে তন্ময় পূজারী দীপাধারটি নিয়ে নেমে আসেন, তারপর মন্দিরাভ্যন্তরের অন্যান্য মূর্ত্তির সামনে কিছু-ক্ষণের জন্যে থেমে থেমে আরতি করে যান। আলো-আঁধারির মধ্যে সে সব মূর্ত্তি দেখাও যায় না, বোঝাও যায় না। এর পর পুরোহিত এগিয়ে চলেন, পেছনে ঢাকের বাদ্যসহ যাত্রীদের শোভাযাত্রাও চলতে থাকে। এর পর সুরু হয় মন্দির-আরতি, যা দেখা জীবনের এক অভি-নব অভিজ্ঞতা। ভারতবর্ষের বহু স্থানে তীর্থপরিক্রমার আশায় ছুটেছি, মন্দির দেখাও বড় কম হয় নি, কিন্তু ঠিক এ বস্তুটি চোখে পড়ে নি। ইট-কাঠ এবং পাথরের মন্দিরও ভক্তিমার্গের বেদীতে সম্পূর্ণ মূর্ত্তির রূপ যে নিতে পারে তা জানা ছিল না। মন্দিরের প্রবেশদ্বার দিয়ে বেরিয়ে সমগ্র মন্দির পরিক্রমা শেষ করে পুরোহিত আবার এসে থামেন প্রবেশপথেরই সামনে।

এর পর ঐ একটিমাত্র দীপাধারের অগ্নিশিখাকে পুরোহিত বহন করে নিয়ে আসেন গঙ্গা-প্রবাহের সামনে, পেছনে সেই ঢাকের বাজনা বাজতে থাকে। নিস্তব্ধ নিশুতি রাত···দশ-বারখানা ঘরবাড়ী থেকে দেখতে পাই ছোট ছোট আলোর বিন্দু, এ বিজন রাজত্বে মানুষের অবস্থিতির ঐ যা একমাত্র পরিচয়, বাদবাকী বিশ্ব-সংসার অন্ধকারে যেন অবলুপ্ত হয়ে গেছে, আর এই মায়াময় পরিবেশের পটভূমিকায় জাহ্নবীর

স্রোতোধারার সামনে মানুষের দীপাধারের আরতি এক অচিন্ত্যনীয় দৃশ্য, তা দেখে মনে জাগে এক অপূর্ব্ব অনুভূতি।

নীরন্ধ্র অন্ধকার রাত্রি, আকাশে সপ্তমীর একফালি চাঁদ, ছায়াপথ ও তারার মিছিল আর এক তলায় পুরোহিতের ভাগীরথী-পূজা··· অপার্থিব ও অপূর্ব্ব, আমার রক্তকণিকার সঙ্গে এ সব জড়িয়ে যায় যেন।

মন্দিরের পাশ দিয়েই ধর্ম্মশালার পথ, যেতে যেতে হঠাৎ বীরবলদের সঙ্গে দেখা, ওরাও আরতি দেখে ফিরছিল। পূজার দৃশ্য-বৈচিত্র্যে সকলেই ডুবেছিলাম, তাই কারুর সঙ্গে দেখা হয়নি, হয়ত বা সবকিছুই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেখেছি। আমাকে দেখে ওদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দের যে বন্যা নামে তার তুলনা খুঁজে পাই না। ঝড়ের মত বীরবল আমার সঙ্গে বিচ্ছেদের কথা যেভাবে বর্ণনা করে তাতে অভিভূত হয়ে পড়ি। বার বার এই কথাটাই জানায় যে, কোন চটিতেই তারা আমি সঙ্গে না থাকায় তৃপ্তি পায় নি, সব যেন মরুভূমির মত ঠেকেছে। বুঝি, দু'দিনের পথের পরিচয় চিরকালের পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কতকটা জোর করেই ওরা আমাকে মন্দিরে টেনে নিয়ে যায়—উদ্দেশ্য গঙ্গামূর্ত্তির সামনে আমাকে শপথ করিয়ে নেওয়া যে, ওদের দেশে আমি একবার যাবই, এটা ওদের দাবী, যে দাবীকে মেনে না নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। বললাম, "যাব...।" গোমুখ ওরা যাবে না, কালকেই রওনা হবে কেদারের পথে ভাটোয়ারী হয়ে। বীরবলের বড় আশা—ফিরতি পথে আমি তাদের সঙ্গ নেব আর তার জের চলবে কেদারনাথ ঘুরে বদরীবিশাল পর্য্যন্ত। এইখানেই প্রথম প্রকাশ করি যে, কেদারনাথ আমি যাব না, বদরীও নয়, যার দর্শন গত বৎসরেই শেষ হয়ে গেছে আমার। বিষাদের ছায়া নেমে আসে ওদের মধ্যে।

বীরবলদের সঙ্গে বিচ্ছেদ এই মন্দিরের পর থেকেই। বুকের

ভেতরটা অকারণে যেন হু হু করে ওঠে। বোধ হয় এমনই হয়—বিচ্ছেদের এই হল চিরাচরিত অনুভূতি। পথের মাধ্যমেই ওদের সঙ্গে পরিচয়, আর এই পথের ওপরেই এই নর-নারায়ণদের ফেলে যাওয়া। স্মৃতি যা রইল তা আমরণ ও অশেষ—এই সার্থক হয়ে থাক। ধর্ম্মশালায় যখন ফিরি ধরম সিং-কে নিয়ে তখন আটটা বেজে গেছে। সুপ্তিতে ঢাকা এ এক অজানা অচেনা রাজ্য—তারা খসার মত আমরা দুটি প্রাণী এ রাজ্যে যেন হঠাৎ এসে পড়েছি......।

গঙ্গোত্তরীতে প্রথম দিনের মহাসঞ্চয়ের প্রথম অধ্যায়ের এইখানেই বিরতি।

॥ এগার ॥

একটিমাত্র রাত্রের যা বিশ্রাম, তাই মনে হয় জীবনের পুনর্জ্জন্ম······উঠে পড়ি সকাল সকাল, আর চোখ মেলার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় আজ আর এক বিরাট অধ্যায়ের শুরু—যা জীবনে অক্ষয় ও অব্যয় হয়ে থাকবে হয়ত !

ধরম সিংকে সব বলাই ছিল—আমার ঘুম ভাঙার আগেই তার গোছগাছ শেষ, সেও মহাযাত্রার জন্য প্রস্তুত। আমিও তৈরী হয়ে নিই, কোথা থেকে এক বিপুল কর্ম্ম চাঞ্চল্য এসে দেখা দেয় আমার। সাতটা বেজে পনের মিনিট···তেরশ ষাট সালের একটি স্মরণীয় দিনে রওনা দিই আমি আর ধরম সিং ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে অর্থাৎ তীর্থের তীর্থ গোমুখের পথে···গঙ্গাদাস সন্দর্শনে। আজকের এই দিন······জীবনের যেন মহাদিন।

কাল যে চায়ের দোকানে দণ্ডীস্বামীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তাঁরই গাইড আমার ভাগ্যে জুটে যায়। গোমুখের পথ, আধুনিক সভ্যতা বিবর্জ্জিত পথ, তাই গাইডের নির্দ্দেশ তথা সাহায্য অপরিহার্য্য। দণ্ডী-স্বামীর সঙ্গে কালকে ফিরেছে, আজকেই সে আবার তৈরী—গোমুখ যেন তার কাছে ঘরবাড়ী। গাইডের নাম বলবন্ত সিং—ভাটোয়ারীর লোক। ওর কাছে জানতে পারি পথিমধ্যে ভুজবাসায় একটা রাত কাটাতে হবে, সেখানে একটি মাত্র ঘরের সংস্থান···আগে নাকি তাও ছিল না, রাত্রি-বাসের জন্যে ছিল গুহা···। টিহিরী গাড়োয়ালের রাজপরিবারের অর্থ সাহায্যে ঐ কাঠের ঘরখানি নাকি গড়ে উঠেছে।

তের মাইল পথ—দুর্গম ও দুস্তর। সেদিন গোমুখের পথে আমিই এক তীর্থপথযাত্রী, অন্য কোন সঙ্গী আমার জুটল না। সাধারণ তীর্থযাত্রীদের তীর্থ-পরিক্রমার সীমা এই গঙ্গোত্তরীর মন্দির পর্য্যন্ত…আজকের এই বিংশ শতাব্দীর যন্ত্র সভ্যতার যুগেও গোমুখ এখনও অনেকের কাছে অচিন্ত্যনীয় হয়ে আছে… ।

একটি দোকানে বলা ছিল, তিনসের পুরি, ও তরকারির কথা, পথে খাদ্যবস্তু পাওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই নেই, সঞ্চয় করে নিতে হয় এখান থেকেই। গোমুখের পথে অঞ্জলি ভরে জল মিলবে, মিলবে না খাদ্যকণিকা!

ঘরবাড়ীর ভিড়, দোকানপাট ও ধর্ম্মশালা—সর্ব্বশেষে মন্দিরের পাশ কাটিয়ে তিনটি মূর্ত্তির পথ চলা সুরু হয় আর এক অজানা মরকত রাজ্যের সন্ধানে। মন্দিরের পেছন দিয়ে একটি সরু সীমন্তিনী পথ উর্দ্ধমুখে উঠে গেছে, চড়াইয়ের ইতর বিশেষ এখান থেকেই সুরু।

বলবন্ত সিংকে বলাই ছিল। যে পায়ে চলার পথ দিয়ে স্মরণাতীত কাল থেকে গোমুখ তীর্থে সাধারণ যাত্রীদের আনাগোনা, তার উল্টো পথেই আমাকে চলতে হবে। কেননা এই উল্টো ঘোরা পথই গঙ্গাদাসকে পাওয়ার একমাত্র ইঙ্গিত। এ পথের কাণ্ডারী ধরম সিং, সে নয়ঃ বলে দিই, সে যেন একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে আমাদের জন্মে অপেক্ষা করে। সে এক কথায় রাজী হয়, বলে 'বহোত আচ্ছা'। কেন যে উল্টো পথকে বেছে নিই সাময়িকভাবে আর সে পথের আকর্ষণ কি তার সে বিষয়ে ঔৎসুক্যও জাগে না…অদ্ভুত শান্ত মানুষ বলবন্ত সিং। মানুষের সব খবর জানার সব অধিকার তার নেই, এই উপলব্ধিতেই সে শান্ত। বেলা এগারটার মধ্যে আমরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে হাজির হব, সেই কথাই রইল তার সঙ্গে।

রূপকে আঁকড়ে ধরি মনের মনিকোঠায়—এক অপার্থিব সম্ভাবনায় মন কানায় কানায় পূর্ণ হ'য়ে ওঠে। গঙ্গোত্তরী মার্গের শ্রেষ্ঠতম সাধু মহাযোগী গঙ্গাদাসকে আবিষ্কার করবার আশায় রওনা হই বাংলার রবাহুত আমি আর উত্তরকাশীর বালক ধরম সিং।

গঙ্গোত্তরী ছাড়বার পরই পাহাড়ের ঊর্দ্ধপ্রসারতা, ক্রমশঃ তা দেওদারের নিবিড়তায় কোথায় যেন হারিয়ে গেছে···। পথ একেবারেই নেই, পথ করে নিতে হবে : এ এক নব আবিষ্কারের নেশায় ছুটি মাত্র মানুষের নব অভিযান।

টুকিটাকি মালপত্রের বোঝা নিয়ে বলবন্ত সিং অদৃশ্য হয় গঙ্গার ধার বরাবর—সীমন্তিনী পথ রেখা ধরে আমরাও ঠিক উল্টোদিকে মুখ করে চলতে থাকি। দিক নির্ণয়ের সব কিছু উপকরণ অপাংক্তেয় এখানে, কেবলমাত্র 'বিপরীত' কথাটাই আমাদের একমাত্র অবলম্বন হয়ে ওঠে। একটার পর একটা জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ের ভগ্নাংশের রূপ—যা ফেলে আসা কোন পাহাড়ের সঙ্গেই মেলে না। বড় বড় পাথরের অবিন্যস্ত সমারোহ, তার ওপর সন্তর্পণে পা ফেলে এগুতে থাকি—কখন বসে, কখন উঠে, কখন হামাগুড়ি দিয়ে। আটটা বেজে গেছে, সূর্য্যের আলোর যেটুকু দাক্ষিণ্য তাতে শরীরের কাঁপুনি থামে না...গঙ্গোত্তরী ছাড়াবার পরই শীতের অমানুষিক প্রাবল্য বুঝতে পারি। নিস্তব্ধ নিশুতি রাজ্য—এক অচেনা জগত যেন—পৃথিবীর কোন পরিচয়ই এখানে নেই। আটাসটা দিনের তীর্থ পরিক্রমণায় যাত্রাপথের যে ইতিহাস রচিত হয়ে গেছে—আজকের এই পথ যাত্রায় সে ইতিহাসের একটি পাতাও জোড়া নেই—আজকের এই মহাযাত্রার সবটাই নতুন, সবটাই বৈচিত্র্যময়। মা গঙ্গার পাশে পাশে এসেছি, আজকের যাত্রা সেই মায়েরই সার্থকতম রূপের সন্ধানে। সেখানে গিয়ে কি দেখব,

আমার ভিক্ষার ঝুলীতে কি সঞ্চয় সঞ্চিত হয়ে আছে তা জানা নেই—তবে এটুকু জানি গঙ্গাদাসই এই পথের মূলসূত্র—তাঁকে আবিষ্কার না করে গোমুখ দর্শন আমার কাছে বৃথা ও অর্থহীন। ভগবৎপ্রসাদ বলেছিলেন, কাটাফুটা পথ, বিমলানন্দ বলেছিলেন বন্ধুরতম পথ। প্রতিটি পদবিক্ষেপের সঙ্গেই তাঁদের যুক্ত ঘোষণার সত্যতা বুঝতে পারি। এরকম বন্য আদীম রাজত্ব আমি দেখি নি কোথাও...।

আমার সামনে সামনে পথ দেখিয়ে দেখিয়ে চলেছে উত্তর কাশীর ধরম সিং। কচি মিহি গলার আওয়াজ দিয়ে চলেছে—'উধার মাত জানা ইধার সে চলিয়ে—বহোত কাটাফুটা পথ হুঁসিয়ার বাবুজি...।' ও যে নির্দ্দেশ দেয়, আমিও সেইভাবে পা বাড়াই আর বিরাট বিরাট বিপর্য্যয়কে রোধ করি। এক এক জায়গায় পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ঝুরঝুর করে তারা খসার মত ঝরে পড়ে পাথর আর মৃত্তিকাকণিকা··· দেওদারের পতনোন্মুখ শাখাপ্রশাখা ধরে নিশ্চিত মৃত্যুকে রোধ করি।

ধরম সিং...কে ও? মানুষ ত, না ওই ভগবান? এক পা এক পা করে চলতে চলতে মনে হতে লাগল আমার চোখের সামনে মনুষ্যরূপী নারায়ণই চলেছেন। সর্ব্বভূতে তিনি, আর সেই চরম সত্যের পূর্ণকুম্ভ হয়েই ধরম সিং চলেছে। তিনি যদি ওর ভেতর অদৃশ্যভাবে না দেখা দিতেন তাহলে আমার মত অসহায় অর্ব্বাচীন মানুষের পক্ষে এ বিজন ভূমিতে অনুপ্রবেশে সাফল্য আসত কি করে? তিনি আছেন, তাই আমি আছি আর এই থাকার সার্থকতম বিকাশ উত্তরকাশীর ঐ বালক—সুন্দরতম ধরম সিং...।

প্রায় মাইলখানেক এই রকম পথ—কখন চড়াই, কখন উতরাই—যা জীবনের তিতিক্ষার এক অন্তহীন পরীক্ষা। এই এক মাইল চলে আসার পর মনে হ'ল প্রত্যাবর্ত্তনের সকল পথ চিরকালের মত অবলুপ্ত হ'য়ে

গেছে—আমি এক চুম্বকশক্তির মহা আকর্ষণের ভেতর এসে গেছি…। এটি যে কি তা বোঝান ছুষ্কর, যার হয় সেই বোঝে। চরম উপলব্ধির ভেতর এসে যাই যে গঙ্গাদাসের আওতার ভেতর পড়ে গেছি—তিনি জাল ধরে টেনেছেন—তাই ফেরার পথ আর যেন নেই। সামনে একটা সাদা পাহাড় চোখে পড়ে, মনে হয় এটি পার হতে পারলেই সমতল-ভূমির নিশানা আর তার পরেই গঙ্গার অস্তিত্ব। কোন রকমে পাথরের ওপর দিয়ে হেঁটে ওপরে উঠ্‌তেই ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আচমকা আত্মপ্রকাশ করে একটি বন্য নীল গাই…ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে, বড় বড় চোখ করে একবার তাকায় আমাদের দিকে—যেন এই ভাব যে এ রাজত্বে এ ছুটো মানুষ কেন? তারপরেই হুড় হুড় করে পাথর ছড়াতে ছড়াতে কোথায় যেন অদৃশ্য হ'য়ে যায়। প্রথমটায় ভয় হয়, তারপরেই বুঝতে পারি কাছাকাছি কোথাও মানুষ আছে…এ নীলগাই সম্ভবতঃ গঙ্গাদাসকে আবিষ্কারের প্রথম পরিচ্ছেদ। আরো কিছুটা পথ বেশ নীচের দিকে চলে গেছে…অগ্রসরমান ধরম্ সিং হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায় প্রস্তর মূর্ত্তির মত, তারপরেই আমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে কি যেন দেখিয়ে দেয়……।

দেখতে পাই সামনেই প্রবহমানা জাহ্নবী—তার তীরভূমির ওপর ছোট্ট একটি কুঠির…গঙ্গাদাসের কুঠির সে। এ দেখা এ আবিষ্কার শেষরাত্রে শুকতারা ফুটে ওঠার মত—এ আনন্দ, এ তৃপ্তি এমনি যে তাকে বিশেষণের মাধ্যমে বোঝান যাবে না…।

বুঝতে পারি পরিশ্রমের সার্থকতা আমার এসে গেল—আমি অঞ্জলি ভরে বিশেষ কিছু পেতে চলেছি। আর কয়েকটি মিনিট—তারপরেই প্রাণ ভরে দেখতে পাব গঙ্গোত্তরী ও গোমুখ মার্গের পুরুষোত্তমকে—যার জন্যে যমুনোত্তরীর পর থেকে উল্কার মত ছুটে এসেছি আমি—।

এর পরের মুহূর্তগুলো ভুলবার নয়, এ জীবনের চরম উন্মাদনা। আস্তে আস্তে এগোতে থাকি, কেমন যেন শক্তি নিঃশেষিত হ'য়ে আসে, পায়ে পা জড়িয়ে যায়, দেহ অকারণে অবশ হয়ে আসে। ও কুঠিরের ভেতর কাকে গিয়ে দেখব? গত বৎসরের সেই বালক সাধু? না অন্য কেউ? গঙ্গাদাস কি তিনি, যিনি বলেছিলেন "গঙ্গোত্তরী জানেসে সব মিল জায়গা?" যাঁর জন্যে এত দূর ছুটে আসা, যাঁর জন্যে পিপাসার ক্লান্তি, তিনিই কি ওখানে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে নিমগ্ন? অদ্ভুত অদ্ভুত চিন্তায় আর আবিষ্কারের চরম সন্ধিক্ষণে মনটা বিবশ হয়ে আসে। দুটি মানুষের যোগসূত্র কি এক? একটি সুতোয় কি দুটি মূর্ত্তি গ্রথিত? বদরিকার মন্দির প্রাঙ্গণ আর গোমুখের এই মহানির্জ্জনতা...এ কি সাধনমার্গের পটভূমিকায় এক? চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে জপকে শিখণ্ডী করে এই মহারহস্যের সন্ধানে এক পা এক পা করে আমি এগোতে থাকি......।

কুড়ি বাইস হাত দূরেই কুঠির, তবু মনে হয় পৌছতে কুড়ি বাইশটা বৎসর কেটে গেল—এ যেন যুগের অনন্ততা। অদ্ভুত নির্জ্জন প্রকৃতি ...এ পাশে ওপাশে বড় বড় দেওদারের ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশ, এর মধ্যে আশ্চর্য্য সুন্দর একটি কুঠির—সাধনার উপযুক্ত স্থান বটে! খানিকটা দূরেই গঙ্গার অনন্ত প্রবাহ, তার কুলকুল রব, বাদ বাকি বিশ্বসংসার সুপ্তিময়, যে সুপ্তির অধ্যায়ে আজও বিবর্ত্তনবাদের কোন ছায়া এসে পড়ে নি। কুঠিরের সামনে এসে যাই...। একটি পাথরের ওপর বসে পড়ি, কানে আসে ঘণ্টার টুংটাং আওয়াজ...বুঝতে পারি গঙ্গাদাসের পূজো চলেছে। সম্মুখে একটি লাল কার্পেট ঝুলছে দরজার ওপর—তাতে বড় বড় অক্ষরের লেখা—রাম।

মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত...অনুভূতির প্লাবন আর রহস্যের দারোদ্ঘাটনের

সম্ভাবনায় অনড় হ'য়ে যাওয়া। কাকে দেখব? ঐ কার্পেট ঠেলে কোন অপার্থিব মূর্ত্তি দেখা দেবেন? পলের পর পল, দণ্ডের পর দণ্ড ...মনে হয় ঘূর্ণায়মান পৃথিবী আচমকা থেমে গেছে......।

আধঘণ্টারও ওপর বসে আছি আমি আর ধরম সিং...সময় আর কাটে না যেন! কানে আসে টুংটাং আওয়াজ শুধু...।

তারপর কয়েকটা মিনিটের নীরবতা, লাল কার্পেটটা একটু দুলে ওঠে, তারপরেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে গঙ্গাদাসের মূর্ত্তি...শ্বাশত ও জ্যোতির্ম্ময়—যার জন্যে ছুটে আসা, যার জন্যে প্রহর 'গোনা...। কি দেখলাম? কাকে দেখলাম? মিল্‌ল কি অঙ্কফল? বদরীকা ও গঙ্গোত্তরী কি একই বৃত্তে এল? চাওয়ার অঞ্জলি কি ভরল না?

মিল্‌ল কি মিল্‌ল না, পেলাম কি পেলাম না, তার চুলচেরা হিসেব এখানে থাক। কেননা আগেই বলেছি ব্যক্তিবিশেষের আধ্যাত্মিক-মার্গের গুহ্যতত্ত্ব চিরকালই মৌন ও চিরকালই নির্ব্বাক। কালি ও কলমের মাধ্যমে তার ভাষণ দেওয়া অর্থহীন কেননা সে ভাষণ অতি-ভাষণই থেকে যাবে। আমার কাজ শুধু সন্ধানের সূত্র বলে দেওয়া—আমার কাজ ভবিষ্যৎ তীর্থযাত্রীদের সাধুসঙ্গের মহৎ প্রচেষ্টায় প্রাণ সঞ্চারের বারিসিঞ্চন করা। তারই জন্যে গঙ্গাদাস, তারই জন্যে রামানন্দ আর তারই জন্যে অন্যান্য মহত্তম জীবনের অনুসন্ধান। সেখানে পুণ্য লোভাতুর তীর্থকামীদের পাওয়া, না পাওয়ার প্রশ্ন সুকৃতির প্রশ্ন ...আমার এ কাহিনী সেই প্রশ্নের একটি হাতছানি মাত্র। আমার কাছে গঙ্গাদাস গুহ্য—আমার সকল চাওয়ার চাওয়া, আমার সকল পাওয়ার পাওয়া...। রহস্য এখানে রহস্যই থাক। কেননা তাঁর মত মানুষের কাজ থেকে আমি কি পেয়েছি আর কি পাই নি তার ষোল আনার হিসেব শুধু আমারই কাছে: কেবল মাত্র ভ্রমন কাহিনীর

পাতায় এই হিসেবের কোন সার্থকতা নেই। আমার যাওয়া আর তাঁকে পাওয়া, এ এক অঘটন আর অঘটন বলেই এর চুলচেরা বিশ্লেষণে আমার শক্তি কতটুকু? কাজেই এ থাক।

হঠাৎ আমাদের মত অর্ব্বাচীন দুটি মানুষের উপস্থিতিতে গঙ্গাদাসের মুখে চোখে যে বিস্ময়ের ভাবটি ফুটে ওঠে—তার ব্যাখ্যাও এখানে কঠিন। নিস্পন্দ হয়ে যান তিনি, বড় বড় চোখ করে তিনি কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন রামানন্দের মত—তবে সে দৃষ্টিতে ছিল ভয়াবহ রূপ আর এ দৃষ্টি শান্ত সমাহিত। হঠাৎ তিনি হা হা করে শিশুর মত হেসে ওঠেন আর বলতে থাকেন—"আরে আপ কিধারসে আয়ে ক্যায়সে আয়ে মেরা পাত্তা কিস্‌সে মিলা?" এ তিনটি কথা তিনি বারবার বলতে থাকেন আর হাসির বন্যায় তিনি ডুবে যান! কি মিষ্টি সুর, কি হাসির লহর—সংসারে এর তুলনা মিলবে না!

আর কি! মিলে ত গেল সব···মন্ত্রমুগ্ধের মত উঠে পড়ে প্রণাম করি আমি আর ধরম সিং। তারপর আবার সেই হাসি আর সেই জিজ্ঞাসার অনুবৃত্তি চলতে থাকে—আপ কিধারসে আয়ে—ক্যায়সে আয়ে, মেরা পাত্তা কিস্‌সে মিলা?

সব বলি। কিছু বাদ থাকে না। যাঁর জন্যে ইতিহাস, যাঁর জন্যে উপাখ্যান, সবই বলা হ'য়ে যায় এই অতিমানুষটির কাছে···।

সব শোনেন—তারপর আদেশের সুরে বলে ওঠেন, "পহলে গঙ্গাজী মে স্নান কর আও, ফির বাত হোগী।" কার্পেটের আড়ালে তিনি অদৃশ্য হয়ে যান।

গঙ্গার তীরে চলে আসি। আদেশ ত মানতে হবে। এক এক করে গরম কাপড়ের স্তূপকে শরীর থেকে নামাতে থাকি। মনে হয়েছিল, অবগাহনের চেষ্টা দুরাশা—কিন্তু এইখানেই অবিশ্বাস্য একটি ঘটনা ঘটে

যায়। জামাকাপড় খুলে যেখানে এক মুহূর্ত্ত দাঁড়ান চলে না—জমে যাওয়ার ভয় যেখানে পদে পদে—সেখানে কাঁপুনি এল না এতটুকু, শীতবোধ হ'ল না—স্নানের সময় মনে হ'ল বাংলাদেশের গঙ্গায় স্নান করছি। মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝলাম—গঙ্গাদাস বাকসিদ্ধ পুরুষ। তিনি বলেছেন স্নানের দরকার, এইটাই সত্যি—প্রকৃতি মাথা নত করেছে।

স্নান সমাপন ক'রে আবার ফিরে আসি কুঠিরের সামনে। দেখা দেন গঙ্গাদাস। আমাদের আহ্বান করেন কুঠিরের ভেতর—মাথা নীচু করে কার্পেট টেনে আমরা ঢুকে পড়ি।

প্রথমেই চোখে পড়ে ফুল লতা পাতার আস্তরণের ভেতর একটি স্বর্ণময় রাম মূর্ত্তি। পাশে একটি ঘণ্টা...যার আওয়াজ আমরা শুনেছি একটু আগে—। দেওয়ালে একটি বিরাট জটাজুট সমাচ্ছন্ন এক সন্ন্যাসীর প্রতিকৃতি, দেখিয়ে বলেন যে ওটি ওঁর গুরুদেবের···। মুখে শুধু রামনাম, এক একবার রাম কথাটি উচ্চারণ করেন আর আনন্দে আত্মহারা হয়ে নৃত্য সুরু করেন স্বর্ণময় রামমূর্ত্তিকে ঘিরে···। চুপচাপ বসে বসে দেখি আর কল্পনার জাল বুনি···। বুঝতে পারি, ভক্তি-মার্গের গৌরীশৃঙ্গে আরোহণ করেছেন গঙ্গাদাস—দুনিয়ার সবকিছু যাঁর রামনামে রূপান্তরিত হয়েছে। ভক্তিমার্গের এরকম অপূর্ব্ব প্রকাশ জীবনে আর কোথাও দেখেছি বলে মনে হ'ল না। পকেট থেকে একটি খাম সন্তর্পণে বার করে ওঁর হাতে দিয়ে বলি—"মেরা এক রিশতেদার আনে কে পহলে মুঝে ই'সে দে কর কহথা কি বদরীকাজীকে উস সাধু সে আগর মুলাকাৎ হো তো মেরা নাম লে ইহ উন্‌হে দেকর মেরা প্রণাম দেনা···।"

খামের মুখ খুলি নি কোনদিন। ভেবেছিলাম যদি সন্ধান পাই যাঁর জিনিস তাঁকেই দেব। এখানে সে সুযোগের প্রাপ্তিযোগ, তাই নিবেদন

করি। "আরে এ ক্যা চীজ—।" বলতে বলতে তিনি খামটি খুলে ফেলেন। বের হয় একটি বিবর্ণ শেতপুষ্প। আর দেখে কে—মুহূর্ত্তে প্রেমানন্দে পাগল হ'য়ে ওঠেন যেন। সেই ফুলটিই তাঁর কাছে সম্পদ হয়ে ওঠে—মাথায় তুলে নেন তিনি আর সেই সঙ্গে সুরু হয় নৃত্য··· ভক্তিরসের চরম অভিব্যক্তি সে। দীর্ঘ শুভ্র দেহ, পরনে কৌপীন মাত্র, মাথায় কাঁচাপাকা চুলের সমারোহ, অদ্ভুত সুকুমার মুখচ্ছবি, পদ্মপলাশের মত দুটো চোখ···সুদূর বাংলাদেশের একটি অনামী মানুষের দেওয়া ফুল নিয়ে গঙ্গাদাস ঘরের ভেতর পাগলের মত ছোটা-ছুটি করতে থাকেন···এ দৃশ্য দেখা যেন জীবনের চরম দেখা···। স্বর্ণময় রামমূর্ত্তি আর মনুষ্যদেহী গঙ্গাদাস—দুয়ের ভেতর কোন প্রভেদ নেই, কে রাম আর কে গঙ্গাদাস বুঝতে পারি না। '

দুটো চোখ দিয়ে অশ্রু নেমে আসে আমার, কেন কে জানে? কেমন যেন হয়ে যাই...। এরপর আধঘণ্টা কথাবার্ত্তা হয় ওঁর সঙ্গে···। অঞ্জলি ভরে ওঠে আশীর্ব্বাদে, উপদেশে ও অনুপ্রেরণায়। গঙ্গোত্তরী আসা সার্থক হয়—তীর্থ পর্য্যটন সফল হয় আমার।

কথাবার্ত্তার ভাষণ এখানে অতিভাষণ—এইটাই আমার কাছে গুহ্য—নির্ব্বাক ও মৌন। এখানে তার প্রকাশ অতি প্রকাশ, তাই তার চেষ্টা থেকে বিরত থাকছি···। গঙ্গাদাসকে পাওয়ার আর একটি সূত্র বলে দিই, সেটা হল ওই কুঠির, এই মানুষ আর পতিতপাবনী মা গঙ্গা—তিনটি যুক্ত হয়ে নাম হয়েছে—অমৃতঘাট। এই নামটি তাঁকে খুঁজে নেওয়ার একমাত্র ইঙ্গিত।

॥ বারো ॥

গঙ্গাদাসের কুঠির থেকে দুর্লভতম এক ইতিবৃত্ত শেষ করে আবার দুটি মানুষের পথ চলা সুরু হয়। হাত তুলে গঙ্গাদাস আশীর্ব্বাদ করেন আমাদের—তাতেই ধন্য হয়ে যায় মূল্যহীন জীবন। কুঠিরটির সামনে একটি গুহা যে মুখব্যাদন করে আছে, ওই হ'ল গঙ্গাদাসের রাত্রের আশ্রয়। কুঠির তার কাছে শুধু কুঠির নয়, ওঁর কাছে তা মন্দিরের শুচিতা। কোন্ মহাভাগ্যবান এটি তৈরী করে দিয়ে জীবন সার্থক করেছে কে জানে?' ক্ষোভে বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে এই ভেবে যে বলবন্ত সিংয়ের ব্যাপারটা না থাকলে, একটা রাত এখানে যে করে হোক কাটিয়ে যেতাম—অনুমতিও মিলত হয়ত! কিন্তু যা হবার নয়, তা হয় না—বেদনাই বুকের ভেতর থেকে যায়। গঙ্গা এখানে বিপুলা নন—তিনি ক্ষীণকায়া···যে কাঠের কাণ্ডটি ফেলা আছে গঙ্গার ওপর, তারই সাহায্যে পার হয়ে যাই! কাণ্ডটি এমনভাবে বিছানো তাতে মনে হয় এখানে অগোচরে মানুষের যাতায়াত আছে, তবে তাঁরা নিশ্চয়ই সাধারণ স্তরের মানুষ নন, তাঁরা ঊর্দ্ধলোকের মানুষ – গঙ্গাদাসের সাধন ভজনের সঙ্গে সমসূত্রে গাঁথা··· । গঙ্গা পেরিয়ে আবার খানিকটা জটিল পথ...কোনরকমে এ পথটুকুও শেষ করি। এরপর আবার খানিকটা পথ চলা—অর্দ্ধবৃত্তাকারে এ পথের পরিসমাপ্তি। এরই শেষে দেখি বলবন্ত সিং তার নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে চুপচাপ আকাশের দিকে মুখ করে বসে আছে একটা বড় পাথরের ওপর। আমাদের দেখে শুধু বলে —"মুঝে তো খ্যাল হো রহা থা কি আপলোগ মঙ্গলসে খো গয়ে। ঔর

সোচ বহা যা কি হ'স রাস্তে কো জোর কর আপ ইতনী চক্কর কাট কর কোঁ গয়ে—।" গোমুখের পথে যার নিত্য যাতায়াত সেই জানে না গঙ্গাদাস তথা গঙ্গদাসের অস্তিত্ব। শুনে অবাক হয়ে যাই, অথচ এঁরই জন্যে আমাকে সুদূর বাংলাদেশ থেকে ছুটে আসতে হয়েছে—।

অমৃতঘাট থেকে ভুজবাসা···আট মাইল কি ন' মাইল। চার মাইল প্রায় শেষ করেছি, বাকী ক' মাইল যা, তারপরেই ভুজবাসা এসে যাবে। এ পথের মত দেওদারের এমন ঠাসবুনুনী অন্য কোথাও নেই—এমন নয়নাভিরাম প্রকৃতির রূপও অন্য কোথাও চোখে পড়ে নি। তিনটি প্রাণী, জীবজগতের আমরাই যা সাক্ষী—দু'চার কোটি বৎসর আগে পৃথিবীর পরিচয় যা ছিল, এখনও ঠিক তাই। কোনো যাত্রীর পদচিহ্ন কোন দাগ ফেলে নি—বন্ধুরতার ভয়ালরূপ কখন যে রাখবে তাও মনে হয় না। তিনজনে চলেছি চুপচাপ, চারিদিক এমন নির্জ্জন ও নিশ্চুপ যে নিজের নিঃশ্বাসের শব্দটুকু পর্য্যন্ত শোনা যায়···। পাথরের পর পাথর—তার ওপর দিয়ে বলবন্ত সিংএর নির্দ্দেশমত ভুজবাসার দিকে এগোতে থাকি। কোন্ দিকে পথ—কোথায় ভুজবাসা, তারই একমাত্র জানা···আমরা চলেছি কতকটা অন্ধের মত। শীতের প্রকোপ এত বেশী যে কিছুক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়ান মুস্কিল। ধরিত্রীর এরকম আদিম অধ্যায় কোন তীর্থ স্থানের সঙ্গে যুক্ত নয়—যা হয়েছে গোমুখের পথে। কেন যে গোমুখ সাধারণের জন্যে নয়, কেন যে তিতিক্ষার ষোল আনা ব্যয়িত হয় এখানে তার পরিচয় মেলে প্রতিটি পাদ-বিক্ষেপে···। ধরিত্রীর মূর্ত্তি যেন চণ্ডালিনী মূর্ত্তি—একটা অহেতুক আক্রোশে তের মাইলের এই পথটুকুকে যেন লণ্ডভণ্ড করে রেখেছেন। কেন রেখেছেন তার বিশ্লেষণ করা দুষ্কর। তীর্থের ইতিহাস গোমুখকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে 'ভয়ঙ্করতম' হিসেবে—কেন যে এ প্রাধান্য তার

পরিচয় কড়ায় গণ্ডায় মিলে যায়… । চলতে চলতে মনে হয় ঠিক একটু আগে বিরাট রকমের একটা ভূমিকম্প গোটা এ অঞ্চলের ওপর দিয়ে তার যাবতীয় ধ্বংস লীলার প্রকাশ করে গেছে—মেদিনী আর মেদিনী নেই, দুমড়ে বেঁকে গেছে যেন। এক একটি পাদবিক্ষেপে, এক একটি জীবনের প্রশ্ন। তবে সান্ত্বনা—এখানকার পুঞ্জিভূত নৈঃশব্দ আর পথের বিশ্বশূন্যতা। দুটি জিনিসের সংমিশ্রণে এমন একটি ধ্যানের ক্ষেত্র তৈরী হয় যে পা দুটো অসাড়ে চলতে থাকে…। প্রকৃতির দিগন্তব্যাপী নিরাভরণতার সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ যে কতটা ব্যাপক তার পরিচয় মিলবে ভুজবাসার এই পথে। মাতৃস্বরূপিনী জাহ্নবী তাঁর ঐতিহাসিক উৎসমুখ সন্তানদের দেখিয়েছেন এক আধ্যাত্মিক বিবর্ত্তনবাদের ভেতর, তাদের নিয়ে এসেছেন যেন দ্বিজোত্তম করে। গৃহগতপ্রাণ মানুষ আমি, ক্ষয় ও ক্ষতিরই কারবার আমার…আজকে এই পথের প্রান্তে মনের ভেতর এই আসমুদ্র-হিমাচলের মন্থন কেন? মা আমাকে যেন নিয়ে চলেছেন তাঁর বুকের উষ্ণতার ভেতর বহন করে—আমার যেন সর্ব্বকলুষ ধুয়ে গেছে, মুছে গেছে। ক্রমোচ্চ উচ্চতার মাপকাঠিতে এ আমার যেন জন্মান্তরের পট পরিবর্ত্তন…।

প্রাণপণ শক্তিতে পথ অতিক্রম করে আমরা অবশেষে ভুজবাসায় পৌঁছে যাই। বেলা দুটো—ঠিক সময়েই এসে গেছি। ধরম সিং-এর কাছে এ পথ নতুন—পাহাড়ী ছেলে হয়েও পাহাড়ই তাকে ক্লান্তি এনে দেয়। আমার কথা স্বতন্ত্র—পরিশ্রমের দিক দিয়ে আমার ষোল আনা পূর্ণ হয়ে ওঠে। এখানে আসার আগে আর একবার গঙ্গাকে পেরিয়ে এসেছি—যে পেরুনটা অভিজ্ঞতার দিক থেকে অভিনব। গঙ্গা এখানে ভয়ঙ্করী—মনে হয় চূড়ান্ত একটি পরীক্ষা তাঁর বুকের ওপর হাঁ করে আছে। জল এত ঠাণ্ডা যে বরফকেও হার মানায়। বিরাট একটি

দেওদারের কাণ্ড গঙ্গার স্রোতধারার ওপর বিছানো আছে : তার ওপর চড়ে বসে পার হতে হয়। পেটের কাছে পা দুটোকে টেনে হাত দুটো কাণ্ডের ওপর রেখে সন্তর্পণে অতিক্রম করতে হয় গঙ্গা। দেওদারের ঠিক দেড়হাত তলাতেই তীব্র গতিশীল গঙ্গার প্রবাহ। গোমুখের পথে যে সব তীর্থযাত্রী এই চণ্ডালিনী গঙ্গাকে অতিক্রম করেছেন, মনে করতে হবে ভবিষ্যতের কোন বিপদই তাঁদের কাছে অসম্ভবের পর্য্যায়ে নয়…। গঙ্গার এই রণ-রঙ্গিনী প্রবাহকে বাদ দেওয়ারও উপায় নেই—গোমুখ তীর্থযাত্রীদের এ চ্যালেঞ্জ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

ভুজবাসা—ভূর্জপত্রের থেকেই এ নাম, আর এ নামের সার্থকতাও আছে। দেওদারের বনে নিবিড়তার কতকটা শেষ ভুজবাসার একমাইল আগে থেকে—তারপর থেকে ভুজগাছের অকৃপণ সমারোহ। এ সমারোহ ভোলার নয়—এও স্মরণীয়। মূল কাণ্ডের উর্দ্ধমুখী প্রসার কতকটা দেওদারেরই সমগোত্র—কিন্তু পাতার ঘন আস্তরণের দিক দিয়ে দুয়ের পার্থক্য অনস্বীকার্য্য। অসংখ্য ভুজগাছের শাখা-প্রশাখার আড়ালে আকাশের নীলিমা অদৃশ্যপ্রায়, তাই পথের ওপর আলো-আঁধারের স্পর্শটুকু বড় মধুর। এ গাছগুলো যেন স্থান-কাল-পাত্রগুণে স্বকীয়তার দাবী রাখে—মনে হয় জন্মান্তরের পুণ্যের ফলে এ দেবরাজ্যে এদের জন্মের অধিকারটুকু মিলেছে। এখানে রাত্রিবাসের আস্তানা—নগন্যতম একটি কাঠের তৈরী ঘর—তাও ভুজবৃক্ষের ঘেরাটোপে যেন ঢাকা পড়ে আছে। বলবন্ত সিংই জানে এর অস্তিত্ব—সেই এর সন্ধান দেয়…।

কাছেই গঙ্গা—জলই জীবন, তাই সেই জলের কাছেই এই রাত্রি-বাসের ব্যবস্থা। ধরম সিং-কে জানাতেই সে চা তৈরীর সাজসরঞ্জাম-গুলো বার করে ফেলে—আমি কিন্তু ভেবেছিলাম এই জিনিসটি সে

আনতে ভুলেছে। কিন্তু দেখলাম কোন দিক থেকেই তার ত্রুটি নেই। জল নিয়ে আসে গঙ্গা থেকে, কাটকুটো জোগাড় করে বলবন্তসিং—চা তৈরী হয়ে যায় দশ মিনিটের মধ্যে। প্রাগৈতিহাসিক এক সৃষ্টিতত্ত্বের আবহাওয়ায় বিংশশতাব্দীর চা-এর অবদান—বড় অদ্ভুত লাগে ভাবতে। এর পর বিশ্রাম। ভুজবাসার এই ঘরটি সর্ব্বদা খোলাই থাকে গোমুখের যাত্রীদের জন্যে। ছোট্ট ঘরটি, মনে হল কমলীবাবার ধর্ম্মশালারই রূপান্তর···ধু ধু করা শূন্যতার ভেতর যেন রজনীগন্ধার মত ফুটে আছে। দু'দশ বছর আগে এ ঘরটির অস্তিত্ব ছিল না, ছিল পাহাড়ের গুহা। শীতের প্রাবল্যের জন্যে বাইরে বসে বসে প্রকৃতিকে উপভোগ করার আশা দুরাশা, তাই সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যে তিনটি প্রাণী আশ্রয় নিই ঘরের ভেতর। পুরি ত সঙ্গে আছেই—কাজেই ওদিকটায় চিন্তা ছিল না।

ভুজবাসার রাত ভোলবার নয়—অস্থিমজ্জার সঙ্গে তা জড়িয়ে গেছে। সাড়ে সাতটার ভেতর নামমাত্র খাওয়া দাওয়ার পাট চুকে যায়···ধরম সিং আর বলবন্ত সিংের শয্যা নিতে যা দেরি—আটটার ভেতর বুঝলাম ওরা কেউই আর জেগে নেই। ছোট্টঘরটার দরজাজানলা-গুলো বন্ধ—শুধু পায়ের কাছে লণ্ঠনটা স্তিমিতভাবে জ্বলছে। পর পর তিনটে কম্বল গায়ের ওপর চাপান তবু শীত যাচ্ছিল না। ঘুম আসছে আবার আসছে না···কেমন যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব। চিন্তার বিবর্ত্তনের ধাক্কায় কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল আমার···।

কোথায় এলাম? কোথায় আমার শয্যা? কে আমি? এ পৃথিবী আমার ত? তীর্থ পরিক্রমনার একুত্রিশটা দিনের একুত্রিশটা রাত—আশ্রয় জুটেছে, খাদ্য জুটেছে, মানুষের সঙ্গের অভাব ঘটে নি। পেয়েছি সামাজিকতার বন্ধন, পেয়েছি জীবনের উত্তাপ ও সভ্যতার আলো।

রোজনামচার ইতিহাসে অসম্পূর্ণতা আসে নি কোনদিন। হরিদ্বার থেকে ধরাসু—ধরাসু থেকে যমুনোত্তরী—তারপর উত্তরকাশী হয়ে গঙ্গোত্তরী···এ দীর্ঘ পথের প্রান্তে সবকিছু না এলেও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ি নি কোনদিন···।

কিন্তু একি? কোথায় আমি শুয়ে? আমি, ধরম সিং, বলবন্ত সিং ···এ তিনটি প্রাণীর বিশেষণ কি? একটা আদিম পৃথিবী—অর্ব্বাচীন আমরা, সৃষ্টিরহস্যের চরম জিজ্ঞাসার মত আমরা এখানে উৎক্ষিপ্ত হয়ে ছিঁড়ে এসেছি যেন···। বিশ্বচরাচর অবলুপ্ত···মহামায়ার যোগ-নিদ্রা চলেছে। নিঝুম রাত···সৃষ্টির প্রথম যামের প্রথম অঙ্ক—নিবাত নিস্কম্প দীপশিখার মত বিশ্ব চরাচর যেন জ্বলে আছে···। যাত্রীদের কোলাহল নেই, জীবনের সুখদুঃখের ইতিবৃত্ত নেই, চড়াই উতরাই ভাঙার গল্পের মৌতাত নেই। কান পেতে শুনলে কেবল গঙ্গার গর্জ্জন শোনা যায়...বিষ্ণুপাদসম্ভূতা জাহ্নবী যেন বেহাগ বাজাচ্ছেন···। ঝিঁঝিঁপোকার আওয়াজও শোনা যায় না—তার শব্দও এখানে অপাংক্তেয়। ভারতভূমির বহুতীর্থের বহু অভিজ্ঞতা—কিন্তু ভাগিরথীর উৎস সন্ধানের যে পর্ব্ব আর তার যে ভুজবাসার রাত—এর তুলনা পাই নি কোথাও। স্মৃতির ভাণ্ডারে আজকের এই রাত্রের সম্পদ অবিস্মরণীয় ও অশেষ···যাত্রীবিশেষের জীবনে এই রাত্রির অবদান বোধমার্গের চরম অবদান...।

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ি...জপের ভেতর দিয়ে...ধ্যানের ভেতর দিয়ে—কখন ভোর হয়ে যায়...।

ঘুম ভাঙে সকাল সকাল। চিন্তার ভিতর গোমুখের কথা মনে হওয়া মাত্র কম্বলের অরণ্য ছেড়ে উঠে পড়ি। আমার আগেই ওরা উঠেছে, গরম জল, চা সবই তৈরী। সেবাধর্ম্মী ধরম সিং, তার সেবায়

মুগ্ধ হয়ে যাই আমি। ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি সাদা কুয়াশার একটা আস্তরণ পড়েছে, গাছপালা পাহাড় পর্ব্বত সব যেন ভেজা-ভেজা, এদিকে ওদিকে বিচ্ছিন্ন তুষারের আস্তরণ। এ পথে তুষারের সাক্ষাৎ এই প্রথম—প্রচণ্ড শীতের কনকনে হাওয়া বইছে রাজ্যের শীতবস্ত্র চাপিয়ে শীত যায় না যেন। সাতটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে রওনা দিই গোমুখের পথে।

ভুজবাসা ছাড়িয়ে খানিকদূর যাবার পরেই গাছপালার সবুজ রঙ মুছে আসতে লাগল—নিঃশেষ হতে লাগল ভুজবৃক্ষের সমারোহ। সুরু হল ন্যাড়া ন্যাড়া পাহাড়ের বিক্ষিপ্ততা। আগে আগে চলেছে বলবন্ত—গঙ্গাকে পাশে রেখে আমাদের পথ চলা। মা গঙ্গাকে জীবনমৃত্যু হাতে করে পেরুনর প্রশ্ন আর নেই—এবার গঙ্গা নিজেই যেন হাতছানি দিয়ে তাঁর সন্তানদের তাঁর নিজ রহস্যলোকের সন্ধানে নিয়ে চলেছেন। চলতে চলতে হঠাৎ ধরম সিং গান গেয়ে ওঠে, যে কাজটি এর আগে ও কোনদিন করে নি। কান পেতে শুনি; মনে হয় এটি গান নয়—ওটি শিবস্তোত্তম। কচি গলায় মুক্ত প্রাণের দৈবভাবের স্বতঃস্ফূর্ত্ত উচ্ছ্বাস...বড় ভালো লাগে। কেন'ও গেয়ে ওঠে বুঝতে পারি সেটা। বুঝতে পারি—বাঁধ ভেঙেছে···। ভুজবাসা থেকে গোমুখ চার মাইল...। তের হাজার ফুটেরও ওপর দিয়ে চলেছি, এই প্রথম বুকে হাফ ধরে—হৃৎপিণ্ডে কিসের একটা বিপ্লব সুরু হয় যেন। মাইলপোষ্টের হিসেব করার আশা দুরাশা—দেড়মাইল আন্দাজ পথ অতিক্রমের পর ফুলের আকীর্ণতা চোখে পড়ে। লাল, নীল, বেগুনি... কত আজানা ফুল—পাষাণমৃত্তিকায় থরে বিথরে ফুটে আছে। যমুনোত্তরীর আগে খরসালী ছাড়বার পরেও ঠিক এইরকম পুষ্পগুচ্ছ দেখেছিলাম। মুঠো করে তুলে নিই উৎসমুখে দেব বলে। কিছুক্ষণ খণ্ডখণ্ড

পাথরের ওপর দিয়ে চলার পর বহুদূরে দুটি পাহাড়ের শৃঙ্গ চোখে পড়ে —ওই দুটি-ই শতপন্থ পাহাড় কিম্বা ত্রিশুল ও নন্দাদেবী। পাহাড়ের দুধারে পাহাড়ের ভগ্নাংশের যে রূপ ছিল তা হ'ল অদৃশ্য···এখন বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ির মাঝখান দিয়ে মা গঙ্গা চলেছেন। এখান থেকে বৃত্তের আকারে প্রবাহ ঘুরে গেছে উত্তরদিকে ঐ শতপন্থকে লক্ষ্য করে। বলবন্ত সিং জানায় যে ঐ বৃত্তটুকু পার হলেই গোমুখের পৌরাণিক গহ্বর দেখা যাবে। একটু পথ যেন শেষ হয় না। হৃৎ-পিণ্ডের ধুকপুকুনি থেমে আসে, কাঁপুনি বেড়ে যায়, দুর্লভতমকে পাওয়ার আবেশে সবকিছু যেন অনড় ও অচল হয়ে আসে। আধ-মাইল মাত্র পথ...জীবনের এ যেন অনন্ত প্রতীক্ষা...।

বৃত্ত ঘুরে আসে...লাঠির ওপর ভর দিয়ে চলতে থাকি। মা গঙ্গা হারিয়ে যান, তাঁর প্রবাহ আর দেখা যায় না...চোখের সামনেই দেখতে পাই বিরাট একটি পাহাড়ের একটি গুহা...নিবিড় অন্ধকারে ভেতরটা সমাচ্ছন্ন আর তার জঠর থেকে ভীমগর্জ্জনে বেরিয়ে আসছেন কল্যাণময়ী ভাগীরথী...।

ঐ ভয়ালভয়ঙ্কর গুহামুখ...ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ানো অসম্ভব মানুষের পক্ষে। তাই এই ঐতিহাসিক সৃষ্টির অবলোকন দূর থেকে···। এ পাথর থেকে সে পাথরের ওপর পা দুটোর ভারসাম্য বজায় রেখে ক্রমশঃ যতটা সম্ভব গুহামুখের সামনে এসে দাঁড়াই। নিরেট একটি তুষারাচ্ছন্ন পাহাড় উর্দ্ধাকাশে উঠে গেছে, আর তার নাভিদেশে পূর্ব্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত মুখব্যাদন করে আছে একটি গুহা আর ঐ গুহার গহ্বর থেকে হু হু শব্দে বেরিয়ে আসছে গৈরিক রঙের বিপুল জলরাশি···মনে হল একটি অদৃশ্য অসীম শক্তির প্রচণ্ড তাড়নায় মা গঙ্গা শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছেন,···কে যেন ঠেলে তাঁকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে

দিচ্ছে···নিকষ কালো ঐ গুহা···মনে হয় গোটা পৃথিবীর মন্থন চলেছে ওর মধ্যে···বেশীক্ষণ তাকান যায় না, অজানা আশঙ্কায় বুকের ভেতর দুর দুর করে ওঠে। অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে অন্তরাত্মা বিবশ হয়ে আসে...মনে হয় প্রলয় সুরু হয়েছে এখানে। রোমাঞ্চিত কলেবরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গীতার বিশ্বরূপদর্শনের সেই অধ্যায়টি মনে পড়ে যায় আমার। অর্জ্জুনের সেই উক্তি···

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্টৈব কালনলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥

—"হে দেবেশ! দন্তদ্বারা ভীষণ প্রলয়াগ্নিসদৃশ তোমার মুখমণ্ডল দেখিয়া আমি দিশাহারা হইতেছি—মনে সুখ পাইতেছি না। হে জগন্নিবাস! তুমি প্রসন্ন হও।"

আমারও তাই মনে হল—হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস—তুমি প্রসন্ন হও। মা যেন বিশ্বসংসার গ্রাস করছেন—ঐ গুহা মায়ের সেই দংষ্ট্রাকরাল! ঐ গুহার জঠরে কি আছে, কোন্ অনন্তশক্তির প্রকাশ ওর ভেতর প্রকাশমান তার আবিষ্কার সহজসাধ্য নয়।" মা গঙ্গা ঐ গুহামুখ থেকে উৎসারিত—তারপর তাঁর অনন্ত প্রবাহ আর দেখা যায় না। কত জন্মের কত ইচ্ছা, কত আকুলিবিকুলি...আজ তার সার্থকতা —এসে গেলাম তীর্থের তীর্থে। যে ভাগীরথীর সঙ্গে সম্বন্ধ গোটা জীবনের, যাঁকে ঘিরে জীবনের এক বৃহৎ অংশ কেটে গেছে—চোখের সামনে সেই গঙ্গা অদৃশ্য হয়ে গেলেন পাহাড়ের গুহায়...এ এক অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা, অনুভূতির ক্ষেত্রে এক চরম বিবর্ত্তনবাদ! বিশাল গুহামুখ থেকে জল-রাশির যে উচ্ছ্বাস আর তার ছুটে আসা যে ভাবে পৃথিবীর

দিকে তার তুলনা ভারতবর্ষের অন্যকোথাও নেই। যুগব্যাপী নৈঃশব্দ আর নিরাভরণতার ভেতর এই সদ্যপ্রসূত গঙ্গার উচ্ছ্বাস···মনে হয় চারিপাশে ডমরু নিনাদ চলেছে—মহেশ্বরই বাজাচ্ছেন সে ডমরু···। একটানা নিরবচ্ছিন্ন শব্দ—গুম্···গুম্···গুম্। কারুর কথা শোনা যায় না—আকার ও ইঙ্গিতই মনোভাব প্রকাশের একমাত্র উপায়।

পথ থেকে সংগৃহীত অনামী ফুলের অঞ্জলি দিই আর জীবনের সকল শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিয়ে সৃষ্টির এই বিচিত্র অধ্যায়ের উদ্দেশে মাথা নত করি। অবগাহন স্নানের ইচ্ছা প্রবলতম হলেও এখানে তা সম্ভব নয়, কেননা জলের কনকনানি এত বেশী যে তা কল্পনাতেও তা আনা যায় না ···তুষার দ্রবীভূত প্রবাহ ভাগীরথীর। তাই উত্তরকাশী থেকে আনা পাত্রে এ পুণ্যতম বারি সঞ্চয় করি কিছুটা···মাথায় ছিটাই ঃ মনুষ্য দেহ এতেই যেন পবিত্র হয়ে ওঠে···।

প্রশ্ন হল এই গহ্বরকে যুগান্তের ইতিহাস 'গোমুখ' আখ্যা দিয়েছে কেন? গোমাতার মুখাবয়বের সঙ্গে ঐ দংষ্ট্রাকরালরেখার সাদৃশ্য আছে বলেই কি? এ বিষয়ে ঔৎসুক্য ছিল প্রচুর ঃ মনে মনে ভেবেছিলাম যে যাত্রাশেষে গোমুখই দর্শন হবে বা! অনুসন্ধিৎসু চোখ দুটো দিয়ে এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক ইতিহাসকে লক্ষ্য করতে করতে যে প্রামাণিক সত্য মনের ভেতর স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তার সঙ্গে মানুষের অবচেতন মনের কল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য নেই। পাহাড় পর্ব্বতের যে আকৃতি, তার মধ্যে পুরোপুরি একটি গরুর মুখের কল্পনা করা দুঃসাধ্য। দৃষ্টির সামনে যে ঊর্দ্ধমুখী পাহাড় আর সেই পাহাড়ের বক্ষস্থলে স্মরণাতীত কালের যে গহ্বরের উদ্ভব, সেটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে ধারণায় আসে যে গহ্বরের গঠন পুরোপুরি গোলাকার নয়—ব্যাদিত মুখের উপরিভাগে কতকটা

গোমুখের সাদৃশ্য। ঐ ওষ্ঠের উপরিভাগে বঙ্কিমভাবের চিহ্ন বর্ত্তমান—এইটুকুই গোমুখের সঙ্গে সাদৃশ্যময়—এইটুকুই ইতিহাসের মর্ম্মকথা।

কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে গোমুখের আসল রূপ ধরা পড়ে বৈ কি... আর এই প্রকাশময়ী স্বরূপটিই তীর্থযাত্রীদের কাছে চির শ্বাশত। এই রূপের প্রকাশ দূর থেকে—যেখান থেকে ঐ গহ্বর দৃষ্টির সামনে প্রথম শেষরাত্রে শুকতারার মত ফুটে ওঠে। অনন্ত আকাশের দূর পটভূমিকায় ধ্যান গম্ভীর চিরতুষারাবৃত ত্রিশুল ও নন্দা দেবীর যে অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ ...দূর থেকে ও তুটিকে গোমাতার তুটি শৃঙ্গের মতই মনে হয়—তারই নিম্নে দিগন্তব্যাপী তুষারক্ষেত্র। এই তুষারক্ষেত্রের পাদদেশে যে পাহাড়ের অবস্থান, তারই বক্ষদেশের এই গুহার আকৃতিকে গোমাতার মুখের সঙ্গে তুলনা দেওয়া অস্বাভাবিক নয়। পাঠকবর্গের অথবা ভবিষ্যৎ তীর্থযাত্রীরা যেন আশা না করেন যে আস্ত একটি গরুর মুখের নাসারন্ধ্র দিয়েই ভাগীরথীর উৎপত্তি। গোমুখের কল্পনা ভাব সমাহিত অবস্থার ভেতর এবং তাও দূর থেকে।

প্রশ্ন আরো থেকে যায়। এই গহ্বরকে গোমুখই বলা হয়েছে কেন? অন্য কোন জন্তুর মুখের সঙ্গে কেন এই মহাতীর্থের নাম সংযুক্ত নয়? এরও উত্তর মিলবে সূক্ষ্ম চিন্তার ভেতর এবং আত্মানুসন্ধানের বেদীতে। পরমশক্তি অনাদিদেবের বিশাল বক্ষদেশকে যদি কল্পনা করে নেওয়া সম্ভব হয়—তাহ'লে নিঃসঙ্কোচে বলা চলে যে এই গাঙ্গোত্তরী ও গোমুখ তীর্থভূমি সেই বক্ষদেশ ছাড়া কিছু নয়। ভগীরথের মহাতপস্যার ফলেই জাহ্নবীর মর্ত্তে আগমন। তাঁর দূর্ব্বার বেগ সহ্য করেছিলেন রুদ্রদেব, তিনি প্রসন্ন না হলে ভগীরথের তপস্যায় সগর বংশের উদ্ধার সম্ভব হ'ত না। ঐ যে ত্রিশুল পাহাড়, ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সেই পৌরাণিক অমর চিত্রটি ভেসে ওঠেঃ ভগীরথ যুগান্তের সাধনায়

নিমগ্ন···তিনি বসে আছেন তপস্যায় নির্ব্বিকল্প হয়ে, ব্রহ্মে লীন হয়ে। পতিতপাবনী মা গঙ্গাকে তাঁর আনা চাই··· ।

শিব যেন তাঁরই পাশে দণ্ডায়মান—একহাতে ত্রিশূল আর একহাতে ডমরু। কণ্ঠে কালধর সর্পের বেষ্টনী···মস্তকের উর্দ্ধে একাদশী চাঁদের মায়া··· । মহাদেবের দূর প্রসারিত জটাজালের ভেতর মা অবতরণ করছেন তাঁর বিপুল জলচ্ছ্বাসের বেগ নিয়ে, উচ্ছাস নিয়ে। দিলীপপুত্র ভগীরথের একাগ্র সাধনার হল জয়···ধরাতল মায়ের স্পর্শে ধন্য হ'ল।

এখানকার সমগ্র ভূভাগই এই পৌরাণিক তত্ত্বে আচ্ছন্ন—এখানে সবটাই শিবক্ষেত্র। জাহ্নবীর পৃথিবীতে অবতরণের পর্বের সঙ্গে বেশী করে মনে পড়ে তাঁকেই, যিনি সমগ্র ভূভার ধারণ করে আছেন—সেই পরমপুরুষ। বৃষবাহন তিনি···মায়ের বেগ ধারণের সময় নিশ্চয় সেই বৃষ অদৃশ্য হয় নি, সেও তাঁরই সঙ্গে যুক্ত ছিল। গোমুখের যে কল্পনা স্মরণাতীত কালে মহাপুরুষেরা করে গেছেন, তার সঙ্গে মহেশ বাহন বৃষপর্ব্বটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। গোমাতার দেহে সমস্ত দেবতাদের অধিষ্ঠান...এ স্বীকৃতি পুরাণের, এ আবিষ্কার হিন্দুধর্ম্মের···তাই মাতা শব্দের উৎপত্তি, তাই তাকে ঘিরেও আমাদের স্তবস্তুতি। অন্য কোন জন্তুর মুখের সঙ্গে কেন যে এই গুহামুখের সাদৃশ্য কল্পনা করা হয় নি··· তার কারণ হোল এই। শিব যেখানে, সেইখানেই বৃষ আর তার মুখাবয়বও সেইখানে। গোমুখের কল্পনা তারই থেকে সে বিষয়ে ভুল নেই।

এখানে এসে দাঁড়ালে আর একটি সারবস্তুর পৃষ্ঠা যেন আচমকা চোখের সামনে উড়ে আসে। সে তত্ত্ব মানুষের জন্ম ও মৃত্যুর। অর্দ্ধ মাইলের দংষ্ট্রাকরাল রেখার ভেতর দিয়ে ভাগীরথীর যে প্রবাহ তার শেষ

হয়েছে সমুদ্রে...বিশাল ভারতভূমির সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের ভেতর দিয়ে নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে মা ধরিত্রীর পাদদেশে সাগরে এসে মিশেছেন। নিম্নমুখী যে প্রবাহ তাকে মানুষের কর্ম্মজীবনের সঙ্গে তুলনা করা যায়। অল্পপরিসর স্থান, কতখানিই বা—এখান থেকেই মা গঙ্গা ভীমবেগে নিচে নেমে আসছেন আর তাঁর নিম্নাবতরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ক্ষীণকায়া আর নেই— তিনি তখন বিপুলা ও উচ্ছলা। পথ চলার আবেগে তিনি নানাবিধ শক্তিকে নিজ দেহে আহরণ করে নিয়েছেন...তাঁর প্রসারতা আপনা থেকেই··· দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর সামনে গঙ্গার যে বিস্তীর্ণ রূপ···তার সঙ্গে এখানে দেখা গঙ্গার কোন মিল নেই : অথচ সেই একই গঙ্গা, একই প্রবাহিণী ··। জীবনও সেই গোত্রে—জীবনের সবকিছু যেন এই একই সূত্রে গাঁথা···। সমুদ্রের সঙ্গে গঙ্গার লীন হয়ে যাওয়া···এ হ'ল তাঁর বিলুপ্তি···। মানুষের জন্ম—তার কর্ম্মজীবনের চাঞ্চল্য, আর তারপরে সেই জীবনের ওপর মৃত্যুর যবনিকাপাতের ছায়া নেমে আসা··সবই একটি মহাসুরের মূর্চ্ছনা। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পিতৃ-মাতৃ শক্তির ওপর···তার ছোট্ট জীবনের বেষ্টনী কতটুকু? গোমুখের এই ক্ষীণকায়া প্রবাহিণীর সঙ্গে জীবনের মিল বড় কম নেই...শিশু জীবনের সঙ্গে এই নবপ্রসূত গঙ্গার তাৎপর্য্য একই সমসূত্রে গাঁথা...। মা গঙ্গার যত নিম্নমুখীন হওয়া—তাঁর কলেবর বৃদ্ধি ও সেইসঙ্গে শক্তির বিরাট উন্মেষ...। জীবনেরও তাই—বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চাঞ্চল্যের উন্মেষ—শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে অপরাপর শক্তিসমূহকে আহরণ করে বিস্তীর্ণ হয়ে যাওয়া, যে বিস্তীর্ণতা দক্ষিণেশ্বরে···যে বিস্তীর্ণতা বারাণসীর গঙ্গায়। তারপর জীবনের বৃদ্ধি···ক্রমশঃ তার বিলুপ্তির অভিযান, জরাব্যাধির আক্রমণ : তারপর অপরিহার্য্য মৃত্যুর করাল-

গ্রাসে জীবনের পরিসমাপ্তি।. মৃত্যুই সমুদ্র আর এরই সঙ্গে জীবনে-তিহাসের শেষের অধ্যায়—যেমন শেষ অধ্যায় মা জাহ্নবীর··· ।

আর···

ঐ ত্রিশূল—যেন সমগ্র মেদিনীকে ফুঁড়ে উঠে গেছে উর্দ্ধাকাশে··· মহাব্যোমের মহানীলিমায়। ও ত্রিশূল পিনাকপাণির, ও ত্রিশূল শ্মশানচারী ক্ষেপা ভোলানাথের···। তিনিই সৃষ্টিস্থিতির ধ্বংসের হেতু···তাঁরই হাতে মহাপ্রলয়ের ডমরু বাজে···। এখানে দাঁড়িয়ে তিনি ভাগীরথীকে আহরণ করে নিয়েছেন আপন জটাজালের মধ্যে আর তাঁরই সৃষ্ট মহাসমুদ্রে সেই শক্তিরই বিলয় হচ্ছে...। উর্দ্ধে তিনি সৃষ্টির সাক্ষর—মধ্যভাগে সেই সৃষ্টির তিনি কর্ম্মযোগ—নিম্নে সেই শক্তিরই ধ্বংসকারী মহাশক্তি···।

গোমুখের উদ্ভব যে পাষাণ স্তূপকে নিয়ে—ইচ্ছে ছিল উর্দ্ধে গিয়ে বিধাতা পুরুষের সৃষ্টির এই মহাতত্ত্বকে আরো কিছু অনুসন্ধান করার। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টার পর বোঝা গেল তা মানুষের পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। কোথা দিয়ে উঠ্‌ব? পথ কোথায়? নিরেট পাহাড় সামনে—এমন কোন অবলম্বন নেই যে তা আশ্রয় করে ওপরে ওঠা যাবে। মানুষের গতিবিধির সীমা এই গুহামুখ পর্য্যন্ত—এর ওপরকার স্তরের কথা রহস্যময়ই থেকে যাবে চিরদিন। পাহাড়-পর্ব্বতের ওপরে মান্ধাতা আমলের যে তুষার রাজ্য—সে রাজ্যকে শিবের রাজত্ব বলে মেনে নেওয়াই উচিত। কেবলমাত্র কল্পনাকে শিখণ্ডী করে ঐ দুর্জ্জেয় তুষার রাজ্যে আর এক মরকত রাজ্যের সন্ধান করা আমার পক্ষে অসম্ভব বলে মনে হয়েছে...।

চার ঘণ্টার ওপর ছিলাম গোমুখের তীর্থভূমিতে। কেন যে শীতে জমে যাই নি তার কারণ আমার জানা নেই। পেরেছি—এইটাই

সত্যি। ধরম সিং চুপ চাপ বসে ছিল না এখানে এসে। তার আসাটাও প্রথম, উত্তেজনায় সেও এ পাথর থেকে ও পাথর ছুটোছুটি করেছে। সতের বৎসরেই তার গোমুখ দর্শন···কতখানি সুকৃতির ফলে এটি সম্ভব তা একমাত্র ভগবানই জানেন···। পাত্রে করে সেই গোমুখের পুণ্যতম জল এনে দেয় আমাকে—আকণ্ঠ পান করি আমি, কি অদ্ভুত মিষ্টি জল যে ধারণায় আসে না। অমৃতের স্বাদ যেন। বেলা তিনটে বাজার পরই বৃত্ত আবার ঘুরে আসে···দৃষ্টির সামনে ঢাকা পড়ে যায় দংষ্ট্রাকরাল···ঐ অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক গোমুখ। রাত্রে ভুজবাসা···সেই রাত···প্রত্যুষে আবার যাত্রা! মধ্যাহ্নের আগেই গঙ্গোত্তরীতে এসে যাই···।

ধরাসু থেকে যাত্রা যমুনোত্তরীর পথে। আশঙ্কা ছিল দুরারোহ দুর্গম সে তীর্থ পরিক্রমনায় সফলকাম হব কি না! হয়েছি আমি—উত্তীর্ণ হয়েছি সে পরীক্ষায়। ও মহাতীর্থে নানাবিধ যোগাযোগের সংমিশ্রণ —যা জীবনে রং বদলেছে—আলো এনেছে, অভিমানও এনেছে। খরসালী ও ব্রহ্মতালেও পথপ্রান্তে সেই ফিকে সবুজ সাড়ী পরা মাতৃস্বরূপিণীর অদৃশ্য হয়ে যাওয়া—অভিমান তারই জন্যে ঃ চিনেও চিনি নি, বিষাদে যেন ভেঙে পড়েছিলাম আমি—শিশুর মত কেঁদে-ছিলাম। এই কান্না বুকে চেপেই গঙ্গোত্তরীর পথে যাত্রা। এ পথ ভোলার নয়। এ পথ স্মৃতি থেকে মোছার নয়···। এ পথে অঞ্জলি পূর্ণ হয়েছে—অভাবনীয় সম্ভবে এসেছে। সকলের ঊর্দ্ধে যিনি, সেই পরমা প্রকৃতি তাঁর অগোচর ত কিছু নেই। তাঁর সন্তানের কান্না তিনি শোনেন—আঁচল দিয়ে সেই অশ্রু তিনি মুছিয়ে নেন—কেননা তিনি যে বিশ্বপ্রসবিনী···। অর্ব্বাচীন গোত্রহীন আমি—আমার খরসালীতে ফেলে আসা অশ্রুর মর্ম্ম তিনি বুঝেছিলেন, তাই গঙ্গোত্তরীর তীর্থপথে

অচিন্ত্যনীয় দ্রব্যসম্ভার আমার ভিক্ষার ঝুলিতে সঞ্চিত হয়েছে। যমুনো-ত্তরীতে তাঁর দুঃখ দেওয়া—গঙ্গোত্তরীতে সেই বেদনার ষোলআনা অপনোদন। জলের প্রয়োজন তখনই যখন তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যায়—অন্ধকার যখন ঘনিয়ে আসে তখনই আলোর জন্যে হাহাকার, যে তৃষ্ণার সূত্রপাত যমুনোত্তরীতে—তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে গঙ্গোত্তরী ও গোমুখে—যার ফলে জীবনের পাত্র কানায় কানায় পূর্ণ হয়েছে আমার।

প্রত্যাবর্ত্তন

স্বর্গরাজ্যে জীবন কাটানোর অধিকার মানুষের নেই—ধূলিধূসর ধরণীর মানুষ আমি···মাটির টান বড় টান। সেখানে সংসার আছে, বন্ধন আছে—মায়া আছে···কর্ত্তব্য সেখানে অচলায়তন। তাই ফেরার পালা···তাই প্রত্যাবর্ত্তনের অধ্যায়। যেটুকু দৈবভাবের সঞ্চয় তা চিরস্থায়ী করার সুযোগ নেই এখানে···কেননা মৃত্তিকার মহামায়া বসে আছেন কলকাটি নিয়েঃ আমাকে না পেলে তাঁর লীলা যে শেষ হবে না। প্রপঞ্চ মায়ার ভেতর তাঁর অধিষ্ঠান, মাটির মানুষ আমি···আমার তাই ঐশ্বর্য্য ফেলে যাওয়া, হীরের খনিকে পাশ কাটিয়ে আমার তাই প্রত্যাবর্ত্তনের তোড়জোড়। যা পেলাম, যা এসেছে তাই ভাঙিয়ে দিনগুজরানের অবকাশ···জীবনের বাকী ক'টা দিনে এই সঞ্চয়ই জপের রূদ্রাক্ষ হয়ে থাক। যেতে আমাকে হবেই—এ স্বর্গরাজ্য যে আমার নয়ঃ পান্থশালার মত দু দিনের আশ্রয় পাওয়া আমার···তাই যথেষ্ট—তাই জীবনাকাশে ধ্রুবতারার মত জ্বলে থাক···।

প্রত্যাবর্ত্তনের কাহিনীকে লিপিবদ্ধ করার মধ্যে বেদনা বড় কম নয়। এ বেদনাকে, এ দুঃখকে অকারণে কুড়িয়ে লাভ নেই—এ থাক। যে পথে এসেছিলাম সেই পথই ফেরার—তার ভেতর যেমন নতুনত্বের অভাব তেমনি উচ্চাশার পরিসমাপ্তি···। আসার সময় ছিল উদ্দীপনা; তখন মনে মনে যোগাযোগের মালা গেঁথেছি আর এ গাঁথা সার্থক হয়েছে। গঙ্গোত্তরীর মন্দির ও ঘরবাড়ী ছাড়িয়ে যখন আবার

ভৈরবঘাটির উতরাই পথ ধরলাম তখন মনে হ'ল আমার শক্তির ভাণ্ডারের সকল সঞ্চয় কে যেন নিঃশেষ করে নিয়েছে···আমি দেউলে হয়ে গেছি। এ দেউলে হওয়া প্রত্যাবর্ত্তনের—এ শূন্যতা মহাতীর্থের অঙ্গন ছেড়ে ঘরমুখো হওয়ার অপরিহার্য্য ক্লান্তি···।

তাই ভাবছি—এ থাক্। বুকের জ্বালা বুকেই থাকুক!

সমাপ্ত